বিদ্রোহী

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫০, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯।

প্রকাশক
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
৫০, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯।

পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস,
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

আজ মহাকবি চণ্ডীদাসের সাধনার স্থানে বসিয়া বাশুলী দেবীর আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া এই বইখানি কবির পুণ্যপূত স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৫৭,

চণ্ডীদাস-নান্নুর,

বীরভূম।

গ্রন্থকার

বিদ্রোহী

(১)

—বাতাস কর তো মা শৈল একটু, আমি ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসি। কথাটা শৈলর মা শৈলকে মৃদু স্বরে বলিলেন।

শৈলর বাবা মোহিনী চৌধুরী জ্বরে পড়িয়াছেন। জ্বর বেশী হওয়ায় তিনি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। গরমের দিন। দুপুরের রোদে চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। হাওয়া একদম পড়িয়া গিয়াছে।

বাহিরের দিকে শৈলর মা সুশীলা জানালা দিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, উঃ, কি রোদ উঠেছে আজ! এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মোহিনী হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, উঃ, তুই বাতাস করছিস্ মা!

শৈল বলিল, কেন বাবা?

মোহিনী বলিলেন, না, বল্‌ছি এ হতভাগার হাতে পড়ে তোদের কোন সুখ হ'ল না।

—কেন বাবা, আমরা তো কোন কষ্টে নেই!

—নেই! এর চেয়ে বেশী কষ্ট আর কাকে বলে?

—কেন বাবা, আপনি এত ভাবেন? কষ্টে আমরা কিছুতেই নেই। একটু ঘুমোন আপনি।

—আচ্ছা ঘুমোই।

এই কথা বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে হঠাৎ ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বলিলেন, রেখে দে পাখা! কিছুই ভাল লাগে না। কাছে এসে বোস একটু।

শৈল আগাইয়া আসিয়া বসিল। পিতা মেয়ের মাথা নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, শৈল, মা আমার, তুই যে আমার কি মা! কোন্ পাপে তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলি মা!

একটু গানের সুরে আবার মোহিনী বলিলেন, কেন তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলি?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কেন বাবা?

—হ্যাঁ, হাসবিই তো তোরা, হাসবিই তো এখন! আমি কি চোখ বুঁজে থাকি? উঃ, কি ভয়ানক! বাঁচবো না, বাঁচবো না আর বেশী দিন আমি। ত্বাখ্ তো কুমুদিনীর দিকে একবার চেয়ে।

—কেন বাবা?

—সে বা কি, তোরা বা কি!

—কেন বাবা? দুঃখে নেই তো আমরা ওদের চেয়ে।

—সত্যি?

এই কথা বলিয়া মোহিনী আদরে মেয়ের গাল টিপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, তা হ'লেই হ'ল। আমি তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার ক্ষীণ ডান হাতখানি সবেগে বিছানায় উপর ফেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া শুইলেন ও বিষম ব্যথায় মাথা এদিকে ওদিকে সবেগে নাড়াইতে নাড়াইতে বলিলেন, উঃ, বাবা গো, সহ্য হয় না আর! উঃ, মলেম। আর বাঁচবো না, কিছুতেই বাঁচবো না এবার।

জল লইয়া সুশীলা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। জলের গ্লাস টুলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, কি বলছিলেন উনি?

—আমরা খেতে পাইনে। উনি আর বাঁচবেন না।

সুশীলা ধমকের সুরে বলিলেন, শুধু বাজে বকো না। ঘুমোও। ঘুমোও বলছি।

মোহিনী একদৃষ্টে সুশীলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গাল দিলে সুশীলা? দাও যত ইচ্ছে গাল দাও। তোমার গালও আমার মিষ্টি লাগে।

পিতার এই নির্ল্লজ্জ উক্তিতে শৈল মাথা অবনত করিল।

সুশীলা ব্যাপারটা বুঝিলেন। প্রচণ্ড ধমকের সুরে স্বামীকে বলিলেন, কি বাজে বকছ তুমি! বুদ্ধির মাথা খেয়েছ? ঘুমোও। ঘুমোও সকালে।

—আচ্ছা, আচ্ছা ঘুমোই।

এই কথা বলিয়া মোহিনী কাত ফিরিয়া শুইয়া চোখ বুঁজিলেন।

বিকালে জ্বর ছাড়িয়া গেল। মোহিনী একটু সুস্থ হইলেন। শরীর দুর্ব্বল হইয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িয়াছিল। গলার আওয়াজ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে একবার তিনি মেয়ে শৈলর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সুশীলা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন, কি ভাবছ বল দিকি?

মোহিনী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, ভাবছি মেয়ের কথা। বাড়টা দেখেছ একবার?

—দেখেছি। কুমুদিনীর কি বাড় নেই? তাঁরা কি তোমার মত দিনরাত পড়ে পড়ে ভাবছে?

—তাঁদের কথা আলাদা।

—আলাদা কেন ?

—আলাদা নয় ? পরেশ বাবু বড়লোক। কুমুদিনী মেট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়েছে। সুন্দরী সে।

—তোমার মেয়ের চেয়ে ? দাঁড়াতে পারে সে শৈলর কাছে ?

—সেই জন্যেই তো ভাবি বেশী করে যে ওর আমার ঘরে জন্মানো উচিত ছিল না।

—কেন উচিত ছিল না ? দেখো ওরই ভাল বর জুটবে ; ভেবো না।

কিছুক্ষণ কোন কিছু কথা হইল না। মোহিনী অসারভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন।

পরে সুশীলা বলিলেন, ত্থাখো, শুনেছ ?

মোহিনী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, কি ?

—কুমুদিনীরা এসেছিল। কুমুদিনী আর তার মা।

উৎসাহিত হইয়া মোহিনী জোরে বলিয়া উঠিলেন, কবে ?

—আজ সকালে।

—বল নি তো আমায় একথা !

—তার পর পরই তোমার জ্বর এল।

—কি বল্লেন তাঁরা ?

—বল্লেন কুমুদিনী ও তাঁর মা দুজনেই, যে শৈলর মত মেয়ে হয় না। শৈলকেই ওঁরা নেবেন। কুমুদিনীর মা যে খুব ভাল। আমার সঙ্গে বেশ ভাব। অহঙ্কার বলতে তাঁর কিছু নেই।

—তুমি কি বল্লে ?

—আমি বিশেষ কিছু বলিনি।

উভয়েই ইহার পর চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে মোহিনী

ক্ষীণ কণ্ঠে শরীরের অসাধারণ দুর্ব্বলতা ও গ্লানি প্রকাশ করিয়া বলিলেন হ'লে তো ভালই হ'ত। আমাদের কপালে কি তা হবে!

সুশীলা শ্যামবর্ণা। স্থূল, ঢিলা গোছের গঠন। অসাধারণ কর্ম্মক্ষম। স্বভাব শান্তপ্রকৃতির।

(২)

যমুনার ধারের এক জমিদার বংশের মেয়ে সুরবালা। সে পিতার একমাত্র সন্তান। সুরবালাদের বাড়ীতে কয়েক শরিক। বাড়ী চক-মিলানো। পাকা ঘরগুলি সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শরিকেরা সেই বাড়ী ঘিরিয়া পৃথক পৃথক ভাবে টিনের বাড়ী করিয়াছে।

দুই পুরুষ পূর্ব্বে অন্য জমিদারের সঙ্গে মোকদ্দমায় সুরবালারা নিঃস্ব হইয়া পড়ে। দেনার দায়ে তাহাদের অনেক মহালই নিলাম হইয়া যায়। এখন সুরবালারা নামে জমিদার। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ মেয়েদের করিতে হয়।

মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া যমুনায় স্নান করিতে যায়। যমুনার স্রোতে সাঁতারের অবস্থায় তাহারা ভাসিয়া চলে ও দীর্ঘকাল সাঁতারের অবস্থায় কাটাইবার পর চোখ লাল করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

সুরবালাদের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। সেই সব পূজা পার্ব্বণে মেয়েরা কাজ করে। নদীর ধারে বাড়ী হওয়ায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল। তাহারা নিটোল দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী।

সুরবালা গৌরবর্ণা না হইলেও গৌরবর্ণা। ঠিক লম্বা তাহাকে বলা চলে না অথচ সে লম্বা। দৃঢ় ও কমনীয়। দৃঢ়তা কমনীয়তার কাছে হার মানিয়াছে। চেহারা স্থূলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বাক্‌চপল। গলার স্বর সরস ও কমনীয়।

সুরবালার বিবাহ দিতে সুরবালার পিতাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার কারণ তাঁহার হাতে নগদ টাকা বেশী ছিল না।

অধ্যাপক যতীন রায়ের সন্ধান প্রথমে তিনি পান নাই, সন্ধান লইবারও স্পর্দ্ধা রাখেন নাই। হঠাৎ যোগে যাগে সুরবালার পিতার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়া গেল। প্রস্তাবটাও হঠাৎ উপস্থিত হইয়া গেল। যতীন বাবু প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সুরবালাকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। তিনি এক প্রকার বিনাপণেই পুত্র সুরেশের সঙ্গে সুরবালার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

সুরেশ গৌরবর্ণ, একটু মোটা ধরণের, সুদর্শন, চশমা-পরা যুবক। সে ইংরাজীর ফার্ষ্টক্লাস এম এ, আদর্শবাদী।

যতীন বাবু বিপত্নীক। বাসায় ঠাকুর চাকর লইয়া থাকেন। ভবনাথও তাঁহার বাসায় থাকে। সে যতীনবাবুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলে। তাহার পিতা মাতার অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছে। সংসারে কেউ নাই। যতীনবাবু তাহাকে বাসায় ঠাঁই দিয়াছেন। পড়ার খরচ দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তিন বার বি, এ, ফেল করিবার পর সে দুই বৎসর আগে পাশ করে। সম্প্রতি সে বোম্বাই হইতে ব্যবসায় পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিয়াছে।

ভবনাথ চট-পটে গৌরবর্ণ, লম্বা ছিপ্ ছিপে গড়নের, বাক্ কথায় তাহার সঙ্গে কেহ পাড়িয়া ওঠে না। সুরেশরা সকলেই তাহাকে নিপের মত দেখে।

সুরেশ বিবাহের কিছুদিন পরেই যতীন বাবু মারা যান। সুরবালার পিতারও মৃত্যু হয়। সুরবালার ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যতীন বাবু সুরবালাকে খুব ভালবাসিতেন।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই সুরেশ শাশুড়ীকে রাজসাহীর বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন।

সুরেশ ও ভবনাথ দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় এক যৌথ কারবার স্থাপন করিয়াছে। সুরেশ ঐ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। কোম্পানীর নাম নর্থ বেঙ্গল সিল্ক ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড্। সুরেশ ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ভবনাথ সেক্রেটারী।

সুরেশ ভবনাথ প্রায়ই কলিকাতায় থাকে। রাজসাহীর বাসাতে থাকেন সুরবালা, সুরবালার মা, ঝি আর চাকর।

পরেশ বাবু কুমুদিনীর পিতা, সেরেস্তাদার। তিনি প্রথমে মেট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কেরাণী হইয়া চাকরীতে প্রবেশ করেন।

পরেশ বাবু ছোট-খাটো জমিদার। গৌরবর্ণ পাতলা চেহারা। দৃষ্টি খর, ব্যবহার উদ্ধত। সেইজন্য সাধারণ লোকে তাঁহার সঙ্গে মিশিতে পারে না।

বাসায় ঠাকুর চাকর আছে। সেইজন্য কুমুদিনী ও কুমুদিনীর মা সুরমার কোন কাজ করিতে হয় না। ছেলে সুবিমল রাজসাহীতে পড়ে না। রংপুর কলেজে সে হোষ্টেলে থাকিয়া ফার্ষ্ট-ইয়ার আই, এস্, সি ক্লাসে পড়ে।

মোহিনী চৌধুরী আদালতে কেরাণী হইয়া ঢুকিয়াছেন, কেরাণীই রহিয়া গিয়াছেন।

কুমুদিনী গৌরবর্ণা, পাতলা গড়নের, অস্থির প্রকৃতির। এক জায়গায় স্থির হইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না।

(৩)

রাজসাহীর বাসাতে সুরেশের দিনগুলি ভাল ভাবেই কাটিয়া যায়। সুরবালা বাড়ীর উঠান দিয়া ঘোমটা মাথায় দিয়া একাজে ওকাজে যান। সুরেশ তাকাইয়া দেখে। কলসী কাঁখে করিয়া সচল ভঙ্গীতে সে নদীতে স্নান করিতে যায়। সুরেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। দুপুরে মায়ের অসাক্ষাতে সে চুরি করিয়া স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর বাহু-বেষ্টিত হইয়া স্বামীর কোলে বসে। মা বাহির হইতে ডাকিলে সে চোরের মত সট্ করিয়া ঘরের খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া ভাল মানুষের মত মায়ের সামনে গিয়া হাজির হয়।

রাত্রিতে সুরবালার ঘরে আসিতে দেরী হইলে সুরেশ বিছানায় পড়িয়া বিষম উৎকণ্ঠায় সময় কাটাইতে থাকে। পরে দরজায় সুরবালার শাড়ীর খস্‌খস্ শব্দ শুনিবামাত্রই সে আশু উপভোগের কল্পনায় অস্থির হইয়া শুঁটি-সুটি মারিয়া চোখ বুঁজিয়া ভান-করা ঘুমে ঘুমাইয়া থাকে। সুরবালা আসিয়া চুম্বন করিয়া খল খল হাসি হাসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দেয়।

রাত্রিতে শুইয়া সুরেশ সুরবালাকে বলে, তোমাকে ছেড়ে থাকা বড়ই কঠিন সুরবালা। কল্‌কাতায় দিন কাটে আমার ভয়ানক কষ্টে।

সুরবালা আদরে স্বামীর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলে, বটে? আমি এতই বড়! পুরুষে সবাই একথা বলে।

—কি যে বল সুরবালা! চেননা, চেননা, সুরবালা তুমি আমাকে একেবারেই।

—চিনিনে তো বটেই। স্বীকার করতেই হবে তোমাকে একথা, যে কল্‌কাতায় গেলেই তুমি আমার কথা একদম—একদম ভুলে যাও। আমার যে কোন গুণ নেই, আমি যে কালো।

—কি যে বল তুমি! তুমি কালো!

—যা বল্‌ছি ঠিকই বলছি।

—না কিছুতেই বল্‌ছ না।

সুরবালা হাসিয়া বলে, চোখ ছুঁয়ে বলত, দেখি তোমার ক্ষমতা কতখানি।

সুরেশ আদরে সুরবালাকে বুকে টানিয়া লয় ও উচ্ছ্বসিত চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

উত্তেজনার পর শান্তি আসিলে সুরবালা বলে, আচ্ছা সত্যি বল্‌বে সত্যি করে বল তো?

— কি?

—আমি কালো, আমায় দিয়ে কি তুমি সুখী? সত্যি বলতো কুমুদিনীর মত যদি তোমার সুন্দরী এক বৌ হত? তবে কি তুমি বেশী সুখী হতে না?

—কি যে বল! কুমুদিনী তোমার চেয়ে সুন্দরী!

—নিশ্চয়ই সুন্দরী সে আমার চেয়ে। সবাই বলবে আমি কালো।

—বেশ, কালোই আমার ভাল।

—এ হতেই পারেনা কখনও।

—কেন?

—কালো কখনও ভালো হয় না কোন পুরুষের কাছে।

—কেন?

—জানই তো গোবিন্দলালের কথা। তুমি যদি গোবিন্দলাল হতে? রোহিনী জল নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি বাগানের ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে—বুঝেছ?

—আজ বইখানা শেষ করেছ বুঝি। কি বুঝলে পড়ে বইখানা?

—বুঝলেম পুরুষ সবাই রূপ চায়।

—আমি গোবিন্দলাল নই যে শুধু রূপ দেখে ভুলে যাব। আর তোমারও তো রূপ আছে।

—বটে !

এই বলিয়া উচ্ছ্বসিত সোহাগে সুরবালা স্বামীকে চুম্বন করে। স্বামীও চুম্বন করিয়া পত্নীকে বুকে চাপিয়া ধরে।

স্বামীর কক্ষবর্ত্তিনী হইয়া সুরবালার হৃদয় আবেগে ভরিয়া ওঠে। সে স্বামীকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া নিজেকে ভুলিয়া যায়।

সুরেশও পত্নীর প্রেমে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

সুরবালা ঘুমায় না। নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে মনে মনে বলে, এমন স্বামী কি তাহার কপালে টিঁকিবে ?

এইভাবে সময় কাটে না। সে উঠিয়া বসে। নিদ্রিত স্বামীকে আস্তে আস্তে চুম্বন করে সে। রাত্রির মৃদু বাতাস স্বামীর চুল এলো-মেলো করিয়া দেয়। সে নখ দিয়া পুনঃ পুনঃ সেই চুল ঠিক করিয়া দেয়। পরে সে স্বামীর বুকের উপর নিজের মাথা রাখিয়া স্থির হইয়া থাকে। প্রায়ই সে স্বামীর বুকের উপরেই ঘুমাইয়া পড়ে।

(৪)

কুমুদিনী সুরবালাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া সুরবালার ঘরে গিয়া বসিয়াছে।

সুরবালা কুমুদিনীকে বলিল, কি যে বলিস্ তুই ! মেয়েদের আবার পচ্ছন্দ কি লো ! স্বামীকে ভক্তি করবি প্রাণ দিয়ে ভালবাসবি।

কুমুদিনী বলিল, যাঃ, সেকেলে কথা সব তোর। ভক্তি কিরে ?

—কেন? ভক্তি করতে হবে না স্বামীকে?

—বড্ড বাজে বকিস্ তুই! এইজন্যেই বাংলাদেশের মেয়েরা এত দুর্ব্বল।

—অন্য দেশের মেয়েরা কি?

—তারা স্বাধীন, ঘোড়ায় চড়ে তারা। এরোপ্লেন চালায়, আফিসে কাজ করে। পারবি তুই?

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল, কেন পারবো না?

—কলা! তোরা স্বামীর বাঁদী।

—বাঁদী নই ঠিক। আমরা স্বামীকে ভালবাসি, ভক্তি করি।

—যাই বলিস্ ভাই, ভক্তি আমি দিতে পারবো না কক্ষনো। স্বামী সাথী। যাকে পছন্দ করবো তাকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসবো।

সুরবালা হাসিয়া বলিল, যা দেখেছি ভাই, তাতে মনে হচ্ছে তোর ওই সাথীটির এখনই প্রয়োজন। ওকে না হলে যে তোর একদিনও চল্‌ছে না দেখ্‌ছি।

—ঠিকই তো। চলছে না তো একদিনও।

—কি করছেন তোর বাপ মা?

—দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন তাঁরা। এদিকে মেয়ের যে ফুল ফুটে শুকিয়ে গেল। সে দিকে নজর দেয় কে? যাক্, তুই ভালই আছিস্ বোধ হয়।

—তোর কি হিংসে হচ্ছে?

কুমুদিনী সুরবালার গালে এক চড় বসাইয়া দিল। 'উঃ' শব্দ করিয়া সুরবালা মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কুমুদিনী বলিল, সুরেশ বাবু কলিকাতায়?

—হ্যাঁ।

—অত বড় স্কলার। সবাই বলে উনি বড় চাকরী পেতেন।

—বলেন চাকরী কিছুতেই করবেন না।

—তুই কি বলিস্?

—বলি করো না।

—তখন তিনি কি করেন? এই রকমভাবে চুমো দেন তিনি?

এই বলিয়া চশমা-পরা কুমুদিনী ভারি সুরবালাকে জোরে টানিয়া আনিয়া, দুই বাহুদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহার গালে চুম্বন করিল।

সুরবালা তাড়াতাড়ি নিজেকে কুমুদিনীর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, আর যা করিস ভাই, আমার শরীরের উপর অত্যাচারটা করিস্ নে।

সুরবালা কুমুদিনীর দুই বৎসরের বড়। বয়সের এই কম বেশীতে উভয়ের ভাব বিনিময়ের কোন অসুবিধা হয় না!

(৫)

কলিকাতার বাসা।

সুরেশ ভবনাথকে বলিল, ছবি দেবে না সাইন বোর্ডে? ভেবে দেখেছ?

ভবনাথ বলিল, ছবি না হলেও যেন চল্‌তে পারে দাদা! কল্‌কাতা সহরে আমাদের সাইনবোর্ড দেখে কেউ শেয়ার কিন্‌তে আস্‌বে না। চাই কেনভাসিং, চাই বিজ্ঞাপন।

—বিজ্ঞাপনের মূল্য যথেষ্ট স্বীকার করি। দিয়েছও যথেষ্ট। কিন্তু তোমরা আমায় বিজ্ঞাপনে যে ভাবে চিত্রিত করেছ তাতো আমি মোটেই নই। লিখেছ অধিকাংশ শেয়ারই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। লিখেছ, আস্‌ছে বছর থেকেই শতকরা পঁচিশ টাকা ডিভিডেণ্ড দেবে।

—একবর্ণও বিজ্ঞাপনে অসত্য লেখা হয় নি দাদা। অযোগ্য লোক ত আপনি কিছুতেই নন্! আর আমরা যদি প্রাণপণে চেষ্টা করি তবে কেন দিতে পারবো না ডিভিডেণ্ড শতকরা পঁচিশ টাকা? অধিকাংশ শেয়ার বিক্রি হয় নি, হবে। তবে আমাদের খাটতে হবে বেশী। ব্যবসাটা ভাল। আমাদের তো ভয় পাবার কিছু নেই।

সুরেশ খুসী হইয়া বলিল, বুঝতে পেরেছ এখন ব্যবসাটা কেমন? আগাগোড়াই জানি তোমরা শেষে বুঝতে পারবে। ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি ভগবান্ কম লোককেই দেন। যাকে দেন তাকে অনেক সময় অসম্ভব বাধা অতিক্রম করে চল্‌তে হয়। যখন নাবিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন কলম্বস্ এই কথাই বলেছিলেন। গ্যালিলিওকে প্রাণ দিতে হয়েছিল নিজের মতের জন্য। জগৎ এখন কিন্তু গ্যালিলিওর কথাই মেনে নিচ্ছে।

—তা ঠিক। বাস্তবিকই দাদা আশ্চর্য্য হই ভেবে কি করে আপনি এমন সুন্দর সুন্দর কথা অনায়াসে বলে যান। আমরা তো পারিনে।

—তুমি আমায় ভুল বুঝছ ভবনাথ। ভাব আমার আসে ঠিকই কিন্তু উহার প্রকাশ বিষয়ে যতটা সংযমের আবশ্যক ততটা সংযম আমি এখনও আয়ত্ব করতে পারি নি। সে ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিলেন সেক্সপীয়র তাঁর সাহিত্য-জীবনের শেষ অবস্থায়। শেষের কয়েকখানা নাটকে তাঁর কথাগুলো এমন মধুর অথচ সংক্ষিপ্ত যে যাঁরা প্রকৃত গুণী তাঁরা ছাড়া ওগুলির প্রকৃত ভাবোদ্ধারই করতে পারে না। যাক্ তুমি আমায় যত বড় করে চিত্রিত করতে চাও আমি মোটেই তত বড় নই। তবে জান্‌বে কাজকে আমি বেশী পছন্দ করি টাকা পয়সার চেয়ে।

—আমিও বিশ্বাস করি দাদা টাকা জীবনে বড় বেশী, কিছু

নয়, কাজই বেশী। যাক্ সে কথা। ছবি কি দেবেন একটা সাইন বোর্ডে? দিলে যেন একদম খারাপ হয় না। আমি একটা ছবি দেখেছি কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে। তুজন মেয়ে মালা হাতে একটা প্রতিষ্ঠানকে জয়মাল্য দিতে যাচ্ছে।

—একটা বাজে ছবি—হাঃ হাঃ! আমিও দেখেছি। ছবি আঁকা তো সোজা কাজ নয়! ছবিতে শিল্পী নিজের অসাধারণ কল্পনা দ্বারা এমন আশ্চর্য্য ভাব মূর্ত্ত করে ওঠাবে যা কেউ কোনও দিন আগে ছাখে নি। র‍্যাফেলের ম্যাডোনার ছবি দেখেছ? কি চমৎকার মাতৃমূর্ত্তি! সাহিত্যেও তাই। প্রকৃত যা রস, যা চিরকালের জন্য নূতন, তা কয়জন সৃষ্টি করতে পারে? যাঁরা পারেন তাঁরা অমর হয়ে যান।

ভবনাথ বিনীত ভাবে বলিল, এত বড় কল্পনা নিয়ে কি কেউ কোনও দিন সাইন বোর্ডের ছবি আঁকে দাদা?

সুরেশ অপ্রতিভ হইল। বলিল, না, না, কথাগুলো এমনই বল্লেম। আমি এতদূর নির্ব্বোধ নই যে বলবো যে সাইন বোর্ডের ছবি এত উচ্চ কল্পনা নিয়ে আঁকা যায়। তবুও যতটা ভাল হতে পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখবে। তার কারণ আমরা যা কিছু করব তাই সুন্দর ভাবে করে যাব। বুঝলে?

(৬)

পরেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে ভবনাথ চিরকালই ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। রাজসাহীতে আসিলেই সে পরেশ বাবুর বাসাতে গিয়া দেখা করে।

এবারও রাজসাহীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ভবনাথ গিয়া পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

সুরমা রান্না ঘরের ঠাকুরের রান্না দেখিতেছিলেন। ভবনাথের সাড়া পাইয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, কবে এলিরে ভবনাথ ?

ভবনাথ বলিল, আজ এসেছি মা।

ভবনাথ সুরমাকে মা বলিয়া ডাকিত।

ভবনাথের চোখে সোণার ফ্রেমে আঁটা চশমা। মাথায় চুল উঠাইয়া সিঁথি-করা। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার ভাবে কামানো। গায়ে ধোলাই-করা জালের গেঞ্জি ও তাহার উপর ধোলাই-করা আদ্দির পাঞ্জাবী। পায়ে কীডস্কিনের পামপ্‌ সু ও হাতে কালো বার্ণিশ-করা চামড়ার ফিতায় বাঁধা রিষ্ট ওয়াচ।

কুমুদিনীর মা ভবনাথকে বসিবার জন্য এক আরাম কেদারা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ও নিজে পাকা ঘরের বারান্দার মার্ব্বেলের ছক্-কাটা মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন।

ভবনাথ বলিল, এ কি হয় মা ?

সুরমা বলিলেন, কি যে বাজে বকিস্ তুই! মাটিতে বস্‌তেই ভাল লাগে। চেয়ার ফেয়ার আমি বড় একটা পছন্দ করিনে।

ভবনাথ বলিল, সুবিমল বাবু কি এসেছেন ?

—এসেছে তো! তোর সঙ্গে দেখা হয় নি ?

—না ?

—কোথায় গেল ? ও বিমল! ভবনাথ এসেছে রে!

সুবিমল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে সবেমাত্র ব্যায়াম শেষ করিয়াছে। এখন পর্য্যন্তও দম ঠিক হয় নাই।

সুবিমল অগ্রসর হইয়া ভবনাথের চেয়ারের পাশে গিয়া দাঁড়াইলে ভবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল। সুবিমল সম্ভ্রমে তাহার

পিঠে হাত দিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল ও আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া একখানি টুল লইয়া আসিল ও তাহাতে নিজে উপবেশন করিল।

সুবিমল লম্বা। লম্বা সুগঠিত গলার উপর তাহার সুগঠিত মুখ স্থাপিত। মাথার চুল পিছনে ছোট করিয়া ছাটা। বক্ষ বিশাল ও আশ্চর্য্যভাবে দৃঢ়। হাতের হাড় মোটা। চলা-ফেরায় সে কতকটা গ্রে হাউণ্ড কুকুরের মত। তাঁহার শরীরের গঠন নিখুঁত। মনে হয় বলিষ্ঠ পৌরুষ তাহার চোখ মুখ দিয়া অনবরত ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সে। গোঁফে সবে মাত্র রেখা দিয়াছে।

সুবিমলকে দেখিয়া ভবনাথ বলিয়া উঠিল, খুব চেহারা বাগিয়েছেন সুবিমল বাবু! আপনাকে দেখে হিংসে হয়।

সুবিমল মৃদু হাসিল মাত্র। কথা বলিল না।

আলাপ মোটেই জমিয়া উঠিতেছিল না। ভবনাথ বলিল, কুমুদিনী কোথায় মা?

সুরমা ডাকিয়া বলিলেন, এই কুমুদিনী, ভবনাথ এসেছে রে।

দূর হইতে আওয়াজ আসিল, যাই মা।

পায়ে দামী স্যাণ্ডেল, পরণে ধোলাই সাড়ি, চোখে সোণার চশমা, হাতে রিষ্টওয়াচ এইরূপ বেশে কুমুদিনী তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। ভবনাথকে দেখিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, নমস্কার, ভবনাথ বাবু! কবে এলেন?

—এসেছি তো আজ চার পাঁচদিন।

—এর আগে সময় করে ওঠাতে পারলেন না?

—না পারিনি তো

পরিশেষে কুমুদিনী মা'র দিকে তাকাইয়া বলিল, মা, ওঁর চা'র কথা বলনি?

—বলে দিয়েছি তো ঠাকুরকে আমি।

—আচ্ছা আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই কথা বলিয়া কুমুদিনী প্রায় দৌড়াইয়াই রান্না ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

এতক্ষণে সুবিমল ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল। বলিল, ব্যবসা কেমন চলছে ভবনাথ বাবু?

সুরমা সুবিমলের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, তাই তো রে ভবনাথ। তোদের ব্যবসা কেমন চল্‌ছে রে?

ভবনাথ বলিল, ব্যবসা মা! এখনই চলার কি হয়েছে!

—অনেকে বলে সুরেশ জীবনটা নষ্ট করলো। ভদ্রলোকের ছেলের কি ব্যবসা হয়?

—খুব হয় মা! কত লোকে করছে।

—তোদের তো রেশমের ব্যবসা। কতই বা রেশম বাজারে চলে!

—খুব চলে মা! খুব ভাল ব্যবসা মা!

সুরমা বিস্ময়াবিষ্ট কোমল কণ্ঠে বলিলেন, হুঁ! যাক্ ভাল হ'লেই হ'ল।

এই সময়ে কুমুদিনী ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। চাকর একটা টিপয় ভবনাথের চেয়ারের সাম্‌নে রাখিয়া দিল। ঠাকুর চায়ের কাপ ও প্লেট ও খাবারের প্লেট টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল।

ভবনাথ বলিল, একটা প্লেট যে! সুবিমল বাবু খাবেন না? মা চা খান না?

কুমুদিনী বলিয়া উঠিল, দাদার কথা বল্‌ছেন! উনি তো পাকা ব্রহ্মচারী। উনি চা খান না।

—মা চা খান্ না?

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, খাইনে তো, অভ্যেস করিনি।

—পরেশ বাবু চা খান না?

—বাবার কথা বল্‌ছেন! ওঁকে খোর বল্‌লেও চলে।

—কেন?

—ওঁর দিন এক কাপ দুই কাপে হয় না। ওঁর চার পাঁচ কাপ চাই-ই।

—শুধু চা?

—শুধু চা। চা'র সঙ্গে উনি খাবার খান না, চিনিও না। চা'টা খুব কড়া হওয়া চাই।

চা পান করিতে করিতে ভবনাথ সুবিমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ব্যবসাটা ভাল স্বীকার করি সুবিমল বাবু, কিন্তু সুরেশদাকে দিয়ে চল্‌বে কি না বলতে পারি নে।

—কেন?

—আমার ধারণা উনি চাকরী করলে ভাল করতেন। প্রচুর অবসর লেখা-পড়া করবার জন্য পেতেন।

সুবিমল বলিল, কেন চাকরী করতে যাবেন তিনি? ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেলেই তিনি প্রচুর অবসর পাবেন। তখন তিনি অনেক বই লিখে যেতে পারবেন।

—কোনটার কিছুই হবে না সুবিমল বাবু। ভাল বই লেখা কি সোজা! শুধু এম, এ হলেই হয় না।

—হয় না ঠিক। তবে এর ভেতরই তিনি অনেক কিছু লিখেছেন।

—লিখেছেন কিছু। ভাল হয় নি তো কোনটাই।

—কয়েকটা গল্প ভাল। আমি পড়েছি।

— ছাই ভাল !

—ভাল না হলে যশ অর্জ্জন করতে পারতেন ? যশ তো কিছু হয়েছে !

—কি যশ ! কত ! কল্‌কাতা সহর। তদ্বির করেছেন ভালভাবে। হয়ত একটু যশ হয়েছে মাসিক কাগজগুলোর মারফতে। আর ব্যবসার কথা বলছেন। ব্যবসাতে উনি সাধু সেজে থাকৃতে চান। ব্যবসা ওঁর হবে না।

—কেন হবে না ? জোচ্চুরি নাই বা করলেন। লাভ না হয় কমই হ'ল।

মতবিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া চতুর ভবনাথ বলিল, যাক্ তর্ক করে লাভ নেই। বড় ভাল সকালটা কেটে যাচ্ছে বাজে কথায়। একটা গান গাই।

সুরমা বলিলেন, তাই কর ভবনাথ।

কুমুদিনীও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল, চলুন ঘরে যাই।

ঘরটা কুশন চেয়ার দিয়া সাজানো ছিল। একটা ছোট খাটও সেখানে পাতা ছিল।

সুরমা খাটে বসিলেন। সুবিমল আসিল না, বাহিরেই রহিয়া গেল।

অর্গ্যানে বসিয়া ভবনাথ প্রথম আওয়াজ টানিয়াই বলিয়া উঠিল, বাঃ, বেশ অর্গ্যানটি তো মা !

ভবনাথ একটি হিন্দি গান গাহিল।

গানশেষে কুমুদিনী বলিল, বেশ সুরটা তো ! শিখলেন কল্‌কাতায় ?

ভবনাথ বলিল, হাঁ।

সুরমা বলিলেন, কুমু, তুই একটা গান গা।

কুমুদিনী আপত্তি করিয়া বলিল, ওঁর গানের পর? বল কি মা!

পরিশেষে অনুরোধে পড়িয়া কুমুদিনী অর্গ্যানে বসিয়া গান গাহিল।

গানশেষে ভবনাথ বলিল, বেশ ত গলা হয়েছে ওর! শিখায় কে?

সুরমা বলিলেন, গার্লস স্কুলের মাষ্টার ক্ষিতীশ বাবু।

ভবনাথ বলিল, ক্ষিতীশ বাবু তো খুব ভাল গান। উনি গোয়ালিয়র থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন।

এই কথার পর আলাপে একটু ভাঁটা পড়িল। পরিশেষে কুমুদিনী বলিল, ঐ গানটা গান তো ভবনাথ বাবু একবার।

—কেন?

—দেখি সুরটা যদি ধরতে পারি।

ভবনাথ আবার গাহিল।

গান শেষে কুমুদিনী ভবনাথকে বলিল, পরশুদিন একবার আস্‌বেন কি?

—কেন?

—ঠিক ধরতে পেরেছি কিনা দেখবার জন্য।

—আচ্ছা আস্‌বো।

ভবনাথের যাইবার পূর্ব্বে রূপার কৌটায় পুরিয়া কুমুদিনী পান লইয়া আসিয়া কৌটাটা ভবনাথের সাম্‌নে ধরিল।

ভবনাথ দুইটি পান উঠাইয়া লইয়া মুখে পুরিল। বলিল, দোক্তা আছে?

'আছে' বলিয়াই কুমুদিনী ঘরে দৌড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিল।

দোক্তার কৌটা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সহযোগে সুচারুভাবে দোক্তা উঠাইয়া লইয়া, সুচারুভাবে উহা মুখে নিক্ষেপ করিয়া ভবনাথ বলিল, যাই মা আজ তবে। পরশু আসবো।

ভবনাথ চলিয়া গেলে কুমুদিনীর মা বলিলেন, খাসা ছেলে ভবনাথ। কিন্তু নেই বল্‌তে যে ওর কিছু নেই !

কুমুদিনী বলিল, গলা কিন্তু ওঁর ভারি চমৎকার মা।

কুমুদিনীর মা বলিল, গলা ভাল, চেহারা ভাল, সব ভাল ওর, কিন্তু কিছুই যে নেই ওর নিজের বল্‌তে।

(৭)

শৈলদের বাড়ীতে কুমুদিনী বেড়াইতে আসিয়াছে। শৈল আদর করিয়া কুমুদিনীকে বসাইয়াছে।

শৈল বলিল, কি যে বলেন কুমুদিনী দিদি !

কুমুদিনী বলিল, কেন বিয়ের কথা কি বলতে নেই ?

শৈল বিয়ের কথায় লজ্জা বোধ করিতেছিল। ঠিক খোলাখুলি ভাবে ও বিষয়ে সে কুমুদিনীর সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেছিল না। বলিল, না তা বল্‌ছিনে।

—তবে ?

—বলে লাভ কি ? যা সকালে হচ্ছে না।

- হতে তো হবেই একদিন।

—তা হয়ত হবে। তবে সেদিকে মোটেই ভাবিনে আমি দিদি। বাবার শরীর কি যে হ'য়ে গেল তাই ভাবি।

-উনি সেরে যাবেন। তোর বিয়ে হবে।

—কি করে হবে ? বাবার টাকা নেই যে।

—-কেন, টাকা ছাড়াও তো অনেক সময় বিয়ে হয় !

—কোথায় হয় এদেশে ?

—কেন, বাড়ীর কাছে সুরবালারই তো হয়েছে!

—সুরবালার বাবা তো একেবারে গরীব ছিলেন না। আর সুরেশ বাবুর বাবার মত বাবাই বা কয়জন মেলে? সুরেশ বাবুর মত বরই বা কয়টা পাওয়া যায়?

—ভারি বর!

—কেন?

—পাশ করেছেন এম, এ স্বীকার করি। কিন্তু চট্‌পটে মোটেই নন্। ওঁর চেয়ে ভবনাথ বাবুকে আমার বেশী পছন্দ হয়।

শৈল হাসিবার ভাবে বলিয়া উঠিল, মনে ধরেছে বুঝি আপনার ভবনাথ বাবুকে?

—ধরা বলে ধরা! ওঁকে পেলে আমি এখনই লুফে নেই।

বিষম কৌতুহলে শৈলর গাল আরক্ত হইয়া উঠিল। চঞ্চল লজ্জায় কটাক্ষ দৃষ্টি কুমুদিনীর দিকে নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, কি যে বলেন! পাগল একটা আপনি!

—পাগল নই কিছুতেই। ওঁকে পেলে আমি এখনই সব ভুলে গিয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে রাজি আছি।

—যদি আপনার বাপ মা স্বীকার না করেন?

—স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হবেন। স্পষ্ট আমি তাঁদের বলে দেব যে ভবনাথ বাবু ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে আমি মোটেই রাজি নই।

ভয়ানক কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া গেল শৈল। গদগদ কণ্ঠে বলিল, যান্! কি যে বলেন আপনি! একি কখনও বলা যায়?

—বল্‌তেই হবে আমাকে।

—বাপ মায়ের সামনে কেটে ফেল্‌লেও অমন কথা বলতে পারবো না আমরা।

যাইবার সময় কুমুদিনী শৈলকে বলিল, তুই দাদার বৌ হবি। দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব আমরা।

লজ্জায় শৈল মুখ অবনত করিল। সে একটি কথাও বলিল না।

—কুমুদিনী চলিয়া গেল।

শৈলর চেহারা গৌরবর্ণ। সে মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত, লাজুক প্রকৃতির, চেহারা কমনীয়। সে সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে।

(৮)

গতবারের জ্বরেই মোহিনীর শরীর একদম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জ্বর আজকাল হয় না যদিও, তবুও তিনি শরীরে একটুকও বল পান না। মুখে রুচি নাই। কাচারীর মাইলখানেক পথ অতিক্রম করিতেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। আফিসে খাতা লিখিবার সময় তিনি বারংবার অবসাদে মাথা লেখার টেবিলের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া থাকেন। বিকালে বাসায় ফিরিবার পথে তিনি কয়েকবার বসেন। মাথা তাঁহার ধরিয়াই থাকে।

তিনি গরম জলে স্নান করেন। রাত্রিতে ভাত খান না। দুধ খৈ খান। রাত্রিতে ঘুমানোর আগে সুশীলা স্বামীর মাথায় পুরানো ঘি দীর্ঘকাল ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া বসাইয়া দেন!

মোহিনীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভাব দেখিয়া সুশীলা ও শৈল মোহিনীকে তাজা করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সুশীলা বলেন, আজ পূর্ণিমা। রাত্রিতে কিছু খেতে পারবে না কিন্তু। কাল সকালে মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত রান্না করে দেব।

মেয়ে বলে, কেন ভাবেন বাবা? আমি বাতাস করি। আপনি ঘুমোন।

সুশীলা বলেন, অমন মুখ করে আছ কেন বলতো? ওরকম মুখ দেখলে যে আমার প্রাণ উড়ে যায়। কেন চিন্তে কর বল দেখি?

মোহিনী বলেন, চিন্তে তো করিনে।

—কর কর। তোমার মুখ দেখেই আমি সব বুঝতে পারি। বল চিন্তে কর কি না?

—চিন্তা না করে কি উপায় আছে সুশীলা?

—আচ্ছা কেন চিন্তা কর বল দেখি?

—বুঝি তো ভেবে কোন ফল নেই। তারি একটা মাত্র মেয়ে, তারই ভাল বর জোটাতে পারছিনে।

—ফুল ফুটলে আপনিই বিয়ে হবে। শরীরটা সারাও আগে, সব হবে। ভেবনা। মাথার দিব্যি, ভেব না।

—কাল পরেশ বাবুকে বলেছিলাম।

—বলেছিলে! বল কি! কি বা জবাব দিলে?
আমার তো ভয় হচ্ছে। আগেই বল্‌তে গেলে কেন আমাকে একবার না জিজ্ঞেস করে?

—দেখা হ'ল বল্‌লেম।

—বলেছ, ভালই করেছ। যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক্‌। কি বল্লেন তিনি?

—হেসে দিলেন মুখের ওপর আমার কথায়।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে পত্নী বলিলেন, তারপর? তুমি কি করলে?

—আমি আর কি করব? চলে এলেম।

স্বামীর অপমানে পত্নী নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন। বলিলেন, বটে! কত বড় লোক তিনি! ভয়ানক অহঙ্কারী তো! যেওনা আর ওঁর কাছে। কিসে ছোট আমরা? আর তুমি যে বড় হবে না তা কে বল্ল?

পত্নীর সহানুভূতির কথায় মোহিনী গলিয়া গেলেন। বলিলেন, আমিও তো সেরেস্তাদার হ'তে পারি সুশীলা।

—পারি কেন? নিশ্চয়ই পারবে। ভারি অহঙ্কার ভদ্রলোকের?

—আশ্চর্য্য সুশীলা, লোকের সাম্‌নে মুখের ওপর হেসে দিলেন তিনি!

—কি করা যাবে! দিয়েছেন, দিয়েছেন। যাক্, ভেব না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সুশীলা বলিলেন, তবে মা ও মেয়ে ও কথা বলেন কেন?

—কি বলেন?

—বলেন শৈলকে নেবেন ওঁরা?

—বিশ্বেস কর তুমি ওঁদের কথায়? বিয়ে দেবেন পরেশ বাবু, ওঁদের কি বলবার আছে।

—যা হয় হবে। একটা না একটা ভাল কিছু হবেই। ভেবো না।

স্ত্রীর কথায় মোহিনী আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা তাই ঠিক। হবেই একটা না একটা কিছু। কি বল সুশীলা? শরীরটা সারাই আগে।

—তাই কর। মনে খুব বল করো।

রাজসাহীর বাসা।

সুরেশ ভবনাথকে বলিল, ভবনাথ, তুই তোর বৌদির সঙ্গে কথা বলিস্‌নে কেন?

—বলিনে তো!

—আশ্চর্য্য!

—তিনি কি কথা বল্‌বেন?

—বলবেন না! অবাক্ করলি তুই আমায়! আশ্চর্য্য! সেকাল টেনে আন্‌লি তুই আমার বাড়ীতে।

ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই ভবনাথের সঙ্গে সুরবালার অসঙ্কোচে কথা চলিয়াছে।

বাহিরে নিমন্ত্রণ থাকায় আজ সুরেশ বাড়ীতে নাই। সুতরাং একলাই ভবনাথ ঘরের বারান্দায় আহারে বসিয়াছে।

সুরবালার মা নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।

ভবনাথ বলিল, কথা বলতেম না বৌদি, অনেক অসুবিধে ছিল। এখন জ্বালিয়েই মারবো দিনরাত আপনাকে।

সুরবালা বলিল, কি করে?

—এটা ওটা করতে বলে আপনাকে।

সুরবালা বারান্দার উনোনের চারিধার গোবর জল দিয়া লেপিতেছিল। সেই অবস্থায়ই সে ভবনাথের কথায় কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, সে ভয়ে কুণ্ঠিত নয় আপনার বৌদি, ঠাকুরপো। আপনারা যা করাবেন, হাসিমুখে আপনাদের বৌদি তাই করে যাবে।

—আচ্ছা দেখা যাবে।

—দেখবেন।

কিছুক্ষণ পরে উনোন লেপা শেষ হইলে সুরবালা উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবনাথের পাতের দিকে চাহিয়া বলিল, এ কি ঠাকুরপো! কিছুই যে খেলেন না আপনি?

— যথেষ্ট খেয়েছি।

— কোথায় খেলেন?

— দিয়েছিলেন কত, তা ভেবে দেখবেন একবার!

— কত দিয়েছিলেম! বৌদি নূতন মানুষ কিনা, তাই লজ্জা করে আপনার খেতে!

—নূতন মানুষ বৌদি মোটেই নন্, কেননা বিয়ে তো তাঁর আজ নূতন হয়নি।

—নূতন হয়নি বটে তবুও এতদিন অপরিচয়ের আড়াল ছিল। কিন্তু যতই যা বলেন, আজ লজ্জা করে কিছুই খেলেন না।

ভবনাথ সুরবালার মার দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাকেই সাক্ষী মান্‌ছি মা। আপনিই বলুন, খেয়েছি কিনা?

সুরবালার মা বলিলেন, কোথায় খেলে? সব ত পাতেই পড়ে রইল।

ভবনাথ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, খুব ত সাক্ষী মান্‌ছি আপনাকে!

সুরবালার মা বলিলেন, বৌদি আর দেওরে গল্প কর তোরা। আমি যাই।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরবালা বলিল, আচ্ছা ঠাকুরপো?

-বলুন

—খাওয়ার কি খুবই কষ্ট হয় আপনাদের বাসায় ?

—দুঃখ কষ্ট কিছু বুঝিনে বৌদি, যা পাই, তাই খাই।

—আচ্ছা রান্নার ঠাকুর কি আপনাদের খাইয়ে আনন্দ পায় না ?

ভবনাথ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, হাসালেন যে বৌদি, রান্নার ঠাকুর পাবে খাইয়ে আনন্দ !

—কেন আমরা যে পাই ?

—আপনাদের কথা ছেড়ে দিন। মেয়েদের ভেতরই বা কয়জন আছে যারা আনন্দ পায় ? আমি শিক্ষিতা মেয়েদের কথা বল্‌ছি।

—আমাদের তবে কি একদম অশিক্ষিতের দলে ফেলতে চান ঠাকুরপো ?

ভবনাথ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, না, না, বৌদি, আমি কলেজে-পড়া বাবু মেয়েদের কথা বল্‌ছি।

—কেন ?

—আপনি ঐ ধরণের মেয়েদের কথা হয় ত জানেন না। রান্না তো দূরের কথা। তাঁরা স্বামীদেরও সমীহ করে চলেন না।

—যাক্ আপনি যা তা বল্‌বেন না মেয়েদের সম্বন্ধে। রাজসাহীতে কি পাশ-করা মেয়ে নেই ?

—এখানকার কথা আলাদা। আমি কলিকাতার কলেজে-পড়া মেয়েদের কথা বল্‌ছি। ভাল মেয়ে আপনারা। কি করে বুঝবেন আপনারা কি স্বভাবের ঐ বিবিরা ?

—আবার যা তা বলছেন আপনি মেয়েদের সম্বন্ধে। মেয়েদের সম্বন্ধে ওরূপ ভাষা ব্যবহার করতে আমি কিছুতেই দেব না জানবেন।

—আচ্ছা নাই বা দিলেন। তবে এটাও ...ব দেখবেন বৌদি, গেরস্তর ঘরে উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাই ডিয়ারি ভাব করে থাক্‌তে চায় ওরা।

—যাক্ ওদের কথা দিয়ে কি হবে আমাদের! আপনি যাচ্ছেন কবে কল্‌কাতায়?

—কাল।

—আবার আসবেন কবে?

—সকালে আস্‌ছিনে। হয় ত আসবার আদৌ প্রয়োজন নাও হ'তে পারে।

—তার মানে?

—সুরেশদা কলকাতায় বাসা করবেন, আপনাদের নিয়ে যাবেন।

কথাটা ভবনাথ একটু বক্রভাবে মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল।

সুরবালা বলিল, ঠাট্টা করছেন ঠাকুরপো?

—কেন?

—ও রকম ভাবে হাসলেন যে?

ভবনাথ লজ্জিত হইল। বলিল, না, না, ওভাবে নেবেন না, ও হাসিটা। সত্যি কথা বল্‌তে কি ব্যবসাটা যে রকম দাঁড়াচ্ছে তাতে সকালেই কল্‌কাতায় বাসা হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরবালা বলিল, অত সুখ চাইনে ঠাকুরপো! আমি যেন ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি রেখে আপনাদের পাঁচজনার সেবা করে মরতে পারি।

শৈল পরিচিত ঘরের মেয়ে, রূপবতী। শৈলর সঙ্গে সুরমা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন। শৈলকে মনের মত করিয়া তিনি গড়িয়া লইতে পারিবেন। এই সব ধারণায় তিনি শৈলকে পছন্দ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু সব আশায় বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন স্বামী।

পরেশ এক দম বাঁকিয়া বসিলেন। সুরজিৎ বাবু প্রসিদ্ধ উকিল। তিনি তাঁহার মেয়ের সঙ্গে সুবিমলের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সুবিমলের বিবাহ সুরজিৎবাবুর মেয়ের সঙ্গে দেবেন। সুতরাং গরীব মোহিনীর মেয়ের কথা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কুমুদিনী ও সুরমাকে সুরজিৎবাবুর কন্যা দেখিতে যাইতে হইল।

মেয়ে দেখিয়া ফিরিবার পথে মা ও মেয়ে সুরবালাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সুরমা সুরবালার মা'র ঘরে গিয়া বসিলেন।

সুরবালা তখন নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। দরজা পিছনে থাকায় দরজায় কি ঘটিতেছে তাহা তাহার দেখিবার সুযোগ ছিল না।

কুমুদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইয়া সুরবালার পিছনে পৌঁছিয়া দুই হাত দিয়া সুরবালার অলক্ষ্যে তাহার দুই চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

সুরবালা বুঝিতে পারিল। বলিল, আমি বুঝি আর চিনতে পারছিনে! কুমুদিনী?

কুমুদিনী হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল। সে আজ নূতন সাজে সাজিয়া আসিয়াছিল।

সুরবালা বলিল, বেশ মানিয়েছে তো!

'বটে !' এই বলিয়া কুমুদিনী গিয়া ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সাম্নে দাঁড়াইল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিকই বলেছিস্ তো ? বেশ মানিয়েছে তো আমাকে। মনে হচ্ছে আয়নার ছবিকে আমি বিয়ে করি।

সুরবালা বলিল, কি যে বলিস্ তুই ! যাক্। কোথায় গিয়েছিলি এত সাজগোজ করে ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুমুদিনী বলিল, অভিসারে।

ঠাট্টা রেখে দে ভাই। কোথায় গিয়েছিলি ?

কুমুদিনী জোরে বলিয়া উঠিল, বল্লেমই তো অভিসারে !

পরিশেষে সুরবালার পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে কুমুদিনী সব কথা খুলিয়া বলিল।

সুরবালা বলিল, কেন, শৈলর সঙ্গে না তোর দাদার বিয়ে হবার কথা ছিল ?

—হ'ল না।

—কেন ?

—যাঃ বড় বিরক্ত করিস্ তুই ! এই মাত্র বলি হ'লনা, হ'লনা।

সুরবালা ভাবিতে লাগিল ! কুমুদিনীও ভাবিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে সুরবালা এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, একটা পান খা।

কুমুদিনী পান খাইল। পানের পিক ঠোঁটের দুইপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া সুরবালা সেই পিক মুছাইয়া দিল।

কুমুদিনী বলিল, বড় নোংরা তুই ভাই। একখানা রুমাল রাখলেই পারিস্।

—হাতের কাছে যে নেই একখানাও।

—বললে কি হবে! আদতেই তুই নোংরা। ভারি নোংরা। একেবারে ক্যাডাভ্যারাস।

ইহার পর কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে কুমুদিনী বলিল, কি বই পড়ছিলে ভাই?

—দেখলেই পারিস।

কুমুদিনী দেখিল, কৃষ্ণকান্তের উইল।

কুমুদিনী বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। দেখিল সুরবালা লাইনের ধারে ধারে নিজের মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছে।

মন্তব্যগুলি পড়িয়া কুমুদিনী বলিল, রোহিনীকে নিন্দে করেছিস্ কেন? যদিও বঙ্কিম বাবু আমি আজ কাল পড়িনে। বড় সেকেলে লেখা। কেন নিন্দে করেছিস্?

—কেন রোহিনী কি নিন্দের যোগ্য নয়?

—কি করে শুনি?

—কেন, সে যে বিধবা!

—বিধবা কি মানুষ নয়? বিধবার কি প্রাণ নেই? রোহিনী গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। কি হয়েছিল তাতে?

—তাই বলে যেখানে সেখানে ভালবাস্তে হবে?

—না ভাই সুরবালা, তুই বড় সেকেলে। বড় বাজে বকিস্ তুই। এইখানেই তোর সঙ্গে আমার মেলে না। আজ কাল মেয়েরা চাচ্ছে নূতন ভাবে থাক্‌তে ও ভাবতে। তারা চাচ্ছে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে।

সুরবালা হাসির ভাবে বলিল, বাঃ কুমু বেশ তো তুই বক্তৃতে করতে জানিস্। বক্তৃতে কর গিয়ে সভায় দাঁড়িয়ে। সকলে হাততালি দেবে। বলবে মিস্ কুমুদিনী চৌধুরী মস্ত— মস্ত একটা নেতা।

—পারিনে বুঝি বক্তৃতে দিতে ?

—পারিস্‌নে বল্‌ছিনে। তবে আমার বড়ই ভয় হয় কিবা করে ফেলিস্‌ তুই একটা কিছু। একদিন বিলেতে পালিয়ে না যাস্‌!

কুমুদিনী সুরবালার গালে ছোট একটা চড় বসাইয়া দিল। সুরবালা মুখ ফিরাইয়া লইল। পরে বলিল, যাই বল ভাই বিয়ে কিন্তু তোমার এখনই হওয়া উচিত।

—আমার বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে।

—কার সঙ্গে ?

—মরণের সঙ্গে।

—ঠাট্টার কথা নয় ভাই।

—একটু ফাঁকে রসিকতা করে নিলেম। তবে এটা সত্যি কথা আমার বর ঠিক হয়ে আছে।

—কে শুনি ?

—বল্‌বো কেন ? বলে দাও যদি তুমি ?

—না দেবো না।

—তিনবার সত্যি কর আগে।

সুরবালা বলিল, সত্যি, সত্যি। এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

কুমুদিনী বলিল, আচ্ছা বলি তবে। খবরদার কাউকে যেন বলিস্‌নে। আমার বর, ভবনাথ বাবু।

এই বলিয়া কুমুদিনী ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। সুরবালা আঁচল ধরিয়া কুমুদিনীকে থামাইতে চেষ্টা করিল।

কুমুদিনী আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া ফিরিয়া ঋজুভাবে দাঁড়াইল। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের তর্জ্জনী নখটা সুরবালার সামনে খাড়া করিয়া ধরিয়া বলিল, আজ নাটক করতে এসেছিলেম, নাটকই করে গেলেম।

এই কথা বলিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুর্জ্জয় সাহসে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, দ্যাখো ভাল হ'ল কি এ কাজটা ?

পরেশ নিবিষ্ট মনে চা পান করিতেছিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

পরে চা খাওয়া শেষ হইলে কাপটা টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র 'হুঁঃ' এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

স্ত্রী আজ মরিয়া হইয়াই আসিয়াছিলেন। বলিলেন, যা বল্‌ছি শুনেছ তো ?

—শুনেছি।

—কি বল্‌তে চাও তুমি তবে ?

—তুমি কি বল্‌তে চাও শুনি ?

—বল্‌তে চাই সুরজিৎ বাবুর মেয়ের সঙ্গে ঠিক করে ভাল করলে না। কালো সে মেয়ে।

'কালো' এই কথাটা অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করিয়া চোখের দৃষ্টি থর করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

স্ত্রী বলিলেন, কথা বলো না যে ?

—কি বলবো ?

—আমার কথার উত্তর ত একটা চাই।

—কি উত্তর দেব ? দেবার কি আছে ?

—একেবারেই নেই ?

—না

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে কুমুদিনীর মা বলিলেন, শৈলর সঙ্গে কেন বিয়ে দেবে না ? শৈলর মত একটা মেয়ে দেখেছ কোথায়ও ? কি সুন্দরী সে !

—সুন্দরী! রেখে দাও তোমার সুন্দরী!

—কেন?

—শুধু সুন্দরী দিয়ে কি করবো আমি! সুন্দরী!

—তার মানে?

পরেশ চটিয়া গেলেন। জোরে বলিয়া উঠিলেন, বোঝ না কিছু, তবুও কথা বল্‌বে। ছেলের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না! সে মেয়েরও ত গঠন ভাল।

সুরমা দমিলেন না। বলিলেন, কালো যে মেয়ে। বিমল লেখা-পড়া শিখেছে। একটা যা হয় কিছু করবে।

—করবে! করা এতই সস্তা! হুঁঃ! কত বি-এ, এম-এ রাস্তায় গড়াচ্ছে জান? 'যা হয় কিছু করবে'! কথাটা বলে ফেললে তো ফস্ করে! চল্লিশ টাকার কেরাণী! আমার আফিসে! কত এম-এ উমেদারী করছে জান?

—লেখা পড়া করছে ও। ওর পথ ও করে নেবে। তোমার কাছে ও উমেদারী করতে আসবে না। তা ছাড়া ও শৈলকে ভালবাসে।

—সব নভেলী কথা ওসব। ভালবাসা!

—তবে কি তুমি আমায় ভালবাস না?

—আঃ, কি যে সব বাজে বক! যা বোঝ না তাই নিয়ে শুধু তর্ক করবে! আমি কি তোমার আমার ভালবাসার কথা বল্‌ছি?

—তবে কি বল্‌ছ?

—কি জ্বালাতন! কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমার কাছে আমার?

—কৈফিয়ৎ দিতে হবে বই কি। আজ কৈফিয়ৎ চাই। কি বলতুছ মি?

পরেশ কোন উত্তর দিলেন না। বিষম বিরক্তিতে অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ সুরমা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি যে ওদের কথা দিয়েছি।

পরেশ ছিটকাইয়া উঠিবার ভাবে বলিলেন, কেন দিলে?

সুরমা মরিয়ার সুরে বলিলেন, দিয়েছি। আমি মা। আমার অধিকার আছে।

এতটা সাহস করা উচিত হয়নি তোমার। ওই মোহিনীটার যে স্বাস্থ্য, ওতো মরলো বলে। ভেবে দেখেছ তো? তখন যে মোহিনীর বৌটা এসে ঘাড়ে পড়বে আমার।

—একথা কখনও বলো না। জমি-জমা আছে ওদের। ঘাড়ে চাপতে যাবে কেন সে?

—মোহিনীর বৌকে ত আমি চিনি। ভারি চালাক সে। তোমাদের বুঝিয়েছে ওদের দেশে জমি-জমা আছে। ছাই আছে। যা কিছু আছে তা মোহিনীর ভাই খায়। মোহিনী কলা! এক পয়সাও দেয় না।

—দরকার হয় না ত্যায় না। দরকার হলে দেবে। ভাই কি ভাইয়ের বউকে চারটি ভাত দেবে না!

—যাক্ যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মোহিনীর ভাই! ও একটা পাড়াগাঁয়ের ঘুঘু। ভাত যা দেবে মোহিনীর ভাই মোহিনীর বৌকে তা আমি বেশ জানি। আমি পরেশ চৌধুরী। কত দেখেছি আমি। সকলকেই আমি চিনি। হুঁঃ। ভাত দেবে! এতই সস্তা ভাত দেওয়া! যাক্ তা বলে লাভ নেই। তবে জেনো আমি কিছুতেই শুধু মেয়ের রূপ দেখে ছেলের বিয়ে দিতে পারবো না। সুরজিৎ-বাবু বড় উকিল। তিনি কুটুম্ব হলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে।

ছেলেরও ভবিষ্যৎ ভাল হবে। নরেশ নাজিরের ছেলে! কি লেখা পড়া তার! আই, এ পাশ! আজ সে সব-ডেপুটি! শ্বশুর তার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট! সুরজিৎ বাবুর কাছে থেকে অনেক সাহায্য ও পাবে।

—চাইনে সাহায্য! কুটুম্বের সাহায্য নিয়ে কি হবে? মেয়ে চাই ভাল। এই বিয়েই তোমাকে দিতে হবে। এ বিয়ে না দিলে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। দিতেই হবে এ বিয়ে।

—না কিছুতেই দেব না। আমি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি। তুমি বাজে কথা বলো না।

সুরমা স্বামীর ব্যবহারে মুষড়িয়া গেলেন। স্বামী চলিয়া গেলে তিনি সুদীর্ঘকাল গালে হাত দিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

(১২)

তখন স্বদেশী আন্দোলন। সাড়া দেশ জুড়িয়া হুজুগ চলিতেছিল। রংপুর কলেজের ছাত্রেরাও সে হুজুগের বাহিরে থাকিতে পারে নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

'চালাকী দ্বারা মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না', 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা অনেক সময়ে ভাল', এই দুইটী কথা সুবিমল প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সে পুনঃ পুনঃ সংকল্প করে যে সে অসরল কপটতার পথ পরিত্যাগ করিয়া সরলতার সোজা পথ জীবনে অনুসরণ করিয়া চলিবে। প্রাণপণে সে মনে করে যে শরীরটাকে লোহার মত দৃঢ় করিয়া সে মানুষ হইয়া উঠিবে। সে অবিচলিত দৃঢ়তায় সংকল্প করে যে সে মানুষ হইয়া

জন্মিয়াছে ; সাধারণ মানুষের মত মহামূল্য জীবনটা সে শুধু আহার নিদ্রায় কাটাইয়া দিবে না। এমন কিছু বড় কাজ জীবনে সে করিবে যাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় নারীপ্রেমের কোমল সুর হৃদয়ে স্থান পায় না। তা ছাড়া এই সময়ে প্রচারকেরা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেন যে যদি কাহাকেও আত্মার ও মনের প্রকৃত উন্নতি করিতে হয় তবে তাহাকে কামিনী আর কাঞ্চন, এই দুইটি জিনিষ কঠোরতার সঙ্গে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে।

সুবিমল শৈলকে ভাল বাসে নাই। তাহার কারণ সেই সময়ে ভালবাসার সমস্ত ভাব উগ্র মতবাদ ও তাহার চেয়েও উগ্র মানসিকতার চাপে সুবিমলের মনে ঘুমাইয়া ছিল। উহা সংযমের প্রচণ্ড কশাঘাতে সুবিমলের মনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। তবে শৈল ভাল মেয়ে। যদি কাহাকেও বিবাহ করিতে হয় তবে শৈলর মত মেয়েকেই করা উচিত। শুধুমাত্র এই কথা সুবিমল বলিয়াছিল। সুরমা ছেলের এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই ভাবিয়াছিলেন ছেলে শৈলকে ভালবাসে।

(১৩)

কলিকাতার আফিসে সুরেশ ভবনাথকে বলিল, লেখা হয়েছে দলিল ভবনাথ ?

— না হয়নি। হরিময় বাবু আসেন নি।

সুরেশের কোম্পানী আগের বৎসরে মুশিদাবাদে এক কুলগাছের বাগান কিনিয়াছিল। সেই বাগান হইতে এবার বেশ লাভ পাওয়া

গিয়াছে। তাহারা এবার নূতন করিয়া পাঁচশত বিঘার এক বাগান কিনিবার সংকল্প করিয়াছে। হরিময় বাবু দালাল।

সুরেশ বলিল, তাড়াতাড়ি জমির দলিলটা শেষ করে ফেল। এ জমি হাত-ছাড়া হ'লে কিন্তু এর জুরি মিলবে না।

ভবনাথ কি যেন ভাবিতেছিল। বলিল, সে ঠিকই।

—হরিময়বাবু কি আসবেন আজ?

—কথা তো আছে আসবার।

—আসবেন ত! কিন্তু আমাকে যে একটা কাজে বেরুতে হবে এখনই। না গেলেই নয় যে। আর আমার থাকবার প্রয়োজনটাই বা কি আছে? তুমি থাকলেই তো হ'ল।

—তবুও আপনার থাকাটা কি উচিত নয়?

—আচ্ছা আমি একটু পরেই ফিরে আসতে চেষ্টা করবো। দৈবাৎ যদি না আসতে পারি তবে কাজটা ফেলে রেখনা কিন্তু। ভাল কথা মনে হয়েছে। আমরা যে শতকরা পাঁচিশ লাভ দেব এ কথাটা যাই বলো বিজ্ঞাপনে লেখাটা যুক্তিসঙ্গত হয়নি, কেননা নূতন জমি কিনতে যাচ্ছি সেয়ার ক্যাপিট্যাল ভেঙ্গে বললেই হয়। কয়েক বছরের মধ্যে লাভ যে আমরা এক পয়সাও দিতে পারবো তাতো মনে হয় না। অংশীদারের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কি?

—আমিও ভেবে দেখেছি দাদা। ও লেখাটা বাস্তবিকই আমাদের উচিত হয়নি।

—বুঝতে পারলে এখন? আমি আগেই জানি তোমরা পরে সব বুঝতে পারবে।

ভবনাথ শুষ্কমুখে কি যেন ভাবিতেছিল। যাইবার পূর্ব্বে সুরেশ সেই শুষ্কভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ভবনাথ ?

—না।

—মুখটা যে খুব শুক্‌নো দেখাচ্ছে। সত্যি অসুখ হয়নি তো ?

—না।

সুরেশ চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে হরিময়বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভবনাথ বলিল, বড্ড ভাবিত হয়ে গিয়েছিলেম হরিময় বাবু ভেবে আপনি বোধ হয় আজ এলেন না। এত দেরী করলেন কেন ?

—দেরী হয়েছে কি ?

ভবনাথ আফিসের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, না দেরী ত মোটেই হয়নি। তবে বুঝলেন কি না হরিময় বাবু, বড্ড ভয় হয় শেষে সব নষ্ট হয়ে যায় বুঝি।

এই বলিয়া সে চাকরকে ডাকিয়া দুই কাপ চা ও দুইটা টোষ্ট আনিতে হুকুম দিল।

চা আনা হইলে কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে ভবনাথ টোষ্ট চিবাইতে চিবাইতে বলিল, আগে না এসে খুব ভাল করেছেন হরিময় বাবু। পাগলের হাতে পড়েন নি। বেঁচে গিয়েছেন।

—পাগল কে ?

—আপনাদের গুণধর সুরেশবাবু, সুরেশ পাগলা। কল্‌কাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জানোয়ার একটা। কিছু বুঝবে না। অথচ বোঝাতে চেষ্টা করবেন উনিই সব বোঝেন। এ কোম্পানীর কি অবস্থাটা হ'ত হরিময় বাবু বলুন দেখি আমি না থাকলে ? পঞ্চাশ গণ্ডা এম, এর বাবারও সাধ্য ছিল না, আমি বলে দিলেম, এ ব্যবসাটা দাঁড় করায়।

—কেন ছিল না ?

ভবনাথ চটিয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, এত সোজা নয় দাদা! এত সোজা নয়! হুঁ! এম, এ! ব্যবসা জিনিষটা সোজা নয় ভাই! আমি এখনই এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারি, এই আমি, এই ভবনাথ সান্নেল, যে দশ গণ্ডা এম, এরও সাধ্যি নেই যে বের হয়।

—সে কি ভাই বুঝিনে! একটু রসিকতা করলেম। যাক্ পেয়েছ ভাল। এই সময় কিছু গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়।

—তারপর? সব ঠিক হয়েছে?

—হয়েছে। দশ হাজার টাকা জমির মালিক চায়।

—তা হলেই সে দলিল লিখে দেবে সমস্ত টাকার?

—সমস্ত টাকার দলিল লিখে দেবে?

—তাতে আমাদের ভাগে পড়বে কত?

—বিশ হাজার টাকা তোমার। আমার পাঁচ হাজার।

ভবনাথ বলিল, বেশ!

—আমার ভাগেই কম পড়ল।

—ভাবনা কি তাতে আপনার! কোম্পানী যে কামধেনু। এর পরও সুযোগ আসবে। সুরেশ পাগলা পাগলা হলেও লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে। ইউনিভারসিটির বড় ছাপের বাহিরে একটা মূল্য আছে তো! শেয়ার এ কোম্পানীর সবই বিক্রি হয়ে যাবে। কোম্পানী চলবেই। এর পর আপনার যথেষ্ট হবে।

—সেই ভেবেই তো রাজি হলেম!

ইহার পর কিছুক্ষণ কোন কিছু কথা হইল না। হরিময় নিজের প্যাকেট হইতে একটা সিগারেট নিজে লইয়া অপর একটি ভবনাথকে দিলেন।

সিগারেট টানিতে টানিতে ভবনাথ বলিল, বাগানটা কেমন ?

—ছেড়ে দাও।

—কিছু করা যাবে না ?

—বোধ হয় না। তবে কি ইচ্ছে নেই তোমার ?

—না, না, তা বলছিনে। ভবনাথ সান্নেল এমন বোকা নয় যে এই সুযোগ ত্যাগ করবে।

—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি সুরেশ বাবুর কত অপযশ হবে এতে ?

—মরুকগে আপনাদের সুরেশবাবু। সে আমার কে মশায় ? বুঝে দেখেছি এ পৃথিবীতে টাকাই সব। দেখুন না এই কোম্পানীর সুরেশ বাবু মনিব, আমি চাকর। কেন ? তার টাকা আছে। আমি বাবু সাহেবের অন্নদাস। কারণ আমার টাকা নেই। আমি গরীব। বাবুসাহেব যা আমায় বলবেন তাই আমায় মানতে হবে। কিসে কম আমি ঐ পাগলাটার চেয়ে ? ভারি তো চেহারা! ভ্যাবা গঙ্গারাম। ভারি পাজি লোক মশাই ! ভাল সাজে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার জন্যে। ভেসে যাক্ সুরেশবাবু। তাতে আমার কি ? আমি এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করবো না।

—খুসী হলেম শুনে। যাই তবে আমি। লোকটা একটু পরেই আমার বাসায় আসবে কিনা। যাই আমি। কি বল হে ? লোকটা শেষ পর্য্যন্ত রাজি থাকলেই বাজি মাৎ। কি বল হে ?

ভবনাথ হাসিয়া বলিল, বেশ, বেশ ! তাড়াতাড়ি যান। চাই কিন্তু আজকার ভেতরেই কাজটা শেষ করে ফেলা। কিন্তু সাবধান এমন কিছু কাজ না করে ফেলেন যাতে আমরা ফ্যাসাদে পড়ি।

কথাটা এই কোম্পানী এক লক্ষ টাকা দিয়া জমি কিনিবে। জমির প্রকৃত মূল্য পঁয়ষট্টি হাজার। মালিক পঁচাত্তর হাজার টাকা লইয়া এক

পক্ষের দলিল লিখিয়া দিবে। পাঁচিশ হাজার টাকা ভবনাথ ও হরিময় ভাগ করিয়া লইবে।

১৪)

স্বামীর নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে সুরমা একদম ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন তিনি আর একবার স্বামীকে চাপিয়া ধরিবেন।

কিন্তু চাপিয়া ধরিবার পরও তাঁহার ভাগ্যে স্বামীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানই ঘটিল। স্বামী কিছুতেই রাজি হইলেন না। চোখের জলে সুরমার গাল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এই সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল কুমুদিনীর সম্পূর্ণ অগোচরে। সুরমাও কুমুদিনীকে কিছু বলেন নাই। কুমুদিনী জানিতে পারে নাই মাতা শৈলর স্বপক্ষে ওকালতি লইয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

সেইদিন অপরাহ্নে সুরমা নিজের ঘরের বিছানায় বসিয়া অবনতমুখে কার্পেটের উপর উল দিয়া একখানা আসন বুনিতেছিলেন। কুমুদিনী কাছেই বসিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কুমুদিনী বলিল, কাজটা কি ভাল হ'ল মা? এই শৈলর সঙ্গে দাদার বিয়ে না দেওয়াটা?

সুরমা কোন উত্তর দিলেন না, মুখও তুলিলেন না।

কুমুদিনী মা'র কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে উল্টাদৃষ্টিতে চাহিয়া জোরে বলিল, ওমা, কথা বলনা কেন?

সুরমা ক্রুদ্ধ হইয়া অসীম বিরক্তিতে মেয়ের দিকে পিছন ফিরাইয়া বসিলেন।

পরিশেষে মেয়ে ধৈর্য্য না রাখিতে পারিয়া মা'র হাত হইতে আসনখানি টান দিয়া কাড়িয়া লইল।

সুরমা বলিলেন, ছাখ কুমুদিনী, বড় বাড় হয়েছে তোর।

—তা তুমি কথার জবাব দেও না কেন?

—সে আমার ইচ্ছে। দে আসন দে!

—না দেব না। জবাব দাও আগে।

—কি জবাব দেব?

—এই যে সুশীলা মাসিমার কাছে বড় গলায় বল্লে শৈলকে তোমরাই নেবে সেখানে মুখ থাকলো তোমার কোথায়?

সুরমা নিরুত্তর রহিলেন।

এই সময়ে বাহিরের দরজায় যেন ঘা পড়িল।

মা'র হাতে আসন ফিরাইয়া দিয়া কুমুদিনী বলিল, এই বাবা এসেছেন। তুমি না পার, আমি গিয়ে বলবো এখন।

এই কথা বলিবার পর কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল।

সুরমাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুমুদিনীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, যাস্‌নে কমু, যাস্‌নে।

—কেন যাবো না শুনি?

মাতার বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় কুমুদিনীর মা'র সঙ্গে একটু ছোটখাটো রকমের ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। তাহার মা হঠাৎ ছিটকাইয়া গিয়া তক্তপোষের উপর পড়িয়া গেলেন ও কপালে তক্তপোষের কাঠে লাগিয়া তিনি গুরুতর আঘাত পাইলেন। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, উঃ, বাবা গো!

এই ঘটনায় কুমুদিনী বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মা'র উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, খুব লেগেছে মা?

—উঃ, খুব লেগেছে। একটু চুপ কর।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া সুরমা উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। পরে চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, আচ্ছা কুমু, চিরদিনই কি তোকে দিয়ে আমার কষ্ট পেতে হবে মা?

—কেন, আমি কি করেছি?

—আমার কথা না শুনে কেন কর্ত্তার কাছে যেতে চাইলি বল্‌তো!

—সে হয় ত আমার দোষ। আমি যা ভাবি তা আমি না করে যে থাকতে পারিনে।

—কেন পারিস্ নে?

—কেন বাবাকে বল্‌লে দোষের হবে? কেন তুমি বাবাকে মত দিলে?

—আপনি মত দিয়েছেন! এক রোখা মানুষ, নিজের মতটাই বহাল রাখলেন। কেবলই বলেন বড় একটা সহায় হবেন ছেলের সুরজিৎ বাবু।

—ছাই হবেন! মেয়ের মুখ যা তুমি দেখবে?

এই কথা বলিয়া কুমুদিনী সোজা হইয়া বসিয়া মুখ বিকৃত করিয়া মেয়ের মুখ অনুকরণ করিল।

সুরমা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, পাগলী মেয়ে। এতও পারিস্! ভেবে পাইনে তোর কি যে হবে!

কুমুদিনী বলিল, আচ্ছা তুমিই বল শৈল কি খুব ভাল মেয়ে নয়?

—ভাল তো সবাই বলবে।

—এবার খুব বুঝিয়ে বলবো। রাগারাগি করবো না। আর রাগারাগি না করলে যে বাবার মত লোক কিছু বোঝে না।

—না, না, তুই কিছুই বলতে পারবিনে। ওঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।

(১৫)

দলিল শেষ হইয়া গেলে ও টাকা দেওয়া হইয়া গেলে পর সুরেশ ভবনাথকে বলিল, অনেকে বলছে এত টাকা দিয়ে বাগান কেনা আমাদের উচিত হয় নি।

—বাগানটা কিনেছি আমরা খুব সস্তায় দাদা। একজন সাহেব দাদা, এই বাগানের জন্য দেড় লাখ টাকা পর্য্যন্ত উঠতে রাজি ছিলেন।

সুরেশ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বলিল, বটে! কি করে জানলে?

—তাঁর ম্যানেজার সেদিন আমায় বলেছিলেন।

সুরেশ কৌতূহলের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কতকটা উচ্চ হাসির ভাবে বলিয়া উঠিল, বটে! খুব তো জব্দ হয়েছে সাহেবটা! তারপর?

—আমরা খোঁজটা তাড়াতাড়ি পেয়েছিলেম বলে আমরা বাগানটা পেয়েছি।

উৎফুল্ল হইয়া সুরেশ বলিল, বেশ! অন্ততঃ এইটুকু বোঝা গেল আমরা ঠকিনি। এখন ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে সেইটেই কথা।

—কেন?

—ভবিষ্যৎকে মোটেই বিশ্বেস করতে নেই। তবে বর্ত্তমান ভাল। ভবিষ্যৎ খারাপ নাও হতে পারে।

—খারাপ কিছুতেই হবে না। আমরা তো কাউকে দুপয়সা ঠকিয়ে নিচ্ছিনে। অন্যায় আমরা কিছু করিনি। অন্যায়ের ভেতর যা কিছু

করেছি ওই বিজ্ঞাপনে বেশী লেখাটা। তা একটু বেশী বেশী লিখতেও হয়। ভেবে দেখবেন দাদা।

—ভবনাথ কথাটা বেশী বলায় তিক্ত হয়ে গিয়েছে। তবুও ওই লেখাটাকে তোমার চেয়ে যথেষ্ট বেশী দোষের মনে করছি আমি। পাপ যা তা চিরকালই পাপ। আমাদের এ কাজে বিন্দুমাত্র পাপও ঢুকতে দেবনা আমরা।

—আচ্ছা দাদা, আমরা যদি আমাদের ভুল সংশোধন করে ঠিকটাই প্রচার করে দেই এখন ?

—তাই দাও। প্রচার অনেক দূর করা হয়েছে। এখন শোধরাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে। যাক্ ভবনাথ তুমি আমাব ছোট ভাই। আমি যা করবো, বা ভাববো, তা তুমি আপনা আপনিই করবে বা ভাববে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য আমি এত নির্ব্বোধ নই যে তোমার মত গ্রহণ করবো না।

—সে কি আমায় একবার করে বল্‌তে হবে দাদা। আপনারা আমার যা করেছেন !

সুরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, না, না, ওসব বাজে প্রশংসার কথা কিছুতেই বলতে পারবে না বলছি।

—বা ! যা সত্যি তা বলবো না !

—সব মিথ্যে যা তুমি বলছ। বিশেষ কিছু আমরা তোমার করিনি। যেটুকু অল্প করা হয়েছে সেটুকু করা হয়েছে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে।

এই কথার পরে উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। পরিশেষে ভবনাথ বলিল, দাদা বাগানটা আপনি নিজে গিয়ে দেখুন না একবার।

—তুমিও তো দেখেছ।

—দেখেছি তো। তবুও—

—তবুও কি? নিজে দেখেছ, বিশেষজ্ঞের মতও নিয়েছ।

তবুও দৈবাৎ যদি কাজটা অচল হয়ে যায়, যদিও আমি বলিনে আপনি ভাববেন, তবুও—

—হেঁয়ালি ছেড়ে দাও। তবুও মানে?

—তবুও, যদিও আমি বলিনে, আপনি ভাবতে পারেন।

—বলনা সোজাসুজি। তবুও মানে। কি ভাবতে পারি আমি?

—আমার জন্যেই এটা হ'ল।

ভবনাথের এই কথায় সুরেশের মনে ধাক্কা লাগিল। বলিল, বেশ. শুনে সুখী হলেম। তোমার উপযুক্তই বটে! আচ্ছা ভবনাথ, তুমি আমায় এত দিনেও চিনতে পারনি ভাই? আমি কোনও দিন এইরূপ ভেবেছি বা ভাবতে পারি?

—ভাবেন নি তো।

সুরেশ দৃঢ়ভাবে বলিল, আমি স্পষ্ট করে বলছি ভবনাথ আজ যে তোমার কাজ আমারই কাজ। যদি কোন কারণে কাজটা খারাপে দাঁড়ায় তবে জানবে তার জন্যে দায়ী আমি, তুমি নও।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হৃদয়ে যে উচ্চ ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল তাহা ভবনাথ বুঝিতে পারিল না। সুরেশ চলিয়া যাইবার সময় ভবনাথ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

(১৬)

লোকে বলে দৈব যখন বিপক্ষে যায় তখন মানুষের চেষ্টা কাজে লাগে না।

মোহিনী দুর্দ্দিনের জন্য পরিমিত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সহসা তিনি নূতন রোগ বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শরীরের

কল কজাগুলি অচল হইবার উপক্রম করিল। একজনের জন্য অচল হইয়া পড়িলে অনেকের মুখে অন্ন উঠিবার উপায় নাই। সেই মহামূল্য জন্যা ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাইল। সুশীলা প্রত্যহ তুলসী তলায় গলবস্ত্রে মানত করিতে লাগিলেন কিন্তু মোহিনী আর আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা দেখাইলেন না।

বাধ্য হইয়া মোহিনী ছয় মাসের ছুটি লইলেন অর্দ্ধেক বেতনে, অথচ অর্দ্ধেক বেতনে সংসার একেবারেই চলে না।

সুরজিৎ বাবুর মেয়ের সঙ্গে সুবিমলের বিবাহের প্রস্তাবের কথা মোহিনী আগেই শুনিয়াছিলেন। এদিকে কঠিন অন্ন সমস্যা, ওদিকে তার চেয়েও কঠিন কন্যাদায়। কোন সমস্যার সমাধানই সহজ বলিয়া মনে হইল না।

যাহা হউক বিপদের উপস্থিত প্রতিকার মোহিনী করিলেন। তিনি রাজসাহীর ছোট বাসাটী বন্ধক দিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিলেন।

ছয় মাস পরে তিনি অনেকটা ভাল হইলেন। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি কাজে যোগ দিতে বাধ্য হইলেন বটে কিন্তু শরীর অপটু থাকায় তিনি দ্রুত কোন কাজ করিতে পারেন না। তাঁহার সব সময়ে মাথা ঠিক থাকে না। সেইজন্য কাজে যথেষ্ট ভুল চুক ঘটিয়া যায়।

উপরের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অনুযোগ আসিতে লাগিল। ফলে তাঁহার ভুলের মাত্রাও বাড়িয়া গেল।

পরিশেষে ইংরেজ কালেক্টার একদিন তাঁহাকে বরখাস্ত করিবেন বলিয়া এমন চাপ দিলেন যে তিনি চাকরী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বেচ্ছায় চাকরী ত্যাগ করার ফলে তাঁহার পেন্‌সনটী বজায় রইল।

সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যার ঠিক আগে সুশীলা ও শৈল রান্নাঘরে জল খাবার তৈরি করিতেছিলেন।

বাহিরে শব্দ শুনিয়া সুশীলা বলিলেন, বাবু এসেছেন বোধ হয়। শৈল বলিল, বোধ হয়।

—যা তাড়াতাড়ি।

—যাই।

শৈল তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল মোহিনী বাহিরের ঘরের তক্তপোষের উপর বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন।

শৈল ডাকিল, বাবা।

মোহিনী কোন উত্তর দিলেন না।

শৈল পিতার এই নিরুত্তর ছবির সহিত অপরিচিত ছিল না। অসুখের পর হইতেই তাঁহার এই ভাবটা বাড়িয়া গিয়াছিল।

পিতার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শৈল বলিল, বাবা আপনার একখানা চিঠি আছে। ব্যাঙ্ক লিখেছে। আমি পড়িনি।

যে ব্যাঙ্ক হইতে মোহিনী দুর্দ্দিনে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন সেই ব্যাঙ্ক তাঁহার দুর্দ্দিনের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ভরসা রাখে নাই। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সভার একটা মন্তব্যের নকল পাঠাইয়া ম্যানেজার মোহিনীর বরাবর এক চিঠি পেশ করিয়াছেন এই লিখিয়া যে তিনি অর্থাৎ মোহিনী যদি সুদে আসলে আশু ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিয়া না দেন তবে ব্যাঙ্ক অনিচ্ছা থাকিলেও নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কালবিলম্ব না করিয়া সুদে আসলে ড্যামেজ সহকারে চার্জ্জ করিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই সময়ে সুশীলা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন সেই শীতের অপরাহ্নেও স্বামীর কপাল ঘামিয়া গিয়াছে।

পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও প্রথম দিকটায় স্বামীর মুখ হইতে কোন কথাই সুশীলা বাহির করিতে পারিলেন না। পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া বলিলেন, তাতে কি হয়েছে? এক চাকরী গিয়াছে, আর একটা হবে। আর ব্যাঙ্ক চিঠি দিয়েছে, সময় ত পাওয়া যাবে মোকদ্দমা করলেও। একটা ব্যবস্থা হবেই। ওঠ। হাত মুখ ধুয়ে জল খাও গে। আমাদের জন্যে ত তোমার ভয়! তা যদি আমাদের তোমার সঙ্গে গাছতলায় গিয়েও দাঁড়াতে হয় তাও আমরা দাঁড়াবো। ভয় পাবো না আমরা জান্‌বে কিছুতেই। ওঠ। ভেব না। জলখাবার তৈরি হয়েছে।

জল খাওয়া শেষ হইলে মোহিনী বলিলেন, সুশীলা, দেশে গিয়ে থাকলে হয় না? জগদীশ কি আমার সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দেবে না?

সুশীলা বুঝিলেন স্বামী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। বলিলেন, সে যা হয় পরে হবে। বিশ্রাম কর গিয়ে এখন।

(১৭)

ভবনাথ রাজসাহীর বাসায় কয়েকদিন আছে। একদিন সে সুরবালাকে বলিল, জ্বর এল বৌদি।

সুরবালা বলিল, জ্বর এল? শীত পাচ্ছে?

—হাঁ, শুইগে যাই।

—যান, শোনগে যান, একটু পরে আমি যাচ্ছি।

কিছুকাল পরে সুরবালা ভবনাথের ঘরে গিয়া দেখিল ভবনাথ এক অপরিষ্কার বিছানায় শুইয়া আছে, ঘরের জিনিষপত্রগুলি অগোছাল অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সুরবালা চমকিয়া উঠিবার মত ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, এই বিছানায় শুতে পারলেন ঠাকুরপো? বাইরে ত এত পরিষ্কার আপনি। এ ছি, ছি, কি নোংরা হয়েছে! বালিশের অর দিয়ে কি বিদঘুটে গন্ধ বেরুচ্ছে। উঠুন। ঐ চেয়ারে গিয়ে বসুন। বিছানাটা আমি এখনই পাল্টিয়ে দিচ্ছি।

ভবনাথ চেয়ারে বসিলে সুরবালা বাক্স হইতে ধোলাই চাদর বাহির করিয়া বিছানায় পাতিল। বালিশের অর পরিবর্ত্তন করিয়া বালিশের উপর একখানা সাদা তোয়ালে পাতিয়া দিল। টেবিলের উপরকার বিশৃঙ্খল জিনিষপত্রগুলি সাজাইয়া রাখিল। মাজার কাপড়ের আঁচল ঘুরাইয়া জড়াইয়া বাঁধিল ও পরে ঝাড়ু লইয়া নিজেই ঘর ঝাড় দিল।

বিছানার পাশে একখানা টুল বসাইয়া তাহার উপর এক গ্লাস জল রাখিয়া দিয়া বলিল, যান ঠাকুরপো, শোনগে যান এখন। কাল ওষুধ এনে দেব।

পরদিন রাত্রিতে জর বেশী হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি দেখা দিল ও শরীরের অস্থিরতা ভয়ানকভাবে বাড়িয়া উঠিল।

ডাক্তার সুরবালার মাকে বলিলেন, এখনই সুরেশ বাবুকে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম করে দিন। জর টাইফয়েডে এসে দাঁড়িয়েছে।

টেলিগ্রাম পাইবার পর যে দিন সুরেশ আসিয়া পৌছিল সেদিন ভবনাথের প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে।

নিশীথে ষ্টীমার হইতে নামিয়া বাড়ী পৌছিয়াই সে দেখিল ভবনাথ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় কি যেন বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে ও তাহার গলায় শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতেছে। ডাকিয়া বলিল, ভবনাথ, ভবনাথ।

সেই নিশীথ রাতের ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘরটা যেন কাঁপাইয়া জোরে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে ভবনাথ উত্তর করিল, এ্যাঁ।

সুরেশ ডাকিয়া বলিল, কোন ভয় নেই এখন তোমার ভাই, আমি এসে পড়েছি।

কোন উত্তর মিলিল না। কেবল দেওয়ালে ঝুলানো ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ ও রোগীর গলার ঘড় ঘড় শব্দ ভয়ানকভাবে সেই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যাইতে লাগিল।

সুরবালা সুরেশকে বলিল, কখন রওনা হয়েছিলে?

—সকাল নয়টায়। টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

—উঃ কি বিপদেই পড়েছিলেম! এখন তুমি এসেছ। আর ভয় পাচ্ছিনে।

—উঃ, আমারও যে কি ভাবে দিন কেটেছে তা বল্‌তে পারিনে। টাইফয়েড! সাংঘাতিক ব্যারাম! এসে দেখতে যে পাব সে ভরসা রাখিনি।

ভবনাথের অসুখের পর হইতেই সুরবালা নিজেই ভবনাথের শুশ্রূষায় লাগিয়া গিয়াছে।

সুরবালা রাত্রির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বরফের ব্যাগ রোগীর মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছে, কখনও কোন সময়ের জন্যও ক্লান্তি অনুভব করে নাই।

একদিন ভবনাথ প্রলাপের ঘোরে বলিয়া উঠিল, নাঃ, মরতে চাইনে। কিছুতেই চাইনে মরতে। সুরেশ দা!

সুরেশ কাছে আসিয়া ভবনাথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলে, ভবনাথ, ভবনাথ।

কোন সাড়া মিলিল না। ঘরটা আবার নিঝুম নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ঘড়ি পূর্ব্ববৎ অবিশ্রান্তভাবে টক্ টক্ করিয়া চলিতে লাগিল।

আবার সুরেশ ডাকিবার উপক্রম করিতেই সুরবালা স্বামীকে বলিল, ডেকো না। কথা বললে মাথায় ওর ভয়ানক লাগে। চুপ করে আছে থাক্‌।

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্ত লাভ করিয়া ঘূর্ণমাণ আঁখির দৃষ্টি সুরবালার দিকে নিক্ষেপ করিয়া মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে জড়িত স্বরে ভবনাথ বলিল, বাঁচলেম না, বৌদি, বাঁচলেম না। বাঁচান আপনি আমাকে।

কথা শেষ হইবার পর ভবনাথ যখন পুনরায় চুপ করিয়া গেল তখন দেখা গেল যে তাহার দুই চোখের দুই প্রান্ত দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বাহির হইয়া তাহার দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে।

সুরবালা চাকর ভগলুকে বলিল, ব্যাগে বরফ ঠিক ভাবে পুরা হচ্ছেনা ভগলু। প্রলাপ তো কমছে না ঠাকুরপোর।

এই সময়ে ভবনাথ জড়িত স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, স্বপন দেখলেম, বৌদি, আর জন্মের মা আমায় নিতে এসেছিলেন বৌদি। বললেন, আয় ভবনাথ, কোলে আয়। আমি তাড়িয়ে দিলেম। বললেম, যাও, যাও। বৌদিই আমার সব। তুমি কে? যাও।

সুরবালা ছোট সুরে বলিল, ভগলু।

—কি মায়ি?

—আমি বরফ পুরি।

সুরবালা ভগলুর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া বরফ খুব ছোট ছোট টুকরায় ভাঙিয়া রবারের ব্যাগে পুরিল। পরে উঠিয়া ভবনাথের শিয়রে বসিয়া ব্যাগটা ভবনাথের মাথায় পূর্ব্বের চেয়ে জোরে চাপিয়া ধরিল। তাহাতেই ভবনাথ শান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সুরেশ বলিল, কয়েক রাত জেগেছি। বড় ঘুম পাচ্ছে সুরবালা। এক ঘণ্টার বেশী ঘুমোব না।

এই বলিয়া জড়ভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া টলিতে টলিতে সে অন্তঘরে চলিয়া গেল।

দশ দিনের দিন সন্ধ্যায় সহরের সিভিল সার্জ্জন আসিয়া একটা ইন্‌জেকশন দিয়া গেলেন।

শেষ রাত্রিতে ভবনাথ শান্তভাবে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিল, বৌদি! সুরবালা বুঝিল, ইন্‌জেকশনে ফল করিয়াছে, ভবনাথের গলায় আঠা-ধরা কাশি জমিয়াছে। সে নখে স্তাকড়া জড়াইয়া কাশি বাহির করিয়া আনিল ও সেই অপরিষ্কার স্তাকড়া মেঝের ফেনাইল-পরিপূর্ণ গামলায় ফেলিয়া দিল। পরে সে হাত ধুইয়া ফেলিল।

সুরেশ চেয়ারে বসিয়া ছিল। বলিল, কাশি উঠছে?

—হাঁ উঠছে। আর ভয় নেই।

চৌদ্দ দিন পরে ভবনাথ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বৌদি?

—বলুন।

সুরবালা আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিল ভবনাথ বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। হঠাৎ ভবনাথ কাত ফিরিয়া শিয়রে-বসা সুরবালার পদধুলি লইয়া নিজের মাথায় দিল।

সুরবালা বলিল, করেন কি? আপনার যে নড়তেও মানা। শীগ্‌গির ভাল হ'য়ে শোন বলছি।

কিছুক্ষণ পরে ভবনাথ বলিল, বৌদি, আপনি যে আমার আর জন্মে দিদি ছিলেন বৌদি।

সুরবালা ধমকের সুরে বলিল, কথা বলতে দেবনা আমি আপনাকে। ঘুমোন আপনি।

মোহিনীর রাজসাহীর বাসায় প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, সুশীলা মা, মা সুশীলা ?

সুশীলা ঘরের ভিতরে ছিলেন, শৈলও ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিলেন। শৈলও আসিল।

ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া সুশীলা বলিলেন, জেঠামশাই, অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

প্রণাম করিয়া উঠিতেই সুশীলার পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, মা সুশীলা, ভাল আছিস তো মা ?

শৈল ভট্টাচার্য্যকে চিনিত না।

সুশীলা বলিলেন, দাদামশাইকে প্রণাম কর শৈল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে নিজের ডান হাত দিয়া শৈলর এক হাত ধরিয়া একদৃষ্টে শৈলর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এত বড় হয়েছিস্ তুই! সুশীলা মা, আর ভাবনা নেই তোমার। বর তো সাম্‌নেই উপস্থিত। এখন সম্প্রদান করলেই তো হয়। তা এত রূপসী মেয়ের বুড়ো বর পছন্দ হবে তো তোদের ?

সুশীলা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, এমন বর ভাগ্যে হলে তো হ'তই।

শৈলর দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, কিলো, এ বর বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ? এখন চাই কিনা নাটক-নভেল পড়া, সিঁথি-কাটা বাবুয়ানা ধরণের এক জন। নয় কি ?

ফিক্ করিয়া হাসিয়া শৈল লজ্জায় মুখ অবনত করিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, নাঃ, বিয়ে করা হবে না তোকে। যে রূপসী তুই! শেষে শাপ দিবি। এ বরের বৌ হওয়া সোজা নয় জান্‌বি। দাঁত একটাও নেই। বুঝেছিস্ তো! পান ছেঁচে দিতে পারবি তো? তা পারবি। যে মায়ের মেয়ে তুই! ও সুশীলা, এবার আর রেখে যাচ্ছিনে তোমার মেয়েকে। মোহিনী আসুক। কন্যা পাত্রস্থ করতেই হবে এবার।

দুঃখের মধ্যেও সুশীলা হৃষ্ট হইয়া উঠিল। বলিল, বসুন জেঠামশাই।

কথা চলিতেছিল এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই। চন্দ্রকান্ত কুশাসনে উপবেশন করিলে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, জেটামশায়, শঙ্কর কি বড় হয়েছে? অনেক দিন তাকে দেখিনি?

—দেখবি কি করে মা? আমাদের কথা ভুলেই তো গিয়েছিস্, তোরা সব। শঙ্কর বড় হয়েছে। এইবার আঠারোয় পড়েছে। এবার এটেস্ পাশ করে এল, এ পড়ছে।

—এন্‌টেস্ না মেট্রিকুলেশন?

—ওই হল। সাবেক ধরণের মানুষ আমরা। সাবেক ধরণের কথা কই।

—বামুন পণ্ডিতের ছেলে! সংস্কৃত পড়ালেন না?

—সব জায়গায় আজকাল ইংরেজী মা। পেট ত পূরে না সংস্কৃত পড়ে। টাকা চাই ত!

—না, ঠিক করেছে।

—ঠিক বই কি। খেতে দিতে হবে তো বৌকে। তা আবার আজ কালকার বৌ!

—কি যে বলেন জেঠামশায়!

—জেঠামশায় যা বলে ঠিকই বলে। তোদের কাল এককাল গিয়েছে সুশীলা। যাক্ অনেক বাজে কথা বলে ফেললেম। কি বলতে চাইছিলেন যেন?

চন্দ্রকান্ত ভাবিতে লাগিলেন। সুশীলা তাকাইয়া রহিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হ্যাঁ, বলছি কি তোমাদের এখন গ্রামে গিয়ে থাকাই ভাল। মোহিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। বললো সব। চাকরীর চেষ্টা করে পায়নি। তা পুরুষ মানুষ, অত দুর্ব্বল হ'লে চলবে কেন? একেবারে নিঃসম্বল তো তোমরা নও! বাপ ঠাকুরদার কিছু আছে তো! পেন্সন আছে। পাড়াগাঁয়ে জিনিষপত্রও সস্তা বেশ ভালভাবে চলে যাবে তোমাদের সেখানে।

—সম্পত্তির অংশ কি ছেড়ে দেবেন ঠাকুরপো?

চন্দ্রকান্ত জোরে বলিয়া উঠিলেন, ছেড়ে দেবেনা! আর এই বিপদে! আশ্চর্য্য! ভোগ করবে না মোহিনী বাঁপের সম্পত্তি! বল কি সুশীলা! ছেড়ে দেবে না!

—ছেড়ে না দিলে মামলা মোকদ্দমা করতে হবে তো তবে?

—ছেড়ে ছায় কিনা দেখাই যাক্! আদালত আছে ত! বাড়ীতে জায়গা না দেয় তোমার বাড়ীর পাশেই আমার জায়গা আছে। ওখানে কয়েকখানা চালা উঠিয়ে দিলেই চলবে। কিসের দুঃখ তোমাদের? সহরে পড়ে আছ। কেউ চেনেনা। মোহিনীর পিতামহ হরিচরণ চৌধুরীকে চিনতো না এমন লোক তো ওদেশে ছিল না। কত দান ছিল তাঁর! সম্পত্তি তো প্রায়ই হারালেন অতিরিক্ত দানে। আর তোমার শাশুড়ী! কি মেয়ে! পাকা সোণার মত টক্‌টকে গায়ের রঙ! অহঙ্কার বলতে কিছু ছিল না শরীরে তাঁর! যাক্ সে সম্পত্তিও নেই, সে সব লোকও নেই। তে হি নো দিবসা গতাঃ।

ভট্টাচার্য্যের বয়স পঁচাত্তর, বেঁটে গোছের চেহারা, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্য এখনও অটুট, তবে দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছে। তিনি পৌরহিত্য করেন। বাড়ী মোহিনীর গ্রাম হরিপুরে। মোহিনীরা তাঁহার যজমান।

বড় পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার দেশ বিদেশে খ্যাতি আছে। দেশ বিদেশে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি সব জায়গায় যাইতে পারেন না। অনেক সময় টাকা মণি অর্ডার হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসে।

যৌবনে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সঞ্চিত অর্থে ও বর্ত্তমান উপার্জ্জনে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল।

তাঁহার পরিবারের মধ্যে এখন বর্ত্তমান ছিলেন তিনি ও পৌত্র শঙ্কর। রান্না ও অন্যান্ত গৃহকার্য্য করিবার জন্ত তিনি এক বিধবা রাঁধুনী বামনীকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র দুইজন ও পুত্রবধু তাঁহার শ্বশুড় বাড়ী হইতে নৌকাপথে বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন। পথে ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া সকলেই মারা যায়। পৌত্র শঙ্কর ঠাকুরদাদার কাছেই ছিল। সেইজন্ত সে বাঁচিয়া যায়।

যখন এই ভয়ানক সংবাদ বাড়ী আসিয়া পৌছে তখন ভট্টাচার্য্য পূজায় বসিয়াছিলেন।

সংবাদ পাইয়া তিনি কয়েকবার মাত্র জোরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তারা, তারা, তারা। পরে তিনি গীতার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন :—

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে।

সম্প্রতি তিনি এক বিবাহে রাজসাহীতে আসিয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি একবার মোহিনী ও সুশীলা মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন।

(১৯)

রংপুরের একতলা ছাত্রাবাসের ছাতের উপর সুহৃৎসম্মিলনী নামে ছাত্রদের এক বৈঠক বসিত প্রতি রবিবারে। সেই সম্মিলনীতে নিয়মিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পাঠ করা হইত। মাঝে মাঝে খোল ও হারমোনিয়ামের সঙ্গে কীর্ত্তন গান গাওয়া হইত।

শঙ্কর সেই সম্মিলনীর উৎসাহী সভ্য। সুবিমলের ঘরে সে থাকে।

সুবিমল এপর্য্যন্তও সম্মিলনীতে যোগ দেয় নাই শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও।

কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্করের পোষাক পরিচ্ছদে জৌলুষ ছিল। সম্মিলনীতে যোগ দেওয়ার পর হইতেই সে মাছ মাংস ত্যাগ করিল। পশমী চাদরের পরিবর্ত্তে মোটা সূতার চাদরের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল। দুপুর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে সেই সময়ে সুবিমল হঠাৎ একদিন জাগ্রত হইয়া আবিষ্কার করিল যে শঙ্কর সটান হইয়া জোড়াসনে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা ছবি সামনে রাখিয়া নিষ্পলকদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ঢাকার ছাত্র অমল বোস আসিয়া রংপুর কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়াছে। সে ভাল গায়। সে আজ সম্মিলনীর বৈঠকে উপস্থিত থাকিবে ও গান করিবে।

আজ শঙ্করের বিশেষ অনুরোধে সুবিমল সম্মিলনীর বৈঠকে যোগ দিতে বাধ্য হইল।

সন্ধ্যার পর বৈঠকে যখন সুবিমল গিয়া উপস্থিত হইল তখন কীর্ত্তন চলিতেছিল। অমল প্রথমে কীর্ত্তনের পদ গাহিয়া যাইতেছিল, অপর সকলে তাহারই পরে তাহারই অনুকরণে গাহিতেছিল।

সুবিমল গিয়া উপস্থিত হইবামাত্রই গান থামিল।

শঙ্কর বলিল, অমল দা, সুবিমল এসেছে।

অমল বলিল, সুবিমল বোস।

তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। গানের বিরতিতে ছাতটা একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছিল, আর সেই শান্তি ভঙ্গ করিয়া এক টানা মৃদুগর্জ্জনে গ্যাসের আলো ক্রমাগতভাবে জ্বলিয়া চলিতেছিল, আর মাছিগুলি বাতির কাচে ধাক্কা খাইয়া মরিয়া মরিয়া পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুবিমল ছাড়া অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া অমল বলিল, এখন একটু নীচে যা তোরা, আমার সুবিমলের সঙ্গে কথা আছে।

সকলে চলিয়া গেলে অমল ও সুবিমল সেই ছাতে অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। পরে অমল বলিল, শঙ্করের কাছে থেকে অনেক কথাই শুনেছি তোর সম্বন্ধে। সম্মিলনী ভাল লাগে না তোর?

অমলের কথার ভিতর এমন একটা গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান ছিল যাহাতে সুবিমল মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত বিনীতভাবে সে বলিল, কেন আমি কি বলেছি শঙ্করের কাছে?

—সম্মিলনী তোর ভাল লাগে না।

সুবিমল মাথা অবনত করিয়া নীরব রহিল।

—তোর সব কথা আমি শুনেছি। কথামৃতটা তুই বুঝতে পারিস্‌নে ?

—কি বলবো ?

—আচ্ছা স্বামিজী সম্বন্ধে মত কি তোর ?

—খুব ভাল। খুব বড় তিনি।

এই কথার পর কথায় মধ্যে স্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। পরে সুবিমল বলিল, যাই তবে আমি।

অমল বলিল, আমিও যাচ্ছি। একটু বসি আয়। বড় নিরিবিলি জায়গা। বেশ লাগ্‌ছে আমার।

আবার কথায় নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। পরিশেষে অমল বলিল, সুবিমল আমার কিন্তু একটা দোষ আছে।

—কি বলুন।

—সেটা হ'ল যে ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয় প্রথমেই আমি তার বুকটা খুলে দেখি। আমার বিশ্বেস তুই কথাটা রাখবি অমল দার। অমল দা বল্‌ছি, কেননা দুদিন বাদেই তুই আমাকে অমল দা বলে ডাকৃতে আরম্ভ করে দিবি।

সুবিমল বলিল, দুদিন বাদে কেন, আজই অমল দা বল্‌ছি।

—বেশ শুনে সুখী হলেম। আমি সোজা লোককে পছন্দ করি যার চরিত্র পরিষ্কারভাবে স্বচ্ছ। খোল দেখি জামাটা

সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইল ও পরক্ষণেই জামা খুলিয়া ফেলিল। অমল সুবিমলের বিশাল বক্ষ দেখিয়া প্রীত হইল।

নিজেও সে পাকা ফুটবল খেলওয়াড়, শারীরিক শক্তিতে কলেজের মধ্যে অদ্বিতীয়। ছয় ফুট লম্বা সে, তবুও তাহাকে দেখিয়া খর্ব্ব বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ অমল এক দৃঢ় সংকল্প স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও পরক্ষণেই বাঘের মত স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়া সুবিমলের উপর পড়িল ও ডান হাতের তালু দ্বারা সুবিমলের বুকে ভয়ানক জোরে ধাক্কা দিল।

সুবিমল এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ধাক্কাটা অতর্কিত ও ভয়ানক জোরের হইলেও সে টলিল না।

অমল বলিল, বাঃ, বাহবা ছেলেরে! তোকে দিয়ে দেশের অনেক কাজ হবে রে!

পরে উভয়ে আবার ছাতে বসিল। অমল বলিল, এক দিন সন্ধ্যেয় একলা চাই কিন্তু আমি তোকে।

—কোথায়?

—কলেজের মাঠে।

—কেন!

—সে কথা পরে বল্‌বো। আস্‌বি তো?

—আস্‌বো।

নীচে নামিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া সুবিমল শঙ্করকে বলিল, একটা লোক দেখলেম বটে আজ। জীবনে ওঁর কথা কখনও ভুলতে পারবো না।

(২০)

ভবনাথের শরীর সারিয়াছে। সে রোজ গঙ্গার ধারে ভ্রমণ করে। সুরেশ অনেক দিন আগেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সুরবালা সাতটায় ভবনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ভবনাথের এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।

সুরবালা ডাকিয়া বলিল, ও ঠাকুরপো, করছেন কি? এখনও ঘুমিয়ে আছেন যে!

ভবনাথ চমকিয়া উঠিয়া জাগ্রত হইল ও পরক্ষণেই শরীরের আগাগোড়া নিদ্রালস এক মোচর দিয়া বলিল, কি বৌদি?

—এখনও ঘুমিয়ে আছেন যে! বেড়াতে যান নি?

—না, যাওয়া তো হ'ল না আজ। উঠতে দেরী হ'য়ে গেল।

—যা হয়েছে, হয়েছে, উঠুন।

এই কথা বলিয়া সে মশারির ঘের মশারির ছাতে উঠাইয়া গুটাইয়া রাখিল।

ভবনাথ রাত্রিতে দুধ রুটি খাইয়াছিল। বাটী, জলের গেলাস ও ভুক্তাবশিষ্ট রুটির টুকরাগুলি মেজেতে পড়িয়াছিল। জায়গাটী জলের ছিট দিয়া লেপিয়া সুরবালা বাটী ও গেলাস হাতে করিয়া ক্ষিপ্রভাবে চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতরে পৌঁছিয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিল, বাবুর হাতমুখ ধোওয়ার জল রেখে দিয়েছিস্ ভগলু?

ভগলু জানাইল যে সে পাতকুয়ার ধারে অনেক আগেই জল রাখিয়া দিয়াছে।

হাতমুখ ধোওয়ার জন্য যখন ভবনাথ পাত কুয়ার ধারের পাকা বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল তখন সুরবালা কুয়ার পাটাতনের উপর বসিয়া মায়ের পূজার বাসন মাজিতেছিল। সেই সময়ে তাহার চেক কাপড়ে ঢাকা কাঁচা শরীরের উপর দিয়া কচি সূর্য্যের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বারান্দায় একখানা চেয়ার পাতা ছিল। ভবনাথের হাতমুখ ধোওয়া শেষ হইলে সুরবালা ভবনাথকে বলিল, বসুন না ঠাকুর পো চেয়ারে। কাজ তো নেই আপনার এখন। গল্প করা যাক্ একটু। কাজও করি, গল্পও করি।

ভবনাথ গিয়া চেয়ারে বসিল।

কোন পক্ষেই কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরিশেষে সুরবালা বলিল, অসুখ থেকে উঠেছেন ঠাকুর পো, বলুন তো, ঠিক বল্‌বেন কিন্তু, আপনার কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—কি খেতে ইচ্ছে হয়! আচ্ছা ভাবি।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, ইলিশ মাছ খেতে খুব ইচ্ছে হয় বৌদি।

—এ আর বেশী কি। আর?

—আর কিছু না।

—বলেন কি! সত্যি আপনি লজ্জা করে বল্‌ছেন না?

—লজ্জা নয়, সত্যি।

—আচ্ছা ঠাকুর পো? বলুন তো? ঠিক বল্‌বেন কিন্তু, লুকোবেন না কিছু। আপনি বোধ হয় এখানে সুখে নেই। আপনি কথা বলেন, হাসেন, সবই করেন, তবুও আমার যেন মনে হয় আপনি কি যেন মনের মধ্যে ভয়ানক ভাবে ভাবেন। আমার মাঝে মাঝে তো রীতিমত ভয় হয়। পাগল টাগল হয়ে যাবেন নাকি শেষে। বলুন তো ঠিক করে কি ভাবেন?

কলিকাতা হইতে সাংঘাতিক জুয়াচুরির কাজ করিয়া আসিয়াই ভবনাথ অসুখে পড়ে। সে এখন সহজভাবে কোন কথাই গ্রহণ করিতে পারে না।

সুরবালার কথায় এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যে ইঙ্গিতের ভবনাথের উপর আঘাতের ধারণা সুরবালার না থাকিলেও ভবনাথ কিন্তু সেই ইঙ্গিতে দমিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার গলা শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে নিজকে সংযত করিয়া ফেলিল। কোন বিপর্য্যয়ের ভাব তাহার মুখে চোখে প্রকাশ পাইল না। বলিল, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভাবি বই কি।

—কি ভাবেন ?

—ভাবি জীবনে কি করলেম ?

—না, আরও কিছু ভাবেন ভয়ানক ভাবে ?

—না, ভাবি জীবনে কিছুই করতে পারলেম না।

—বাঃ, খুব মানুষ তো আপনি! 'করেছেন তো আপনি অনেকই। জীবনে এই বয়সে আর কে কত বেশী করে থাকে বলুন তো ?

—ভাবি তো তা কিন্তু তবুও মনে হয় জীবনে কিছুই করতে পারলেম না।

—ও কিছু নয়। বড় অসুখ হয়েছিল। মাথাটা এখনও ঠিক হয় নি। সেইজন্য ওসব ভাব আসে। কাজে থাকবেন সর্ব্বদা কিন্তু। বই পড়বেন। বইখানা পড়েছেন যা দিয়েছি ?

—বই দিয়েছেন তো স্বর্ণলতা! ও আবার কি বই!

সুরবালা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, কেন ভাল নয় ?

—কি ভাল ?

—কেন, সরলার অবস্থা দেখে কি আপনার চোখে জল আসে না ?

—কি করে বলি তা! আমার মনটা বোধ হয় খুব কঠিন।

অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না, পরে সুরবালা বলিল, আচ্ছা বলুন তো প্রমদা কেমন? প্রমদার মত বৌ একটা হলে কিন্তু খুব ভাল হয় আপনার। রীতিমত জব্দ হয়ে যান্।

—আমি বিয়েই করবো না।

—ও কথা অনেকেই বলে থাকে।

—বিয়ে করে কি হবে? প্রমদার মত মেয়েই সব। সরলার মত মেয়ে কয়জন?

—ভুল বুঝেছেন ঠাকুর পো আপনি। সরলাই বেশী।

—কি করে?

—মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই খারাপ।

—কি করে?

—পুরুষেরা মেয়েদের যত্ন করে না। তাই মেয়েরা খারাপ হয়ে যায়।

সুরবালা কোন উত্তর পাইল না। ভবনাথ কি যেন ভাবিতেছিল।

সুরবালা বলিয়া উঠিল, ও ঠাকুর পো, কি ভাবছেন আপনি আবার? এবার যেন কেমন কেমন হয়েছেন আপনি।

ভবনাথ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, না, না, বৌদি কিছুতেই নয়। কি যেন বল্‌ছিলেন?

—ওই তো ভাবছিলেন। বলছিলেম পুরুষ যদি মেয়েদের যত্ন না করে তবে মেয়েরা আনন্দ হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যায়।

—তা আমি স্বীকার করিনে!

—করবেন না কেন? স্বামী যদি ভাল হয় তবে স্ত্রী কখনও খারাপ হতে পারে না জানবেন।

ভবনাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। বলিল, কেন শশীভূষণ কি খারাপ ছিল?

—ছিলেনই তো। ভয়ানক দুর্ব্বল ছিলেন তিনি। তাঁর উচিত হয়নি প্রমদাকে অত প্রশ্রয় দেওয়া। তিনি ভাল কিছুতেই ছিলেন না। সেইজন্য প্রমদা খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন।

—ভাল করে ওঠাতে পারেনা কেউ, কেউ যদি আদতেই খারাপ থাকে বৌদি, বিশেষ করে যেখানে খাওয়া পরার কথা থাকে।

—ছাই খাওয়া পরা স্বামীর ভালবাসার কাছে।

—সে আমি বিশ্বেস করিনে।

—কেন?

—মেয়েরা খাওয়া পরাই চায়। মনে করুন এই গহনাটা। স্বামীর ভালবাসা না পেয়েও যদি গহনা পায় তবে অনেক মেয়ে সুখে থাকে।

—আহাঃ! বড় কথাটি বল্লেন!

—ঠিকই বলছি। আপনার গহনা না থাকলে বুঝা যেত আপনি সুরেশদাকে কত ভালবাসেন।

আহাঃ! ভারি বুঝতেন! আমি গহনাকে বেশী বড় বলে মনে করিনে জানবেন।

—বুঝাই যেত না থাকলে!

—দেখুন, আপনি মেয়েদের যত খারাপ মনে করেন আদতে তত খারাপ তাঁরা নন্।

উত্তরের আশায় সুরবালা চাইয়া দেখিল এবার ভবনাথ ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।

সুরবালার মা এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, ভারি যে গল্প করছিস্ তোরা। বেলা যে হয়ে গেল এদিকে!

সুরবালা ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুব কি বেলা বেশী হয়েছে ঠাকুর পো? ও ঠাকুর পো, ভাবছেন কি ছাই মাথা মুণ্ডু? উঠে গিয়ে দেখুন তো ঘড়িতে কয়টা বাজে।

ভবনাথের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া সে বলিল, সাড়ে আটটা বেজেছে বৌদি।

সুরবালা বলিল, ওমা! এত বেলা হয়েছে। আমি আপনার রান্নার যোগাড় করবো কখন। যাক্ ঠাকুর পো, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন তো! আপনার সঙ্গে গল্প করলে কোন কাজই হবে না।

(২১)

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় কলেজের নির্জ্জন মাঠের ঘাসের উপর বসিয়া অমল সুবিমলকে বলিল, বিমল, আমি তোকে সুবিমল বল্‌বো না; বিমল বলবো। বুঝেছিস্?

—বলবেন।

—ভ্যাখ তোর ব্যবহারটা আমার খুব মিষ্টি লেগেছে। তাই ভাবি সমস্ত বাঙ্গালী জাতটা যদি তোর মত ছেলে দিয়ে তৈরি হত তবে কত সুন্দর হ'ত বলত দেখি? জান্‌বি আগে চাই মানুষ, তার পর আস্‌বে অধিকার। অধিকার কেউ যেচে দেয় না বিমল। ও জিনিষটাকে জোর করে নিতে হয়। জান্‌বি সিংহ কখনও শেয়াল হয়ে থাকতে পারে না।

সুবিমল কোন উত্তর করিল না।

অমল বলিল, আচ্ছা তুই যুগান্তর পড়িস্?

—পড়ি।

—রোজ !

—রোজ !

—দেশের কথা পড়েছিস সখারাম গনেশ দেউস্করের ?

—পড়েছি

—বর্ত্তমান রণনীতি ?

—পড়েছি।

—ভারতে বিবেকানন্দ !

—পড়েছি।

—স্বাধীনতার ইতিহাস !

—পড়েছি

—আনন্দমঠ ?

—ওতো সকলেই পড়ে।

—শাল বনের ভেতরে সন্ন্যাসী সন্তান গাচ্ছে 'হরে মুরারে'। কেমন গান !

—খুব ভাল।

—বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছিস্ !

—একদিন শুনেছিলেম।

সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা বুঝতে পারিস্ ?

—কিছু কিছু।

—বেশ তবেই তুই আমার কথা সব বুঝতে পারবি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমল বলিল, আচ্ছা তোর দেশের অবস্থা দেখে কি মনে হয় ?

সুবিমল কোন উত্তর দিল না।

অমল বলিল, কি লাজুক তুই একটা ! কথা বলিস্‌নে কেন ?

সুবিমল অপ্রতিভ হইল। মৃদু হাসিতে মুখ দীপ্ত করিয়া বলিল, লাজুক নই অমল দা! তবে কিনা যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তর দেওয়া ত সোজা নয়! একটু ভাবতে হবে তো!

—তা ঠিক নয়। লাজুক তুই। যাক্, দেশের অবস্থা কি তোর ভাল বোধ হয়?

—ভাল মোটেই নয়। লোকে খেতে পারে না।

—বেশ! সন্তুষ্ট হলেম। ভেবে দেখেছিস্ কি এই অবস্থা থেকে দেশ কি করে বাঁচতে পারে?

—কি করে বলি তা?

—বেশ! আচ্ছা দেশে যদি মানুষ গড়ে ওঠানো যায় তবে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে, এটা স্বীকার করিস্?

—খুব করি।

—কিন্তু তৈরি হচ্ছে কি সেই রকম মানুষ?

—দেখি নে তো।

—হচ্ছেনা নিশ্চয়ই। আচ্ছা তুই কলেজে পড়ছিস্। কলেজ থেকে বেরিয়ে কি করবি তুই?

—তা তো জানিনে।

—করবি চাকরী।

—চাকরী ছাড়া আর কি করবার আছে এদেশে।

—আচ্ছা ভেবে দ্যাখ দেখি গোলামী দ্বারা কেউ কোনও দিন মানুষ হতে পেরেছে কি? চাকর সব জায়গায়ই চাকর। মানুষ তো আমরা, শেয়াল কুকুর তো নই। কেন আমরা সবাইয়ের সামনে বুক উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো না? কেন মানুষ হতে পারবো না আমরা?

—কি করে যে মানুষ হওয়া যায় তাই তো জানিনে।

—কেন, কাজের ভেতর দিয়ে?

—কি কাজ?

—কি কাজ? যে দেশে এত হাহাকার সে দেশে আবার কাজের অভাব!

সুবিমল কোন উত্তর করিল না।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিবার পর অমল বলিল, তোকে কলেজের পড়া ছেড়ে দিতে হবে।

—কেন?

ওতে শুধু গোলাম তৈরি হয়, মানুষ তৈরি হয় না। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে তোকে দেশের কাজে ব্রতী হতে হবে।

—বাবা, মা কি তাতে রাজি হবেন?

—বুঝিয়ে বল্‌বি।

—তাঁরা বুঝবেন কেন?

—কি করা যাবে তবে বল্‌তো? কোন বাপেরই ছেলেকে এমন অবস্থার ভেতর ফেলে দেওয়া উচিত নয় যাতে ছেলের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়।

—তা তো বুঝি। কিন্তু বাপ মা যে কিছুতেই বুঝবেন না। আপনারও তো সেই অসুবিধে।

কথাটা অবশ্য আমি নিজকে বাদ দিয়ে বল্‌ছিনে।

—এ অবস্থায় কি করা যাবে বলুন।

—বুঝলেম সবই। কিন্তু পিতা মাতা যা কিছু করতে বল্‌বেন তাই কি যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে করতে হবে?

—কিন্তু পিতা মাতার কথা তো মোটেই অগ্রাহ্য করা চলে না।

—কেন? কেউ কি কোনও দিন করেনি?

—কে করেছে ?

—কেন ? বুদ্ধদেব, চৈতন্ত দেব !

—মহাপুরুষ তাঁরা। তাঁদের কথা ছেড়ে দিন।

—তাঁরা কি ভেবেছিলেন তাঁরা মহাপুরুষ ?

—এ কথার উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না। একটু ভাবতে দিন।

—তা ভেবে ত্তাথ। কিন্তু তোকে আজ একটা খুব বড় কথা বল্‌বার জন্ত ডেকেছি।

সুবিমল বিস্ময়ে অমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমল বলিল, কথাটা এই। আমরা বর্ত্তমানে চাই একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে।

—তার মানে ?

—মানে, আমরা চাই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস।

সুবিমল কতকটা বিমূঢ় অবস্থায় শূন্ত দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন পূর্ণিমার চাঁদ গাছের মাথার উপর উঠিয়া আসিয়াছিল। জনশূন্ত প্রকাণ্ড মাঠটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

অমল বলিল, হাঁ করে রইলি যে বড় ?

—বুঝতে যে কিছুই পারছিনে।

—আচ্ছা তোকে বোঝাচ্ছি। ত্তাথ এ গভর্ণমেণ্ট আর কিছুই নয়, এ কতকগুলো কর্ম্মচারী দিয়ে তৈরি।

—সব গভর্ণমেণ্টই তো সেই ভাবে তৈরি।

—বেশ! শুনে সুখী হলেম। এখন গভর্ণমেণ্টকে আমরা অচল অবস্থায় এনে ফেলতে পারি এখনই যদি ঐ কর্ম্ম-চারীগুলোকে আমরা হত্যা করিতে পারি।

সুবিমল নীরব হইয়া রহিল।

অমল বলিল, এই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়াবার শক্তি আমাদের কিছুতেই নেই। তাই আমরা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছি জেলায় জেলায়। ঐ সমিতির লোকেরা দেশে ডাকাতি করে টাকার যোগাড় করবে, আর গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের খুন করবে।

—ডাকাতি দ্বারা কি দেশের লোকের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করা হবে না?

—অল্প স্বল্প অত্যাচার দেশের লোকের ওপর হবে বইকি। তা জোর জবরদস্তি ছাড়া টাকা দেবে কে? টাকার তো ভয়ানক দরকার।

—দেশের লোকে নিজেদের কল্যাণের কথা নিজেরা ভাবতে না পারে তবে কি করা যাবে।

—কথাটা তোর দেখ্‌ছি দাঁড়িয়ে গেল নিতান্ত স্বার্থপর একটা লোকের কথার মত। ছি, ছি, তোর মত ছেলের মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরুল ভেবে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আথ মানুষ হয়ে জন্মেছি আমরা। আমাদের দেশের দশের কল্যানের কথা ভাবতে হবে।

সুবিমল ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অমল উচ্চারিত প্রত্যেকটী কথায় জোর দিয়া বলিল, তোকে সেই সমিতিতে যোগ দিয়ে ওর একজন সক্ষম কর্ম্মী হতে হবে।

সুবিমল অমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমল বলিল, হাঁ করে রইলি যে?

—কি বল্‌বো?

—তোকে সমিতিতে আজই ভর্ত্তি করে নিচ্ছিনে। সে ভয় নেই তোর। তোকে তার আগে কিছুদিন পরোপকারের কাজে ব্রতী হ'তে হবে। তোকে সন্তান হতে হবে। সন্তানের পরিপূর্ণ সংযম তোকে আয়ত্ত করতে হবে।

—পরোপকারের কাজ আমি করতে পারবো, তবে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে।

—দেখিয়ে তো দিতে হবেই। যাক্ কথাগুলো বল্লেম কিন্তু তোকে বিশ্বেস করে। খবরদার! কেউ যেন এর বিন্দু বিসর্গও না জানে। বুঝলি?

—তা বেশ বুঝেছি।

—শুনে সুখী হলেম।

হোষ্টেলে ফিরিবার পথে সুবিমল ভাবিল, সে আজ কি শুনিল! গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন! তাহার সমস্ত কিন্তু চিন্তার আকাশ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘন মেঘে ভারাক্রান্ত হইয়া গেল। বাহিরের জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

(২২)

সময়ের এক সন্ধি সময়ে হঠাৎ ভবনাথ মনে জাগ্রত হইয়া তীব্রভাবে ভাবিল সুরবালার মত মেয়ে সে কোনও দিন কোথায় দেখে নাই। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে এমন এক ঘা লাগিল যাহাতে সে একদম দিশেহারা হয়ে গেল।

আজ দুপুরে ভবনাথ আহারে বসিয়াছে। সুরবালা পরিষ্কার একখানা কাপড় পরিয়া পাশে বসিয়া ভাতের উপরকার মাছি তাড়াইবার জন্ত বাতাস করিতেছে।

সুরবালা বলিল, আজ যে কিছুই খেলেন না ঠাকুর পো? রান্না কি ভাল হয় নি?

ভবনাথ বাক্‌চপল হইলেও আজ সুরবালার রূপের উপর নজর পড়ায় সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলিয়া যাইতে পারিতেছিল না। ইতি মধ্যেই সে সুরবালার অগোচরে সুরবালার দিকে ঘন ঘন ক্ষুব্ধ চোরা দৃষ্টি হানিয়া ঘন ঘন চোখ অবনত করিতেছিল।

সুরবালা বলিল, কি আবার ভাবছেন ঠাকুর পো ?

ভবনাথ কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, না ভাব্‌ছি কোথায় ?

—আপনি বল্‌লেই কি আমি শুনি! অসুখের পর থেকেই যেন আপনার কি হয়েছে। এত ভাবলে হয় পাগল হয়ে যাবেন, না হয় সাংঘাতিক একটা কিছু করে বস্‌বেন।

ভবনাথ হতচকিত হইয়া গেল। ভাবটা সে প্রবল ভাবে চাপিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম এক হাসি হাসিয়া বলিল, না এমন কিছু ভাবছিনে যে সেই রকম একটা কাজ করে বস্‌বো।

এই অবস্থায় ভবনাথের বিষম লাগিল।

সুরবালা বলিল, কেন তাড়াতাড়ি করছেন ঠাকুর পো ? ধীরে ধীরে খান্‌।

ভবনাথ প্রাণান্তিক ভাবে কিছুক্ষণ কাসিয়া লইল। পরে কাসির বেগ থামিলে সে বলিল, খাচ্ছি তো ধীরেই।

সুরবালা উদ্গত হাসি চাপিতে চাপিতে বিগলিত প্রগল্‌ভতায় বলিল, কোথায় খাচ্ছেন! কয়েকদিন থেকেই আপনার যেন কি হয়েছে। একবার চেঞ্জে যান্‌। না হয় এখনই একটা বিয়ে করে ফেলুন।

ইহার পর আহার চলিল নিদারুণ সংক্ষিপ্তভাবে, কথাবার্তাও আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল।

ভবনাথ অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িল।

সুরবালা বলিল, না, না, ঠাকুর পো, উঠবেন না, উঠবেন না। দুধটুকু অন্ততঃ খান।

ভবনাথ ক্ষণিকের জন্ম সুরবালার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার বিস্ফারিত ডাগর চক্ষু রসতীব্র মিনতি-মাখা ছন্দে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এই চোখের দৃষ্টি দেখিয়া ভবনাথ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

কোনও প্রকারে নিজকে সামলাইয়া লইয়া ভবনাথ চলিয়া গেল ও আঁচানো শেষ করিয়া দ্রুতগতিতে নিজের ঘরে গিয়া কৃত কর্ম্মের জন্ম বারম্বার নিজেকে ধিক্কার দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল ও আড়ষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানে না। যখন বিকালে জাগ্রত হইল তখন সে দেখিল তাহার মন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সে নিজের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল ও প্রচণ্ড উদ্যমে বেশী কিছু ঘটে নাই এই ভাবে নিজকে সম্বৃদ্ধ করিয়া সুরবালার দেওয়া একখানা উপন্তাস সামনে করিয়া বসিল।

উপন্তাসের মত উপন্তাস সামনে পড়িয়া রহিল। ভবনাথ দীর্ঘকালের চেষ্টায় একপৃষ্ঠাও পড়িয়া শেষ করিতে পারিল না। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে জটিলতার জাল রচিত হইয়া চলিল ও তাহার মন বিরুদ্ধপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও অন্ত দিকে প্রবলভাবে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। ভবনাথ উপন্তাস সামনে রাখিয়া বসিয়াই রহিল! এই সময়ে সুরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরে আলো দিল। ভগলু আজ বিদায় লইয়াছে বলিয়া কাজটা সুরবালাকেই করিতে হইল।

সুরবালা তরলায়িত কোমল সুরে বলিল, পড়ছেনই ঠাকুর পো? আজ বেড়াতে বেরুন নি?

—না বেরুই নি।

এই সময়ে অকস্মাৎ সেমিজের তলে সুরবালার পিঠের উপরে কি যেন ভয়ানক ভাবে দংশন করিল। উ-উ-উ শব্দ করিয়া অসীম যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিয়া সে পিছনের দিকে হেলিয়া পড়িল। সেই হেলিয়া পড়ার টানে সেমিজের বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়া সুরবালার পরিপুষ্ট প্রদীপ্ত বিশাল বুকটা ভবনাথের সামনে আলগা হইয়া গেল।

সুরবালার মা অন্য ঘরে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন ও সেমিজের তলে হাত দিয়া একটা বিছা বাহির করিয়া আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন।

সুরবালা ভয়ে ও যন্ত্রনায় কাঁপিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরবালা শান্ত হইলে মা ও মেয়ে চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু দংশনাহত অসহায় যুবতী নারীর উন্মুক্ত ছবিটা তাহার হৃদয়কে এমন জোরে আঘাত করিল যে সে একদম বানচাল হইয়া গেল।

রাত্রিতে আজ সে অসুখের ভান করিয়া খাইল না। উত্তেজিত মনের অবস্থায় তাহার ঘুমও আসিল না।

পরিশেষে সে উত্তেজনা দমন করিতে না পারিয়া উঠানে পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ভবনাথ আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল চাঁদ মাথার উপরে উঠিয়াছে। সাদা খণ্ড মেঘ আকাশ দিয়া দ্রুতগতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দেখিল সারা পৃথিবী জুড়িয়া কোন জায়গায় কোন সাড়া নাই, গাছ পালা আকাশ পৃথিবী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভবনাথ এই সময়ে চাহিয়া দেখিল সুরবালা যে একতলার ঘরে শোয় সেই ঘরের একটা জানালা খোলা রহিয়াছে।

প্রথমে সে ইতস্ততঃ করিল, পরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মরিয়া হইয়া উঠিল ও প্রবল সাহসে সেই জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সুরবালা জানালা পশ্চাতে করিয়া শুইয়া আছে, তাহার দীপ্ত পরিপুষ্ট মাখনের মত স্নিগ্ধ-মসৃন শরীরে জোৎস্নার আলো পড়িয়া শরীরটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

ভবনাথ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল সুরবালার সেই সুগঠিত দীপ্ত শরীরের সৌন্দর্য্য তাহার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের নিটোলতার সঙ্গে সাদা বিছানার উপর আশ্চর্য্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে নিদ্রার ঘোরে ভবনাথকে সামনে রাখিয়া সুরবালা কাত ফিরিয়া শুইল। ঘুমের ঘোরে কি যেন বিড় বিড় করিয়া বকিয়া সে হাত দিয়া মুখের উপরের চূর্ণকুন্তল সরাইয়া দিল।

এই সময়ে এক হাল্কা বাতাসে ঘরের পাশের শিশির ভেজা নারিকেল গাছের পাতার উপর দিয়া একটা হাল্কা শিহরণ জাগিয়া উঠিল। সমস্ত গাছের পাতার উপর দিয়া হাওয়াটা হাল্কাভাবে সোঁ-ও শব্দ করিয়া গড়াইয়া চলিয়া গেল। উঠানের শেফালি গাছ হইতেই এই সময়েই এক রাশি ফুল ঝড়িয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য চাঁদকে একখণ্ড পাতলা মেঘ ঢাকিয়া ফেলিল।

তখনও শরতের ঠাণ্ডা ভাল করিয়া পড়ে নাই। কেবল শিশির পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

মেঘ সরিয়া গেলে ও জ্যোৎস্না স্ফুট হইয়া উঠিলে সুরবালার অবয়ব আবার স্ফুট হইয়া উঠিল।

নিঃসঙ্কোচে, নির্লজ্জতার চরমে উঠিয়া উত্তেজিত, উদ্বেলিত উন্মত্ত মোহে সে পরাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিয়াই সে পাগল হইয়া গেল। জানালার এক পাশের লোহার গরাদ দৃঢ় মুষ্টিতে

ধরিয়া সে চাহিয়া রহিল। পিপাসায় তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল, আঠা-ধরা লালা আসিয়া জুটিয়া তাহার জিভটাকে আড়ষ্ট করিয়া দিল।

কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটিয়াছে সে তাহা জানে না। হঠাৎ একটা শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। বোধ হয় সেই সময়ে একটা পাখী কোন ভারি জিনিষ আকাশ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল।

ঘরে গিয়া ভবনাথ কিছুক্ষণ হতজ্ঞানের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। পরিশেষে সেই অসার অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া সে প্রকৃত অবস্থায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সুরবালার ছবিটা তাহার কল্পনার সামনে অসামান্য উজ্জ্বল চিত্রে বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সে কল্পনায় সুরবালাকে বুকে টানিয়া লইয়া জোরে চাপিয়া ধরিল, কল্পনায় তাহাকে চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

পরে যখন সে স্থির বুদ্ধি ফিরিয়া পাইল তখন সে সুরবালার সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল। সে বুঝিল যে সে বর্ত্তমানে এমন এক মর্ম্মান্তিক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে অবস্থায় সুরবালা ছাড়া তাহার জীবনের কল্পনা করা অসম্ভব। সুরবালা যে পরস্ত্রী তাহা সে একবারও ভাবিল না।

সে স্থির করিল সুরবালাকে সে সুরেশের স্নেহাশ্রয় হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া দূর দেশে চলিয়া যাইবে ও সেই দূর দেশে সুরবালার বক্ষসংলগ্ন হইয়া ভালবাসার কল্পনা সৌধ গড়িয়া তুলিবে। কশাঘাতে উন্মত্ত বলিষ্ট ঘোড়ার মত তাহার কামকল্পনা আকুল সমুদ্র ভেদ করিয়া ও দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সম্ভাবনার পরিষ্কার রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পথ করিয়া দিল। সুরবালা যদি রাজি না

হয়, দুর্জ্জয় অপমানে যদি সে প্রতিহিংসার জন্ত মরণ-পণ করিয়া বসে তবে সে কি করিবে? একথা ভাবিবার এক মুহূর্ত্ত সুযোগও

(২৩)

রংপুর কলেজের সুযোগ্য প্রতিভাবান অধ্যক্ষ কখনই চাহিতেন না যে তাঁহার কলেজের ছাত্রেরা দিনরাত বই লইয়া পড়িয়া থাকিয়া পুস্তককীটে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তাঁহার আদর্শ ছেলেরা বিনা ওজরে, প্রবল উৎসাহে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। তিনি ব্যবধান রক্ষা করিয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন, গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত সরসতায় ও সহৃদয়তায় ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতেন। ফলে ছেলেরা সকলেই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তিনি বিলাত-ফেরৎ হইলেও ইংরাজীতে তাঁহার উচ্চারণ সাহেবের মত হইলেও তিনি কোনও দিনও বাংলার সঙ্গে ইংরেজী মিশ্রিত করিয়া কথা বলিতেন না। তিনি মার্জিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত বলিতেন। যখন তিনি প্রত্যহ সকালে হোষ্টেলের মাঠ দিয়া ললিত গাম্ভীর্য্যে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন তখন সমস্ত ছাত্রের চক্ষু হোষ্টেলের সমস্ত জানালা দিয়া তাঁহার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তাঁহার প্রতি গভীর নির্ভরতা ও কৃতজ্ঞতার ভাবে তাঁহার উচ্চ মহানুভবতায় নিজেদের সমর্পণ করিত। সকলেই মনে করিত মহাপুরুষ একজন তিনি, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে যে পারে ধন্য সে।

কলেজের ছেলেদের সম্ভ্রমের দিকে তিনি জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতেন কলেজের মাঠে একবার পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের মারামারি হইয়াছিল সুবিমল একজন দুর্দ্দান্ত হাবিলদারকে ধরাশায়ী করিয়া প্রহার করিয়াছিল

অধ্যক্ষ কৌশলে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

একবার রংপুরে এক সার্কাস পার্টি আসিয়াছিল। পার্টির বাঘ-রক্ষক ছেলেদের একজনকে অপমান করিয়া দিয়াছিল। হোষ্টেলের ছেলেরা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত সার্কাস পার্টির তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহারা সম্মিলিতভাবে রাত্রিতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে বেমালুম জখম করিয়া দিয়াছিল। গুণ্ডামী হইলেও যুবশক্তির এই জাগরণে কলেজের অধ্যক্ষ মনে মনে সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন একটু আধটু রক্ত দেখিয়া ভয় পাওয়া কাপুরুষতা।

কলেজের ব্যায়ামের আখড়ায় ছেলেরা অনেক প্রকারের ব্যায়াম করিবার সুযোগ পাইত। লম্বা লাঠিতে ভর করিয়া লাফ দিয়া সুবিমল কুড়ি ফুট উঁচু প্রাচীর পার হইয়া যাইতে পারিত।

ফাল্গুণ চৈত্র মাসে প্রায়ই দেখা যাইত অন্ধকার আকাশ দিগ্বলয়ে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিত সহরের একটু দূরের গ্রামগুলিতে আগুণ লাগিয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া অধ্যক্ষ এক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি হোষ্টেলের প্রত্যেক ছেলেকে একটা করিয়া বড় টিন কিনিয়া দিয়াছেন। বন্দোবস্ত আছে যে যখনই দূরে আগুণ দেখা যাইবে তখনই অমল বিগল বাজাইবে ও অন্তান্ত ছাত্রেরা নিদ্রিত থাকিলেও উঠিয়া একত্র হইবে ও পরে একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে আগুনের জায়গায় ছুটিয়া যাইবে।

একদিন দুপুর রাত্রিতে হঠাৎ বিগল বাজিয়া উঠিল ও উহার শব্দে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

যখন যুবকেরা এইরূপ আগুণ নিভাইবার জন্ত যাত্রা করিত ও যখন তাহারা আগুনের স্থান হইতে ফিরিয়া আসিত তখন অমল তালে তালে

বিগল বাজাইত, আর যুবকেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া প্রবল উত্তেজনায় অগ্রসর হইত।

সেদিন আগুণ লাগিয়াছিল একটি খড়ের বাড়ীতে। গাছের ভিতর দিয়া আগুণের ঝলক উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইতেছিল।

কোলাহল ও তীব্র গন্ধ ধোঁয়ার মধ্যে শুনা গেল যে একটি মেয়ে ঘরের ভিতর আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বাহির হইতে পারে নাই।

যখন সুবিমল সেই ঘরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল তখন সে দেখিল ঘরের প্রায় অর্দ্ধেকটায় আগুণ ধরিয়াছে। হু হু করিয়া কালো ধূম ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে উঠিতেছে।

লাথি দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া যখন সুবিমল ঘরে প্রবেশ করিল তখন সে দেখিল মেয়েটি বিভ্রান্ত হইয়া নীচের মেঝের উপর পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছে। সুবিমলকে দেখিয়াই সে সুবিমলকে জড়াইয়া ধরিল ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইল।

হতজ্ঞান মেয়েটিকে লইয়া যখন সুবিমল ঘরের বাহির হইতেছিল তখন একখণ্ড জলন্ত কাঠের টুকরা তাহার পিঠের উপর পড়িয়াছিল।

আগুণ নিভাইবার পর সুবিমলেরা এক বিস্তীর্ণ চরের উপর দিয়া আসিতেছিল।

অমল বলিল, আজ বড়ই আনন্দের দিন আমাদের। আমরা যাচ্ছি একটি মাত্র বিগলের তালে পা ফেলে। কিন্তু হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন আমাদের যেতে হবে শত শত ড্রাম ও বিগলের বাজনার মধ্যে অজস্র শেলগুলিকে তুচ্ছ করে।

সুবিমলের পিঠ পুড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপও ছিল না। সে বিগলের তালে তালে প্রবল উত্তেজনায় জোরে জোরে পা ফেলিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন সেই বিগলের শব্দ এক

অশরীরী লোকের জোরের আহ্বান যাহা সেই রাত্রির বিশাল স্তব্ধতায় বুক চিরিয়া খান্ খান্ করিয়া দিতেছিল ও তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছিল, চল, চল, অজানা পথে, দূর দূরান্তরে সংসারের কোলাহলের বহু দূরে, মনুষ্যত্বের পরীক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন দুর্নিবারভাবে এক লক্ষ্যে এমনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে যে ছুটিয়া চলাতেই তাহার জীবনের সফলতা ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি। সে ভাবিতেছিল তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ মান, তুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। যে এক বড় লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ছুটিয়া চলিতে পারে দুনিবারভাবে অহরহঃ প্রবল উদ্দীপনায় তাহার জীবনই ধন্য।

হোষ্টেলে পৌঁছিয়া স্নান করিবার পর যখন সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। অসাধারণ ক্লান্তিতে সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর যখন সে বাহিরে আসিল তখন সে দেখিল যে সূর্য্যের কচি আলো গাছের পাতায়, হোষ্টেলের বাড়ীতে, পুকুরে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে ও সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া এক উজ্জ্বল অমৃতের প্রলেপ ছড়াইয়া দিয়াছে। হোষ্টেলের এক নির্জ্জন মাঠে একটা গরু চরিতেছিল ও সেই গরুর পিঠের উপর প্রভাতের সমস্ত স্নিগ্ধতায় গঠিত দেহ লইয়া একটা পাখী বসিয়াছিল। হোষ্টেলের বটগাছের কচি পাতাগুলি তড় তড় করিয়া নড়িতেছিল ও একটা ছোট পাখী এক ডাল হইতে অপর ডালে উড়িয়া যাইতেছিল।

সুবিমলের চোখের সামনে আজ সবই চিত্রিত ছবির মত বোধ হইতে লাগিল।

আজ এতক্ষণে প্রকৃতির স্বরূপ পরিষ্কার স্বচ্ছভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া সে দেশমাতার চেহারাটা ভাল ভাবে বুঝিতে পারিল। সে

রোমাঞ্চিত হইয়া জলে, স্থলে, আকাশে, শ্যাম শোভায় সজীবতায় জীবন্ত গাছপালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল কি সুন্দর এই দেশটা যাহার বৃক্ষলতা, পাখী, মানুষ এত সুন্দর। তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে সে এই দেশকে নিজের কাজের দ্বারা সে পৃথিবীর সাম্‌নে বরেণ্য ও মহনীয় করিয়া তুলিবে।

এতদিন সে গুপ্ত সমিতি কথাটা হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে নাই। আজ সে তাহার স্বরূপ হৃদয়ের নূতন প্রেরণা ও আনন্দ দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারিল।

(২৪)

চন্দ্রকান্তের পরামর্শ মত রাজসাহীর বাসা বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া মোহিনী যাহা পাইলেন তাহা দ্বারা ঋণশোধ করিয়াও হাতে বেশ ভাল টাকাই অবশিষ্ট রহিল।

সুশীলা বুদ্ধিমতী। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাসা বিক্রয় করিয়া গ্রামে চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে তিনি হৃষ্ট মনে সম্মতি দিয়াছিলেন।

মোহিনী গ্রামে পৌছিয়াই সম্পত্তির অংশ দাবী করিলেন, কিন্তু জগদীশ বড় ভাইয়ের দাবী বেমালুম অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে মোহিনীর সম্পত্তিতে বর্ত্তমানে কোন অধিকার নাই, সম্পত্তি অনেক দিন আগে লাট খাজনা না দেওয়ায় নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত কুলপুরোহিত। তিনি পৈতা দ্বারা জগদীশের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, জগদীশ ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি

দিস্‌নেরে জগদীশ। তিনি গ্রামের মাতব্বরদিগের দ্বারা জগদীশকে অনুরোধ করাইয়াছেন কিন্তু জগদীশ পাড়াগাঁয়ের অতি পরিপক্ক লোক, তিনি কাহারও কথায় বা অনুরোধে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন মনে করে নাই। শুধু তাহাই নহে, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত ভাই মোহিনীর আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহার বাড়ীর অতিরিক্ত অব্যবহৃত ঘরগুলির একখানিও ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই।

অগত্যা নিরুপায় হইয়া চন্দ্রকান্তের জমির উপরেই কয়েকখানা চালা মোহিনী উঠাইয়া লইয়াছেন।

হরিপুর মোটেই গণ্ডগ্রাম নয়। সেখানে ভাল মন্দ দুই প্রকার লোকের বসতি আছে। ডাক্তার জগৎ রায় বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিচক্ষণ বহুদর্শী প্রাচীন লোক। জমিদার রমেশ বাবু ঋণগ্রস্ত হইলেও আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিত ও যশস্বী।

জগদীশ সেখানে রক্ত-চোষা মহাজন হিসাবে কুখ্যাতভাবে নামজাদা।

গ্রামে আসিয়া পৌছিবার পর মোহিনী গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই সক্রিয় সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন নাই। গ্রামের ঘৃণিত দলাদলি কুচক্র প্রভৃতি জগদীশ ও তাহার সাগরেতদের ভিতরই আবদ্ধ ছিল। গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী থাকায় ঐসব লোকদের হাতেই গ্রামের সকল ভাল কাজের অগ্রবর্ত্তিতা নিবদ্ধ ছিল। নিজেকে গাঁয়ে মানে না আপনিই মোড়ল ভাবিলেও জগদীশ ও তাহার দল ঐদিকে ঘেঁষিতে পারে না।

পরিশেষে গ্রামের বিচক্ষণ লোকদের পরামর্শে মোহিনী রংপুরের দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মোহিনী গ্রামে আসিয়া ভালই আছেন মামলা মোকদ্দমার চিন্তা থাকা সত্ত্বেও। এখানে জিনিষপত্র সস্তা, জীবন অনাড়ম্বর। রাজসাহীতে

তাঁহার যে সব ব্যারাম ছিল তাহা এখানে আসিয়া সারিয়া গিয়াছে। চেহারাও অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছে। সুশীলা স্বামীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছেন।

সকালে মোহিনী নদীর ঘাটে মাছ কিনিতে যান। দুই আনার মাছে তাঁহার থলি ভরিয়া যায়।

কামার দোকানে কামারেরা মোহিনীকে সশ্রদ্ধভাবে দাদা ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া আদরে তাঁহাকে জল চৌকিতে বসায় ও তামাক সাজিয়া হুঁকা তাঁহার হাতে ধরিয়া দেয়। মোহিনী রুদ্রাক্ষ-গাঁথা সোনার তারের বালা কনুইয়ের নীচে ঝুলাইয়া বাঁকা হাতে হুঁকা গ্রহণ করেন। দুপুরে তিনি রমেশ বাবুর বৈঠকখানার করাসে বসিয়া পাশা খেলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে 'পানজুরি' 'কচ্ছ ছয় বারো' বলিয়া চীৎকার উঠিতে শোনা যায়।

গ্রামের ছায়া স্নিগ্ধ রাস্তায় চলিতে চলিতে মোহিনীর প্রাণ স্বস্তিতে ভরিয়া যায়। এখন যেখানে এক বড় বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে সেই জায়গায় মোহিনীর শৈশব অবস্থায় এক বিজন অরণ্য ছিল। মোহিনী সাপের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া বেতফলের অন্বেষণে সেই অরণ্যের ভিতর ঢুকিয়া যাইতেন। এখনও সেই শৈশবের কাহিনী তাঁহার বেশ মনে আছে। অপর ধারে নদীর উচ্চ পাড় এখনও বর্ত্তমান আছে, উহার গর্ত্তগুলিতে এখনও গাঙশালিখ দলে দলে ঢুকিতেছে। সবই ঠিক আছে। মোহিনীই কেবল দেহ মনে ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছেন। মোহিনীর বুক হইতে দীর্ঘশ্বাস ঠেলিয়া ওঠে।

বাড়ীতে মোহিনী মাছ লইয়া আসিলে পত্নী কন্যা প্রবল উৎসাহে দ্রুতগতিতে আসিয়া মাছের সামনে উপস্থিত হয় সস্তায় মাছ কেনা হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া মোহিনীকে আনন্দিত করে।

পরে মাছ কুটিয়া সুশীলা পরিপাটিভাবে ঝোল রাঁধিয়া ফেলেন। মোহিনীও স্ত্রীর অনুষ্ঠিত ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্নানান্তে দুপুরে পরম তৃপ্তিতে মাছের ঝোল ও ভাত আহার করেন।

মোহিনী কৃশকায় ও গৌরবর্ণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্ণটা পাকিয়া তামাটে হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গলা সরু ও দীর্ঘ। শ্বাস-নালীর হাড়ের গ্রন্থি ত্রিকোনাকারে গলার সামনে চিবুকের নীচে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মাথা ছোট, মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মিশানো। তিনি মাঝামাঝি ভাবে মিশুক ধরণের।

সহরে কেউ কাহারও খোজ রাখে না। গ্রামে আসিয়া মোহিনী বুঝিয়াছেন যে তিনি এখানে দশজনের মধ্যে একজন। চৌধুরী বাড়ীর পূর্ব্ব গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও এখনও ঐ বাড়ীর বড় বাবু বলিয়া যেটুকু গৌরব এখনও অবশিষ্ট আছে উহাই মোহিনীর পক্ষে যথেষ্ট।

দুপুরে মোহিনীর বাড়ীতে সুশীলাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মেয়েরা আড্ডা জমান। সেই আড্ডা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে চলিতে থাকে।

গ্রামের টাটকা মাছ ও ভাল দুধ খাইয়া মোহিনী তাজা হইয়া উঠিতেছেন। তবুও মোহিনীর বয়সী কোন কোন ফাজিল সুন্দরী বিধবা বলে, মোহিনী দা চেহারা যে একেবারে ঠুনকো হয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে যৌবন ফিরিয়ে আনুন। দুটো রসের কথা কই আপনার সঙ্গে।

রাস্তায় কোন বড় ঘরের বৃদ্ধা গৃহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মোহিনী তাঁহাকে প্রণাম করেন।

বৃদ্ধা বলেন, ও মোহিনী, স্তাথ আমি বলি কি শোন। স্তাখ গাঁও ছাড়তে কিছুতেই নেই কিন্তু।

মোহিনী বলেন, না, মাসিমা, গ্রামেই তো এসে বাড়ী করলেম। গ্রামেই থাক্‌বো এখন।

বৃদ্ধা বলেন, আহা! থাক্ থাক্, তোরা না থাক্‌লে, তোদের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়ে মনটা হু-হু করে ওঠে।

মোহিনী কিছুদূর চলিয়া গেলে বৃদ্ধা ডাকিয়া বলেন, ও মোহিনী শোন্, শোন্।

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া বলেন, কি মাসিমা?

বৃদ্ধা বলেন, জগদীশ সম্পত্তি ছেড়ে দিল না?

—দিল ত না মাসিমা।

বৃদ্ধা চোখ মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রবল সহানুভূতিতে বলিয়া ওঠেন, ওমা, মা, এমন লোক তো দেখিনি। ভাই! সেই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারলে ছি, ছ!

বাড়ীতে বাড়ীতে মোহিনীর প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয়। বৌঝিরা আদর করিয়া তাঁহার পাতে আহার্য্য পরিবেষণ করেন।

সুশীলা স্বামীকে বলেন, ভয় পেওনা কিছুতেই যেন। সম্পত্তি আমাদের হবেই। প্রায় তো ভালই দেখছি। শহরে থাক্‌তে বাজে নভেল পড়ে গ্রাম সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা আমার জন্মে গিয়েছিল। সকলেই আমাকে ভালবাসে। সকলেই বলে ঠাকুর পো ভয়ানক লোক।

মোহিনীও বলেন, গ্রামে এসে ভালইতো আছি সুশীলা।

কিন্তু সব সময়েই মোহিনীর মন আনন্দে ভরপুর থাকে না। গ্রামে ঘরে ঘরে বয়স্ক মেয়ে বর্ত্তমান। সুতরাং শৈলর বিবাহ এপর্য্যন্তও হয় নাই বলিয়া কেহ কোন দিন মোহিনী বা সুশীলাকে জবাব দিহি করে না। তবে জগদীশ শত্রু। জগদীশের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায়। তাহাতে মোহিনী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম

করেন। সুশীলা বলেন, ভয় পেওনা কিছুতেই। সুদিন আসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

(২৫)

পরোপকারের কাজে ব্রতী হইয়া সুবিমল ছয় মাস কাটাইয়া দিল। পরিশেষে সে গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

একদিন অমলকে সে বলিল, কেটে গেল যে ছয় মাস অমল দা।

অমল বলিল, কাল তোকে সমিতিতে নেওয়া হবে। তার আগে শিব মন্দিরে গিয়ে মহাকালের সাম্‌নে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

শিব মন্দিরটি লোকালয় হইতে দূরে, গভীর এক বনের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের সাম্‌নে পুরাতন এক পুকুর। মন্দিরটি পুরাতন, সুতরাং জীর্ণ। মন্দিরে সামান্য একটু শব্দ হইলেই উহা দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উচ্চ চূড়ায় গিয়া ঠেকে ও শব্দায়মান এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে।

পরদিন দুপুরে মন্দিরের পথে যাইতে যাইতে অমল সুবিমলকে বলিল, বিমল, তুই দেশের অনেক কাজ করে যেতে পারবি।

—কি করে বুঝলেন ?

—এত অল্পবয়সে তুই সমিতিতে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলি। তোরাই জানবি স্বাধীনতার আদি গুরু। সফল আমরা নিশ্চয়ই হব এ কাজে। আমাদের পথটাই ঠিক। যারা ভীরু তারাই সভায় গিয়ে বক্তৃতা করে আর রিজলিউসন পাশ করে। শুধু রিজলিউশনে দেশ উদ্ধার হয় না বিমল। এতে দেশ উদ্ধারের প্রহসন করা হয় মাত্র।

লোহা যখন উত্তপ্ত থাকে তখন তাকে জোরে ঘা দিতে হবে। সেই ঘা দেওয়ার শক্তি অর্জ্জন করা চাই। আমরা বক্তৃতা ছেড়ে দিয়ে কাজে নেমেছি। ভেবে দেখেছিস্ ভাল করে বিমল তুই ?

—দেখেছি।

—ভাল নয় আমাদের পথ ?

—খুব ভাল।

—বেশ শুনে সুখী হলেম। স্তাখ আজ কাল আমরা ডাকাতিটাই বড় বলে ধরেছি। আমরা দেশের ভেতর রক্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিতে চাই।

—তাতে আপনাদের কি লাভ হবে দাদা ?

— লাভ হবে রক্তের যে বিভিষিকা আছে তা চলে যাবে। ভীরু প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে সাহসে দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে। আমরা চাই বড় ধরণের একটা বিপ্লব। সব পুরাতন ভেঙ্গে দিতে চাই ঘা দিয়ে।

—যদি গড়তে না পারেন তবে ভেঙ্গে দিয়ে কি লাভ হবে ?

—কি লাভ হবে বল্‌ছিস্ ! লাভ হবে প্রকাণ্ড। ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজ গড়ে উঠবে যা নবীনতায় তেজোবান ও প্রাণশক্তিতে ভয়ঙ্কর।

—দশ হাজার বছর ধরে আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যে সমাজ শত শত রাষ্ট্র বিপ্লবের আঘাত সহ্য করে এসেছে তার প্রাণশক্তি কি তুচ্ছ করবার দাদা ?

—রেখে দে তোর দশ হাজার বছরের সভ্যতা ! সে সভ্যতার বড়াই করে আমরা সেই সভ্যতার অধিকারী হয়েও ত আমরা সাতশ' বছর পরাধীন। মুসলমান আমলে খাঁ সাহেব কোতল করতো, শূলে চড়াতো, চামড় উঠিয়ে নিত জীবন্ত অবস্থায়, কুকুর দিয়ে খাওয়াতো। ইংরেজের আমলে হড্‌সন, জনসনের বুটের লাথি খাচ্ছি আর গোলামের

গোলাম বনে যাচ্ছি মনে প্রাণে। দেশ অনাহারে শুকিয়ে গেল, গ্রামগুলো রোগে ভোগে উজাড় হয়ে গেল। লোকের উদ্দীপনা নেই, উৎসাহ নেই, বেঁচে থাকবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন নূতন কিছু গড়ে তুলবার ক্ষমতা নেই। লোক সব স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে চলেছে। দশ হাজার বছরের সভ্যতা! লোকে বলে থাকে কথাটা শুধু মাত্র নিজেদের শোচনীয় অক্ষমতা তাকে ঢাকবার জন্ম। ওকে প্রাণ শক্তি বলেনা বিমল! ও শুধু বেঁচে থাকা, শেয়াল কুকুরের মত বেঁচে থাকা। দশহাজার বছরের সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভ্রান্ত ও অচল কতকগুলো সংস্কার ও ধারণা নিয়ে মরা সমাজকে আঁকড়ে ধরে থাকা। ওকে বাঁচা বলেনা। চাই পরিবর্তন, সবল গতিশীল সমাজের নিত্য নূতন পথে বিবর্ত্তণ। তাই ঘা দিয়ে ভেঙ্গে দিতে পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজকে।

—এত বড় বিপ্লব কি করে আনা যাবে দাদা?

—কি করে আনা যাবে? ডাকাতি ও খুনের দ্বারা। রাজশক্তি অচল হয়ে পড়লেই বিপ্লব আপনা আপনিই এসে পড়বে।

শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অমল চক্ষু স্তিমিত করিয়া গভীর ধ্যানের ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুবিমলও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াই অমল গম্ভীর স্বরে সুবিমলকে ডাকিয়া বলিল, বিমল?

মন্দিরের প্রতিধ্বনি শব্দটাকে প্রসারিত করিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জোরে বলিল, বিমল।

সুবিমল ভাবের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে।

অমল উচ্চ ভাবোচ্ছ্বাসে মন্দির কম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ভগবানের করুণা বর্ষিত হয়েছে আমাদের ওপর। আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। উঃ কি ভয়ানক জোরের প্রেরণা পাচ্ছি আমি

বিমল। জেগে উঠ্‌ছে আমার অন্তরাত্মা ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায়। স্বাধীনতা! ভারতবর্ষ! ঋষির দেশ ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে! উঃ কি যে সে দিন বিমল। হবে, হবে, আবার ভারতবর্ষ জেগে উঠ্‌বে। খুব বড় উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি বিমল।

সেই নির্জ্জন মন্দিরের মধ্যে, বৃক্ষ লতা গুল্মের পরিপ্রেক্ষিতায়, বনানীর জটিল নীরবতার গর্ভে উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন উপায় ছিলনা।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইলনা। প্রতিধ্বনি থামিয়া গেল। আবার জটিল নিস্তব্ধতা আসিয়া মন্দিরের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে সেই অতি পবিত্র আবেষ্টনের মধ্যে শিবলিঙ্গের পশ্চাৎ হইতে এক খণ্ড ঝক্ ঝকে পরিস্কার তরবারি বাহির করিয়া উহা সুবিমলের হাতে দিয়া অমল বলিল, ভগবান মহেশ্বর এই তরবারি দিচ্ছেন আজ তোকে বিমল। প্রতিজ্ঞা কর।

—কি প্রতিজ্ঞা করবো?

অমল জোরে স্পষ্টভাবে বলিয়া উঠিল, প্রতিজ্ঞা কর তুমি এই তরবারির সম্মান রাখবে। কোনও দিনও দেশের কাজে পশ্চাৎপদ হবেনা।

—প্রতিজ্ঞা করলেম।

—না ওতে হবেনা। স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে বল্‌তে হবে আমি দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে তরবারির সম্মান রাখবো।

সুবিমল কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া গেল।

অমল বলিল, বিমল?

—আজ্ঞে!

—জীবনে সুখ চাওনা তুমি?

—না

—তুমি বিয়ে করবেনা কোনও দিন্ ?

—না

—সত্যি বিয়ে করবেনা ?

—সত্যি

—ভয় করবেনা প্রাণ বলে ?

—করবোনা। নিশ্চয়ই করবোনা।

—ডাকাতি, নরহত্যা এ সব করতে পারবে ?

—পারবো। নিশ্চয়ই পারবো।

—রক্ত দেখে, পশ্চাৎপদ হবে না ?

—হবোনা। নিশ্চয়ই হবোনা।

—যথেষ্ট সময় আছে এখনও ফেরবার। ভেবে ছাখো ভাল করে পারবে কিনা ?

—ভেবে দেখেছি।

—তবে আজ থেকে সমিতিতে প্রবেশ করলে তুমি। এস আমরা কিছুক্ষণ ধ্যান করি।

এই বলিয়া অমল চোখ বুঁজিল। অমলও চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই স্থানের গাছগুলি পুরোনো ও কাঁটায় ভরা। পুকুরটাও গলিত-ভাবে পচা। সেখানে গাছের ঘন পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোর প্রবেশ করিবার উপায় নাই। মন্দিরের দেওয়াল ফাটিয়া স্থানে স্থানে চৌচির হইয়া গিয়াছে। সেই ফাটাল দিয়া গজাইয়াছে বটবৃক্ষ। মন্দিরের দেওয়াল বহিয়া নামিয়া আসিয়াছে পুরু ছাতার বিস্তৃত রেখা। সেই ছাতার গন্ধ অসামান্য ভাবে শীতল ও প্রাচীন।

সকাল বেলা পরেশ এক চুমুক চা পান করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, বিমলের তো বিয়ে যা হ'ক একটা ঠিক হ'য়ে গেল, কুমুর যে চেষ্টা করেও একটা ভাল বর জোটাতে পারছিনে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ডাকাত বেটারা!

পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আবার তোমার ঘরে ডাকাতি দিল?

—না, না, স্তাখো ব্যাপারটা! মেয়ের সম্বন্ধ যেখানেই উপস্থিত করি সেখানেই ব্যাটারা যাইবে পাঁচ হাজার দশ হাজার। চোষ মেয়ের বাপকে যত পার! বিমলের বিয়েতে দাবী দাওয়া মোটেই করলেমনা, অথচ আমাকে কেউ ছেড়ে কথা কইবেনা। আমার অবস্থা ভাল। অবশ্য আমি কিছু করেছি নিজের চেষ্টায়। কেউত এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি পরেশ চৌধুরীকে। তা কত? কত আমি দিতে পারি? তাও ব্যাটারা সহ্য করতে পারে না। এখন পরেশ চৌধুরী কায়দায় পড়েছে। এখন মার ওকে যত পার।

এই সময়ে কুমুদিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদিনী বলেন, লোকে মেয়ের বিয়ের সময় যা ভাবে ছেলের বিয়ের সময় তা তো ভাবেনা।

পরেশ বললেন, কেমন?

—মেয়ের বিয়ের কেউ টাকা দিতে চায়না। ছেলের বিয়ের সময় সেই বাপই কষে টাকা আদায় করতে যায়।

—হয়েছেও তাই। মুখে যা বলে ব্যাটারা কাজে তা করে না।

—নিজেদের কথাই বলি। আপনি দাবী দাওয়া করেন নি বটে,

কিন্তু এমন করে আপনি দাদার বিয়ে ঠিক করেছেন তাতে না চাইলেও আপনার পাওনা কম হবে না। ছেলের সহায় হবে। মেয়ে কুৎসিত। তাও আপনি রাজি হলেন। অথচ শৈলর মত মেয়ে নেই। তার বাবা গরীব, টাকা দিতে পারবেন না বলেই তো অমন মেয়ে আমাদের ঘরে এল না।

এতক্ষণে পরেশ বুঝিতে পারিলেন কাহাকে লক্ষ্য মেয়ে কথাগুলি বলিতেছে।

ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কুমুদিনীর মা কুমুদিনীকে ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ কর বলছি। স্বামীকে বলিলেন, ত্মাখো ভেবে পাইনে ওর কি হবে। পাগল একটা ও।

কুমুদিনী বলিল, পাগল বল আর যাই বল মা, সত্যি যা তা বল্‌তে আমি পিছিয়ে যাব না। ত্মখোতো কি চেহারা শৈলর। কি মানাতো দাদার সঙ্গে। কত সুখী হতে তুমি!

পরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, রেখে দে তোর সুন্দর! দাদা! ভারি দাদা! কি আছে মোহিনীর?

—আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা। আপনার বোঝবার শক্তি নেই। ওরা ভাল লোক। না থাক্‌লো ওদের টাকা। ওদের টাকা দিয়ে কি হবে আমাদের?

—চুর কর বল্‌ছি।

—না, আমি চুপ করবো না।

—আমি বলছি চুপ কর।

বাপের মেয়ে কুমুদিনী, উদ্ধত তেজে বলিল, না, চুপ আমি কিছুতেই করবো না। আপনি কিছুতেই দাদার বিয়ে এ মেয়ের সঙ্গে দিতে পারবেন না।

পরেশ ভয়ানক জোরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, চুপ কর হারামজাদী।

পরেশের হুঙ্কারে কুমুদিনী টলিল না। বেপরওয়াভাবে সে বলিল, আপনি তো সারাদিন হারামজাদী হারামজাদীই করেন।

পরেশের রাগ পঞ্চমে উঠিল। তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়ের চটি খুলিয়া মেয়েকে প্রহার করিতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

ব্যাপার দেখিয়া কুমুদিনীর মা ছুটিয়া আসিয়া পরেশকে ধরিয়া বলিল, কর কি, কর কি? একেবারেই যে পাগল হলে তুমি!

—না, না, তুমি বাধা দিও না। প্রায়ই মাঝে মাঝে ও ওরকম করে। না, না, তুমি বাধা দিওনা।

—না, তা তুমি কিছুতেই করতে পারবে না।

এই বলিয়া—কুমুদিনীর মা এক প্রকার জোর করিয়াই স্বামীকে ঠেলিয়া লইয়া চেয়ারে বসাইলেন।

কুমুদিনীকে লক্ষ্য করিয়া সুরমা বলিল, ফের যদি মুখে মুখে কথা বলাবি তো দেখা যাবে। পোড়ার মুখী! তোর মরণ হয় না পোড়ার মুখী! হারামজাদী! এত লোক মরে যায় আর তোকে যমে চোখে ভাখে না।

কুমুদিনী বলিল, তোমরা তো আমাকে হারামজাদী পোড়ারমুখীই বল।

এই বলিয়া অসীম ক্রোধে মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া দড়াম করিয়া শব্দ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরেশ বলিলেন, আমার মনে হয় আমি এদের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আমার মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই অন্য দেশে। উঃ! আর সহ্য হয় না।

ঘরের ভিতর হইতে কুমুদিনী জোরে বলিয়া উঠিল, পালিয়ে গেলেই পারেন। যান্ বাড়ী ছেড়ে আজই যান্। ও কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। যান্ আজই বাড়ী ছেড়ে চলে যান্।

—কি বললি ?

—বলছি যা তা কি আপনি শুনতে পান না ? আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। আপনি গেলে আমাদের কিছু আসবে যাবে না।

—কি বললি হারামজাদী ?

যা বলছি ঠিকই বলছি। আপনার মত বাপের মেয়ে হ'য়ে জন্মানো পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। আপনি শুধু স্বার্থপরই নন, আপনি একজন পাগল।

এই কথায় পরেশ নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। ভয়ানক ক্রোধে উঠিয়া গিয়া তিনি জোরে দরজায় লাথি দিলেন। দরজার এক পাল্লা জীর্ণ লোহার কব্জা হইতে খুলিয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া কতকগুলি বাসনের উপর পড়িবার পর ঘরের মেঝেতে পড়িয়া গেল।

সুরমা ভীত হইয়া গেলেন। পরেশকে পশ্চাৎ হইতে সাপ্‌টিয়া ধরিয়া টানিয়া আনিয়া চেয়ারে কষ্টে বসাইলেন। পরেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিলেন, না, না, ধরো না, আমি মরবো। ও আমাকে মেরে ফেলবে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরমা কুমুদিনীর হাত ধরিয়া জোরে তাহাকে টানিয়া লইয়া অন্য ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন ও পরে সেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শিকল আঁটিয়া দিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে স্বামীর সাম্‌নে মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন ও পরে স্বামী ও নিজে একটু শান্ত হইলে বলিলেন,

এই কাজ কি তোমার করা উচিত? কি করতে যাচ্ছিলে বলত?

পরেশ কোন উত্তর করিলেন না।

সুরমা বলিলেন, এখন দোষ দিয়ে লাভ নাই তো। কচি আগে থেকেই যে বাঁকা হয়ে গিয়েছে। নভেল পড়াও। কত নিষেধ করেছি।

পরেশ কোন কথা বলিলেন না।

সুরমা বলিয়া চলিলেন, যাক্ যা করেছ, করেছ। এখন তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক করে দিয়ে ফেল। আমার তো প্রাণ দিনরাত কাঁপে। ও যে রকম! কখন বা কি করে বসে!

এই সময়ে চাকর ডাকের চিঠি আনিয়া পরেশের সাম্‌নে রাখিল। চিঠি পড়িয়া পরেশ ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। পরে মর্ম্মান্তিকভাবে বলিলেন, ওঃ।

স্ত্রী দুঃসংবাদ আশঙ্কা করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, কে লিখেছে চিঠি?

'গ্যাখো পড়ে গ্যাখো' এই কথা বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রবল উষ্মায় বলিলেন। পড়ে গ্যাখো তুমি। তবে আমি বল্‌ছি বাছাধন যা করলেন তার ফল তিনি বিলক্ষণ ভোগ করবেন। পুলিশ না ফিঙ্গে হয়ে লাগ্‌বে পেছনে। শেষে জেলে যেতে হবে ওর। কোথায় থাক্‌বে দেশের কাজ! শেষে দুটো অন্ন জুটবেনা হারামজাদার। কেউ সাহায্য করবে না একটা পয়সা দিয়েও। ভুক্তভোগী আমি। গরীব থেকে বড় হয়েছি। আমি সবই জানি। ও হারামজাদা জান্‌বে কোত্থেকে! জান্‌বে জান্‌বে তখন যখন আর শোধরাবার উপায় নেই। ওই হতভাগার জন্তে মাসে

মাসে কলেজের টাকা গুনছি। টাকাগুলো জলে ফেলেছি দেখছি। সবই আমার ভাগ্য। পাশ বুকে যে টাকাগুলো করে দিয়েছি ওর তা এইবারে শেষ হবে।

এই কথা বলিয়া তিনি বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন ও সেখানে প্রবল বিপর্য্যয়ের ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল, ওঃ।

চিঠি পড়িয়া কুমুদিনীর মা দেখিলেন চিঠি সুবিমল লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে সে বর্ত্তমানে বিবাহ করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। সে কলেজে পড়িতে চায় না কেন না সে চাকরী করিবে না। বেশী টাকার তাহার প্রয়োজন নাই। সে দেশের কাজে প্রাণ দেবে। পিতা যেন অগোণে প্রস্তাবিত সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

কুমুদিনী চিঠি পড়িবার জন্য যে দরজায় শিকল দেওয়া ছিল না সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

চিঠি পড়িয়া মায়ের সমস্ত ক্রোধ কুমুদিনীর উপর গিয়া পড়িল। বলিলেন, হায়, হায়, তোকে দিয়ে যে কি করবো আমি তা ভেবে পাইনে। মনে হয় তোর জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে আমি মরি। পোড়ার মুখী!

—কেন কি করেছি আমি?

—চুপ কর পোড়ার মুখী। কথা বলবি যদি ফের!

—যা সত্যি তা বলতে ভয় পাবো কেন? একশোবার বলছি বাবা দাদার এ বিয়ে ঠিক করে ভাল করেন নি।

কথা কাটাকাটিতে কুমুদিনীর চিঠি পড়া হইল না। সে জানিল না যে সুবিমল চিঠিতে এক নিদারুণ সংবাদ প্রকাশ করিয়া পিতার বুকে আঘাত হানিয়াছে।

সুরমা বলিলেন, দ্যাখ ছোটমুখে বড় কথা ভাল নয়। আমি বলছি বেশ করেছেন তিনি। তোর আমার কিলো তাতে?

বাবা যদি নিতান্তই অন্যায় করে বসেন তা আমরা বলবো না কেন? আমরা কি দাদার কেউ নই?

উভয়ের রাগই চরমে উঠিয়াছিল।

সুরমা বলিলেন, আজ যদি আমরা বাপমা তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করি তবে কি তুই আপত্তি করবি লো?

—নিশ্চয় করবো।

—আবার বল দেখি।

—একবার কেন, একশবার বলবো তোমরা যার তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইলে আমি রাজি হবো না।

—কি বললি?

—বলবো কি আর? শুনবে তবে!

—বল দেখি, তোর বুকের পাটা কতদূর।

—বুকের পাটা আর কি? আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি যে আমি ভবনাথ বাবুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।

রাগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সুরমা কুমুদিনীর গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন। বলিলেন দূর হ পোড়ারমুখী, আমার সামনে থেকে। তোর মুখ আমি দেখবো না।

কুমুদিনী রাগ করিয়া শিকল খুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সশব্দে দরজা বন্ধ করিল। মা পূর্ব্বের ন্যায়ই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বিকালে মাতা পুত্রীর মিলন ঘটিল। সুরমা বলিলেন, কর্ত্তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তোর।

কুমুদিনী বলিল, কি করেছি আমি যে ক্ষমা চাইব।

—অন্ততঃ আমার কথায় তোকে চাইতে হবে।

কুমুদিনী অনেক ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা তুমি যা বল।

পরেশ কাচারী হইতে ফিরিলেন তখন সুরমা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন স্বামীর সমস্ত দিন মোটেই সুখে কাটে নাই। তাঁহার মুখের চেহারা ডাল-ভাঙ্গা, পাতা-ওরা গাছের চেহারার মত হইয়া গিয়াছে।

পরেশ সুস্থ হইয়া বসিবার কিছুক্ষণ পর সুরমা বলিলেন, ভাখো ভরসা যদি দাও তবে একটা কথা বলি।

পরেশ গভীর বিষাদের সুরে বলিলেন, বল।

—ভাখো আগেই বলেছিলেম বিমল এ বিয়েতে মত দেবে না। আমি জানি যে সে শৈলকে ভালবাসে।

পরেশ কোন উত্তর করিলেন না।

এই সময়ে কুমুদিনী আসিয়া মায়ের কোন ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল।

মা ছোটস্বরে বলিলেন, যা না তুই।

কুমুদিনী বলিল, না আমি যেতে পারবো না।

—আমি বল্‌ছি যা।

পরেশ বলিলেন, কি?

সুরমা বলিলেন, ক্ষমা চাইতে এসেছে ও।

এই কথায় কুমুদিনী উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সে পিতার নিকটে অবনত হইয়া বসিল।

অনুশোচনার এই অভিনয় দেখিয়াই পরেশ গলিয়া গেলেন। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখ দিয়া অজস্রভাবে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি বলিলেন, যাও মা তোমার ঘরে। আমার আর তোমার উপর রাগ নেই।

কুমুদিনী পিতার উচ্ছ্বাসে একটুও বিচলিত হইল না। সে নীরবে অবনতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল পরে হঠাৎ এক সঙ্কল্প গঠন করিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুমুদিনী চলিয়া গেলে পরেশ স্ত্রীকে বলিলেন, দ্যাখো কুমুকে যে আর রাখা যায় না।

সুরমা বলিলেন, তা তো আমি বল্‌ছিই আগাগোড়া।

—হতভাগাটা শেষে এই জবাব দিলে?

—কি করবে বল। ও অভিমান কেটে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরমা বলিলেন, দ্যাখো একটা কথা।

—কি?

—ছেলের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে গিয়ে যা হ'ল তা দেখলে। মেয়েরও কিন্তু একটা মত আছে।

—কেন কুমু কি কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ বলেছে বই কি। কথা কাটাকাটি হলে তো ওর জ্ঞান থাকে না। বলেছে ভবনাথ ছাড়া আর কাউকেও বিয়ে করবেনা ও।

—কখন বলেছিল?

—তোমার যাওয়ার পরে।

পরেশ কোন উত্তর করিলেন না। প্রচণ্ড এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে শুচি হইয়া চন্দ্রকান্ত নামাবলী গায়ে দিয়া মোহিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, ওমা সুশীলা, ওমা শৈল।

পূজার ঘরের ভিতর সুশীলা ও শৈল পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। সুশীলা বলিলেন, ছাখ তো মা শৈল। যা তো। পুরুত জেঠামশায় বোধ হয় এসেছেন। যা তো। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

বাইরে গিয়া শৈল চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিল।

সুশীলাও পর পরই বাহির হইয়া আসিলেন। চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিলে পর তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, মা, সুখী হওমা। বেঁচে থাক।

সুশীলা হাসিয়া বলিলেন, ও আশীর্ব্বাদটা আর করবেন না জেঠামশায়।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ছ্যাখ, কি যে হয়েছিস তোরা! মোহিনীর মুখেও এই কথা শুন্‌তে পাই।

সুশীলা বলিলেন, না, না, জেঠামশায়, আমরা তো এখানে কোন অসুখে নেই। মরতে চাইবো কেন?

—এই কথাই তো শুনতে চাই তোদের মুখে। যাক্ বসি একটু এখন। অনেকদূর হেঁটে এসেছি। বুড়ো বয়সে বেশী হাঁটা সহ্য হয় না।

ঘরের বারান্দায় সুশীলা কুশাসন পাতিয়া দিলেন।

চন্দ্রকান্ত উপবিষ্ট হইলে সুশীলা বলিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন জেঠামশায়?

—সুরেনের স্ত্রী ছাড়ে না। বলে একটা দিন দেখে দিতে হবে। তাই সেখানে গিয়েছিলেম এখ আসবার পথে। একটু দূর তো। সুরেনের স্ত্রীকে চেন তো?

—খুব চিনি। সমবয়সী আমার সে

—সেখানে গিয়েছিলেন। আহাঃ কত কষ্ঠ পাচ্ছে। তাই ভাবি সুশীলা মাঝে মাঝে পাপ পুণ্য কিছু নয় এ সংসারে। এ ভোজবাজীর অর্থ বুঝা দায়। ঐ যে পাগলাটা গেয়েছে, মা আমায় ঘুরাবি কত কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত। একেবারে কলুর বলদ আমরা সব মা, কলুর বলদ। তারা! তারা! তারা! কবে যে এই ঘানি টানার শেষ হবে মা! শেষ ত হবে না। মরলে গিয়ে তো আবার এই ঘানিই টান্‌তে হবে মা। করলেম কি এখানে? কি বলবো গিয়ে বিধাতা পুরুষের কাছে? সোজা জায়গা তো নয় মা সে! বৈতরনী পার হবার কড়ি তো জোগাড় করলেম না।

সুরেন যশস্বী উকিল ছিলেন। অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী কষ্টে বড় ভাইয়ের সংসারে দিনপাত করিতেছেন।

সুশীলা বলিলেন, কি ভাবে আছে সে জেঠামশায়?

—কেন ভাসুর তো আছেন। তিনি কি খারাপ ব্যবহার করেন?

—করে না! বৌয়ের বুদ্ধিতে চলে সে। সব কাজ করবে ওই সুরেনের বৌ। সে নিজে কিছু করবে না। সুরেন ওকালতি করে পয়সা লুটতো। সব টাকা তো দিয়েছে ওই হতভাগা ভাইটাকেই। আজ ও রীতিমত পয়সাওয়ালা মানুষ। তাই মনে হয় সুশীলা, ভাল কাজের কোন ফল নেই। 'কি যে মায়া করে রেখেছিস্ পাগলী মেয়ে! এ মায়া ভেদ করতে না পেরে সে পরাণ খাবি খায়। মা, মা, মা!

শেষের তিনটি কথা চন্দ্রকান্ত জোরে চিৎকার করিয়া বলিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, যাক্ সে সব কথা এখন। চল মা, পূজোয় বসিগে গিয়ে। দেখি মা শৈল, পা ধোওয়ার এক ঘটি জল নিয়ে আয় তো মা। দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়! ও সুশীলা, তোমার ও রকম মেয়ে কিন্তু আমার ঘরে পোষাবে না।

পা ধুইয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, চল মা যাই। পূজোয় বসিগে চল।

সুশীলার চৈতন্য হইল। বলিলেন, জেঠামশায়, একটু বসুন। যোগাড় এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

—যা মা, তাড়াতাড়ি কর গিয়ে। খাবি দাবি তোরা কখন?

—বেশী কি আমাদের খাওয়াই জেঠামশায়!

—বটেই তো! বামুন পণ্ডিতের ছেলে আমরা। জীবনের অনেক কঠোরতা সহ্য করতে হয় আমাদের।

সুশীলা উঠিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত শৈলকে বলিলেন, একটা মাদুর নিয়ে আয় তো মা। শুয়ে জিরোই একটু।

প্রকাণ্ড মাদুরের উপর শুইয়া কিছুক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাঁহার পক্ক মসৃন হাল্কা বুকের লোম দক্ষিণের মৃদু বাতাসে নড়িয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শৈল আসিয়া ডাকিল, দাদা মশাই!

চন্দ্রকান্ত ধরমড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আবিষ্টের মত বলিলেন, কে, কে?

শৈল ধীর ভাবে বলিল, জোগার হয়েছে দাদামশায়।

চন্দ্রকান্ত কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া শৈলর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, কি!

শৈল পুনরায় বলিলেন, যোগাড় হয়েছে।

এতক্ষণে চন্দ্রকান্ত সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন. ও, তাইতো! ভুলেই গিয়েছিলেম যে সব আমি।

পূজা শেষে আহারের সময় সুশীলা চন্দ্রকান্তের পাতে বেশী করিয়া পিঠা চাপাইয়া দিলেন। চন্দ্রকান্ত আপত্তি করিয়া পরে বলিলেন, ঐ দিকে দেনা মা? অসুখ করবে যে। বয়স পঁচাত্তর যদিও খেতে কোনও দিনও কম পারিনি। মহামায়ার আশীর্ব্বাদে কোনও দিন অসুখও হয় নি।

সুশীলা বলিলেন, আপনাকে খাইয়ে, জেঠামশায় কত যে আনন্দ পাচ্ছি তা আর কি করে বল্‌বো?

চন্দ্রকান্ত সরল উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি কি পাচ্ছি নে? ভাল বংশের মেয়ে তুই মা। ভাল বংশে পড়েছিস। আচার বিচারে তো তোদের ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। ভাবি কেন লোকে বিদেশে যায়। দেশে সকলে মিলে মিশে থাকি এই তো ভাল। সকাল বেলা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে তোদের দেখে কি যে আনন্দ পাই তা আর কি করে বলবে।

—জেঠামশায়, আপনার মত সংসারে কয়জন আছে—জেঠামশায়! মনে হয় শৈলর বুঝি আর বিয়ে হ'ল না। কে দেবে বিয়ে? কি দিয়ে হবে? কিছুই নেই যে।

—হবে, হবে, সবই হবে। যখন হবার তখন হবেই এইটেয় যে তোরা বিশ্বেস রাখতে পারিস্ নে তাই আমি ভাবি। কে কাকে করায় মা? মানুষ আমি আমি করে। ও যে একটা মস্ত ভুল। জানবি সব তিনি করছেন, করবেনও সব তিনি। ভাবিস নে মা। শৈল পাপভ্রষ্টা দেব কন্যা। ওর কিছুতেই অমঙ্গল হবে না।

আহার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর দক্ষিণার দুই আনা নামাবলীতে বাঁধিয়া চন্দ্রকান্ত সন্তুষ্ট চত্তে প্রস্থান করিলেন।

মোহিনী মহা-উৎসাহে সুশীলাকে বলিলেন, ওগো শুনেছ !

সুশীলা বলিলেন, কি ?

—ভারি নিন্দে করে বেড়াচ্ছে আমার জগদীশ। সঙ্গে পণ্ডিতও আছে।

—পণ্ডিত কে ?

—হরিহর, হরিহর পণ্ডিত, যে জগদীশের মোকদ্দমার তদ্বির করে। একা সে তার পক্ষে সাক্ষী দিয়ে এসেছে। তারই দেখছি আমার ওপর ভারি রাগ।

—ওমা তাঁকে তো চিনেনে।

—না চেন না ! একেবারে শুক্‌নো চেহারা, দাঁত-বাড়ানো।

শৈল বলিল, ও মা, চেননা ? এই রাস্তা দিয়েই তো যায়। একেবারে শুকনো মা, একেবারে শুক্‌নো।

এই কথা বলিয়া শৈল হাসিয়া গলিয়া পড়িল। পড়ে বলিল, চেননা মা ? ঐ যে লোকটা নাইবার সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ওঃ ! এতক্ষণে চিনলেম ! পোড়াকপাল ! ওই তো মানুষ ! তা ওই মানুষ নিন্দে করল তো বয়ে গেল আমাদের। নিন্দে তো করবেই। মোকদ্দমা হচ্ছে যে।

—হ্যাঁ ঠিক কথা। আর কয়দিনই বা নিন্দে করবে।

—কেন ?

—কেন আবার কি ? মোকদ্দমায় তো ওদের হার নিশ্চিত।

—কেন ?

—আবার কেন ? উকিল তো আশ্চর্য্য হচ্ছেন ভেবে কেন জগদীশ এপর্য্যন্তও আপোষের প্রস্তাব করে না।

—উকিল কি বলেছেন ?

—উকিল বলেছেন কিছুতেই জগদীশ পারবে না। আর উকিল কেন, আমিই রীতিমত বুঝতে পারছি ও কিছুতেই পারবে না।

—কি করে !

মোহিনী জোরে বলিয়া উঠিল, কি করে আবার ! ওর সাক্ষী দেখে। একটা ভাল সাক্ষীই কি ছাই জোগাড় করতে পেরেছে ও। কেন ভাল লোক ওর সাক্ষী দেবে বল ত ? সবাই তো জানে ও লোকটা কি ? ওর বড় সাক্ষী পণ্ডিত। হাসি পায় পণ্ডিতের কথা মনে করে।

—কেন কি হয়েছিল ?

—হয়েছিল ! একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল পণ্ডিত উকিলের জেরায়। আশ্চর্য্য হয়েছে, সুশীলা, উকিলের জেরা দেখে। উকিল বলেছেন জগদীশের ভিটেয় ঘুঘু চড়াবো তবে ছাড়বো মামলার উপর মামলা করে। বলেছেন ঐ হ্যাংলা ঠাকুরকেও ছাড়বো না। হ্যাংলা ঠাকুর মানে বোঝত ?

—হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই।

—ও আবার মশাই। তাই আমি, আশ্চর্য্য হই ভেবে পণ্ডিত, তোর কেন এত মাথা ব্যথা বাপু আমি তো তোর কোন অনিষ্ট করিনি বাপু! তুই খাবি, দাবি, পূজো পার্ব্বণে পুজি পুঁথি সুর করে পড়বি। তা না করে কিনা আদালতের সামনে টিকিতে ফুল বেঁধে হটর হটর। হাঁটারই বা কি ছিরি !

স্বামীর কথায় হিংসার স্রোত একটানা ভাবে বাহিয়া যাইতেছিল। সুশীলার ইহা মোটেই ভাল লাগিল না।

শৈল ইহার পূর্ব্বেই রান্নাঘরে চলিয়া গিয়াছিল।

সুশীলা বলিলেন, মোকদ্দমা করবে কর। ও রকম বিশ্রী করে লোকের নিন্দে করবে কেন?

মোহিনী লজ্জিত হইলেন। তাঁহার কথার স্বর একদম নরম হইয়া গেল। বলিলেন, জেদের ভেতর অনেক বাজে কথা বেরিয়ে পড়ে সুশীলা। আমার যে কি ভয়ানক অবস্থা তা কি তুমি বুঝতে পার না? একটা আশা দেখতে পাচ্ছি তাই মনে একটু শান্তি পাচ্ছি।

সুশীলা বুঝিলেন তিনি স্বামীর মনে ব্যথা দিয়াছেন। নিঃশব্দে তাঁহার গাল দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মোহিনী বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাঁদছ তুমি সুশীলা?

এই বলিয়া তিনি সুশীলাকে বুকে টানিয়া লইয়া নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া সুশীলার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন ও সুশীলার গালে চুম্বন করিলেন।

পরিণত বয়সেও স্বামীর আদর পাইয়া সুশীলা গলিয়া গেলেন। রসাভিষিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ছাড়, মেয়ে এখনই এসে পড়বে। চান করব চল।

মোহিনী সুশীলাকে বাহুমুক্ত করিয়া কহিলেন, চল। আজ আর আমার কোন ভয় নেই। সুদিন আমাদের আস্‌বেই।

দুপুরে আহারে বসিয়া সফলতার উল্লাসে ভাত মাখিতে মাখিতে মোহিনী বলিলেন, করগেট টিনের কথা বলে এসেছি সুশীলা।

—কাকে বলেছ?

—রংপুরের দোকানদার সে। সে টিন ও কাঠ দেবে। তা ভাবছি জগদীশের কাছে বকেয়ার মধ্যে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেব, আর বাড়ী করবো। বাড়ীর অর্দ্ধেক টাকা ধারে চল্‌বে। পরে ধীরে ধীরে শোধ করলেই চল্‌বে।

সুশীলা হাসিয়া বলিলেন, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

—আবার গাছে কাঁঠাল কেন? জয় তো সুনিশ্চিত।

শৈল বলিল, বাবা, নূতন বাড়ীতে একটা বাথরুম করবেন বাবা।

—তুই তো চলেই যাবি মা।

—তাও করবেন। যখন আসবো তখন ব্যবহার করবো।

—আচ্ছা করবো। বাথরুম করতে আর কত লাগ্‌বে?

(২৯)

পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিয়াও সুবিমলের চিঠি পাওয়া গেল না। অগত্যা পরেশ সুবিমলের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মেয়ে ভবনাথকে পছন্দ করিলেও ভবনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে পরেশ মোটেই রাজি হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার ধারনা ছিল, ভবনাথ হত দরিদ্র, অন্নের গলগ্রহ। কিন্তু যে দিন মুন্সেফ চন্দ্র বাবু বলিলেন সুরেশদের ব্যবসা ভালই চলিতেছে ও তাহারা সম্প্রতি একলক্ষ টাকা দিয়া নূতন জমি কিনিয়াছে সেই দিন পরেশের ভবনাথ সম্বন্ধে ধারণা হঠাৎ তড়িৎগতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন ব্যবসা ভাল চলিলে অংশীদার ভবনাথের বড় লোক হইতে কতদিন! এই চিন্তায় তিনি মনে করিলেন ভবনাথের সঙ্গে বিবাহ হইলে কুমুদিনীর অল্পদিনের মধ্যেই রাজরাণী হইয়া পড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে পরেশের যশ চারিদিকে শতগুণে ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার দুঃখ হইল এই ভাবিয়া যে এতদিন বিশেষ পরিচয়ের মধ্যে হাতের কাছে একটা বরের মত বর বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি একবারও নজর দিবার সুযোগ পান নাই।

সুরেশ সম্প্রতি রাজসাহীতেই আছে

সেই দিন বিকালে বাড়ীতে পৌঁছিয়া বসিলেন না। আফিসের পোষাক না ছাড়িয়াই তিনি সুরেশের বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া চলিলেন। স্ত্রীকে সংক্ষেপে বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, এখন জলযোগ করব না, ফিরে এসে করব।

পরেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পর স্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন, স্থাখো, শোন।

পরেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভাল কাজে যাচ্ছি। পিছু ডাক দিলে কেন?

—ওতে কিছু হবে না।

—কি বল্‌তে চাইছিলে?

—বল্‌তে চাইছিলেম হঠাৎ গলে যেন পড়োনা। হঠাৎ বেশী টাকা দিতে স্বীকার করোনা কিন্তু।

—সে কথা কি তোমার আমায় বল্‌তে হবে? টাকা তো আমিই করেছি।

—করেছ ত তুমি; কিন্তু হঠাৎ তাল কাণা হয়ে পড় যে। তাই ভয় হয়।

—তুমি আমায় একেবারেই চিনলে না।

—যা চিনেছি তাই যথেষ্ট। যাক্ ভেবে চিন্তে কথা বলো কিন্তু।

দ্রুতগতিতে সুরেশের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পরেশ নিজের প্রস্তাব পেশ করিলেন। বড় লোক তিনি, কিছুতেই এক অসম্ভব ধরণের ছোট-কেনাবেচার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তিনি ছোট হইতে পারেন না, তাই তিনি আগেই প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে তিনি নগদ তিন হাজার টাকা পণস্বরূপ দিবেন ও বরের নামে পোষ্টাফিসের সেভিংস

ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া দিবেন মেয়েকে তিনি তিন হাজার টাকার গহনা দিবেন।

পরেশের অবস্থা হিসাবে রাজসাহীতে নাম ছিল। কুমুদিনীও চলিত সাজিয়া গুজিয়া হাল ফ্যাসানে। সুতরাং এই মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া অনেক যুবকের মনেই স্বপ্ন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ হেন কুমুদিনীর সঙ্গে নিঃসম্বল ভবনাথের বিবাহ প্রস্তাবে সুরেশ অবাক্ হইয়া গেল। পরেশ এত টাকা দিতে চাহিতেছেন শুনিয়া সুরেশের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় সে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

পরেশ এই নীরবতা লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন সুরেশ এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজি হইতেছে না। কল্পনায় ভবনাথের পদমর্য্যাদা পরেশের চোখে অসম্ভব রকমে বড় হইয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিবার অবসর পাইলেন না যে সুরেশ ভবনাথকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করিতেছে।

সুরেশ আপত্তি করিতে পারে ভাবিয়া তিনি নিজের উচ্চ পদমর্য্যাদার কথা ভুলিয়া গেলেন ও উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকটা হিষ্টিরিয়ার রোগীর উচ্ছাসের মত উচ্ছাসে নিজের পৈতা দ্বারা হঠাৎ সুরেশের হাত জড়াইয়া ধরিয়া অসহায়ের মত বলিলেন, সুরেশ বাবা, আমার প্রস্তাবটা যেন অগ্রাহ্য করো না বাবা, কন্যাদায় বড় দায় বাবা।

সুরেশ এতটা ঘটিতে পারে বলিয়া কখনও মনে করে নাই। সে তাড়াতাড়ি পরেশের হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পরেশের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া বলিল, করেন কি আপনি? আপনি আমার গুরুজন। আমার কি আপত্তি থাকতে পারে বলুন তো। প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করলে ভবনাথের কোন আপত্তি থাক্‌বে না ঠিকই!

তবুও তার বয়স হয়েছে তাকে কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করার দরকার। কলকাতায় গিয়েই আপনাকে চিঠি দেব।

পরেশ বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন, লিখো কিন্তু বাবা।

সুরেশ বলে, লিখ্‌বো, নিশ্চয়ই লিখ্‌বো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজসাহীতে ভবনাথের ইন্ধন কাছেই ছিল, সুতরাং সেখানে আগুন নিভিবার অবসর পাইত না। কলিকাতায় ইন্ধন কাছে না থাকায় সে আগুন অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থায় সুরেশ যখন কুমুদিনীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল তখন সে উহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিলেও সে রীতিমত খটকায় পড়িয়া গেল। যখন সুরেশ বলিল যে রাজসাহীতে সে পরেশ বাবুকে এক রকম কথা দিয়া আসিয়াছে তখন ভবনাথের সুরেশের উপর রাগ হইল। যদিও রাগটা বাহিরে প্রকাশ পাইল না, যদিও সে একবারও ভ্রূ কুঞ্চিত করিল না অথবা চোখের দৃষ্টি বক্র করিল না তথাপি সুরেশ বুঝিল যে ভবনাথ কি যেন ভাবিতেছে। বলিল, কেন কাজটা কি অন্যায় করা হয়েছে?

ভবনাথ বলিল, অন্যায় হয়নি ঠিকই। তবে কিনা—

—তবে কিনা কি? তুমি স্ত্রীকে এখন ভালভাবে ভরণ পোষণ করতে পারবে না এইত? তা আমি তোমার বড় ভাই। তুমি যতদিন সেইরূপ উপার্জ্জনের ক্ষমতা অর্জ্জন করতে না পার ততদিন তোমার স্ত্রীকে আমিই প্রতিপালন করবো। তত দিন তোমার স্ত্রী সুরবালার কাছেই থাক্‌বে।

—তা থাকুক।

—তবে আপত্তি কি তোমার?

—আপত্তি যে কি তা কি করে বলি?

যদিও তোমার আপত্তি আমি মোটেই গ্রাহ্য করবো না তবুও বলছি একবার ভেবে ভাখো!

আচ্ছা ভেবে দেখি একবার।

(৩০)

সুবিমল কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। সে অমলের সঙ্গে এখন ডাকাতিতে যায় ও অমলের কড়া সামরিক নিয়মে চলে।

ইতি মধ্যেই সে কয়েকটা ডাকাতি করিয়া ফেলিয়াছে। বাঁশীর শব্দেই সে ডাকাতির বাড়ীতে সাগরেতদের সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ও কিছুক্ষণ দুম দাম রিভলভালের শব্দ ছুড়িয়া লুঠের টাকা লইয়া বাঁশীর শব্দে সরিয়া পড়িয়াছে।

দুই একটা হত্যাও তাহাকে অমলের হুকুমে করিতে হইয়াছে। প্রথমে হত্যার এইরূপ নিষ্ঠুর কাজে সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই বরং হত্যাকাণ্ডের শেষে নিজের সাহসিকতায় নিজে গৌরব বোধ করিয়াছে।

এখন যেন সে সেইরূপ হত্যাকাণ্ডে পূর্ব্বের উৎসাহ পায় না।

এখন তাহার অবলম্বিত কাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ তাহার মনে ঠেলিয়া উঠিতে চায়।

কালকার রাত্রিতে সে এক বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছিল নির্ম্মমভাবে বৃদ্ধের কাতর অনুনয় সত্ত্বেও।

আজ সমানে গা-ঢাকা দিয়া দূরের একবনে তাহারা অবস্থান করিতেছিল। এই অবস্থায়ই সে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিল ঐ হত্যা কাণ্ডের কথাটা। এক পাড়াগাঁয়ের এক ধনবান্ নগন্ড বৃদ্ধের

হত্যার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা ও কোটি কোটি লোকের মুক্তির সম্ভাবনায় কি নিগূঢ় যোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা আজ বিশেষভাবে মস্তিষ্কচালনা করিয়াও সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

আজ সে পূর্ব্বের জীবনের সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিয়াও সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

আজ সে পূর্ব্বের জীবনের সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিয়া দেখিল। আগের জীবনের কলেজে-পড়া বড় আশা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ছিল। আর এসে! অন্যের পরিচালনায় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আর ধরা পড়বার ভয়ে শৃগালের মত পলায়ন। এখন সে দেশের কাজের নামে নির্ম্মম আততায়ী বই তো নয়। কয়েকটা ডাকাতির পর গভর্ণমেণ্টের কোন কিছু ক্ষতিই হয় নাই, তাহাদের শাসনের পাষাণ-প্রাচীর এখনও অটুট আছে, ঐ প্রাচীরের একখানা ইটও এ পর্য্যন্ত খসে নাই, কোন জায়গায় উহার রঙে একটুও ময়লা ধরে নাই। বিফলতারে নিদারুণ পরাভবের মধ্যে সুবিমলের মর্ম্মান্তিক ভাবে হাসি পাইল এই ভাবিয়া যে অমল কয়েকজন কলেজের ছাত্র লইয়া ডাকাতির দল গঠন করিয়া, আর কয়েকটা ডাকাতির অভিযানের আয়োজন করিয়া পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিকে ধ্বংস করিবার কল্পনা করিয়াছে।

সুবিমলের চিন্তা আজ এক নূতন পথে ধাবিত হইতেছিল। তাহার গতিবেগ মনের ভিতর সম্পূর্ণভাবে চাপিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কয়েকদিন পর ভবনাথ স্থির করিল সুরেশের প্রস্তাবে তাহার সম্মতি দেওয়া উচিত, কেন না প্রথমতঃ সুরবালাকে পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, দ্বিতীয় পরেশ নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় তাহার নামে যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে চাহিতেছেন তাহার পরিমাণও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়। পরিশেষে যে ভাবিল কুমুদিনীর সঙ্গে বিবাহ সে অন্য এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিবে ও সুরবালার ভাল-বাসার কথা ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইবে।

যখন ভবনাথ সুরেশকে বলিল, এ বিয়েতে আমার আপত্তি নেই, আর থাকতেও পারে না কেন না আপনি মত দিয়েছেন তখন সুরেশ আনন্দিত হইয়া বলিল আমি আগেই জানি তুমি মত দেবে।

পরেশ বাবু অনেক সন্ধান লইয়াও সুবিমলের খোঁজ খবর পাইলেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ে কি এখন চেপে রাখা উচিত? বিমল তো এলনা।

স্ত্রী বলিলেন. না, না, বিয়ে তুমি কিছুতেই চেপে রেখ না। না এলো বিমল। তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করে বিয়ে দিয়ে ফেল। বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি আমি।

বিবাহের কয়েকদিন আগে পরেশ সুরেশের বাড়ী গিয়া সুরেশের সাম্‌নে বিছানার উপর এক, দুই, তিন, চার করিয়া গণিয়া সত্তরখানি একশ টাকার নোট রাখিয়া বলিলেন, পেলে তো সুরেশ?

সুরেশ বলিল, কেন, আমি কি বলেছিলেম পাব না!

—না, তবে কেউ হয়ত বলে থাকতে পারে আমি অত টাকা দিতে পারবো না।

—কেন, কেউ কি তা বলে থাকে ?

—থাকে না। ও-হো-হো ? তোমরা কেবল কলেজ থেকে বেরিয়েছ ! লোক ত এখনও চেননি। বলে না ! এখনই কি বেটারা কম বলচে। আমার মেয়ের ভাল বিয়ে হতে যাচ্ছে দেখে বেটাদের সহ্য হচ্ছে না। বলছে কি বর, তাই পরেশ বাবু এত টাকা দিচ্ছেন। আরে পরেশ চৌধুরী লোক চেনে। কি যে বর তা জানি। তোরা বুঝবি কি ? তোদের মত গণ্ডায় গণ্ডায় উকিল মোক্তারকে পরেশ চৌধুরী চাঁড়িয়ে এসেছে। সে সব চেনে। যাক বাবা সুরেশ, বিয়ে লক্ষ কথার ব্যাপার, তুমি যেন লোকের কথায় কান দিওনা।

সুরেশ বলিল, না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আমি দেব না।

বিবাহের দিন সুরেশের বাড়ী হইতে পরেশের বাড়ীতে যাত্রা করিয়া আসিবার সময় প্রধান এয়ো হইয়া সুরবালা ভবনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। সুরবালা তৈলের বাটি দিয়া ভবনাথ কে বরণ করিয়া তাহার কপালে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া আগুনের টিপ বসাইয়া দিয়াছেন। ভবনাথ সুরবালাকে প্রণাম করিয়াছিল বটে—কিন্তু সুরবালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে নাই। সে একবার থাকিয়াই মুখ অবনত করিয়াছে। সেই একবার চাহিতেই তাহার সমস্ত শরীর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল, রক্ত মাথায় উঠিয়া তাহার দমবন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

বর যাত্রার সময় সুরবালা দামী বেনারসী শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিল ও ভাল ভাল গহনা গায়ে দিয়াছিল। তাহাতে তাহার রূপ খুলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে সুরবালা হাসিমিশ্রিত সরসতায়, দীপ্ত কথায় ভবনাথকে বলিয়াছি ঠাকুর পো, ও ঠাকুর পো, বলি ও ঠাকুর পো, চুপ করে আছেন যে বড় ! সুন্দরী বৌ পেয়ে কি আমাদের কথা মনে রাখবেন ? অরগ্যান বাজিয়ে গান করবে ; আর আপনি ডুবে থাকবেন।

যখন সুরবালা বিনা দ্বিধায়, অসঙ্কোচে, কথায় প্রাণের উৎস ঢালিয়া দিয়া কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল তখন ভবনাথের মনে ঝড় বহিতেছিল। তখন সে উন্মত্ত অনুভূতিতে ভাবিতেছিল চুলায় যাক্ অতীত চুলায় যাক্ বিচার বুদ্ধি, চুলায় যাক্ সমাজ। সে সুরবালাকে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে সুরেশের স্নেহাশ্রয় হইতে দূর দূরান্তরে।

উন্মত্ত মোহ তাহাকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল। সে গাড়ীতে উঠিয়া এই চরম অবস্থার মধ্যে পরেশ বাবুর বাড়ীর গিয়া উপস্থিত হইল। পরেশ বাবুর বাড়ীটা চাঁদের আলোকে দিনের মত দেখাইতেছিল। ইংরেজী ব্যাণ্ড ও ব্যাগ পাইপ সমারোহে বাজিতেছিল। বড় ধরণের একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

ভবনাথের কাছে এই সমারোহে নিছক এক ছেলে খেলার মত বোধ হইল। সে তিক্তভাবে, অসীম বিরক্তি ও ঘৃণায় ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, উঃ, কুমুদিনীর সঙ্গে সে নিজের বিবাহের মত দিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় সে পরে নিজকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া কুমুদিনীকেই ভয়ানক তিক্ততার সহিত দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বিষাক্তভাবে সে ভাবিল, ঐ স্ত্রীলোকটা না দাঁড়াইলেই তো তাহার এত বড় সর্ব্বনাশ হইত না।

বিবাহের আঙ্গিনায় পুরুষ ও মেয়েমানুষের জনতা ঠাশাঠাশি ভাবে হইয়া গিয়াছিল। সেখানে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। পরেশ নিজে একজন সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজশেখর বাবু রাজসাহীর সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তিনি পরেশের বাড়ীর কাছে থাকেন। তিনি আগন্তুক ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বিশাল জনতার সাগ্রহ দৃষ্টি ও বিবাহের রোশনাই ও বাজনার মধ্যে সাত পাকের সময় যখন পিঁড়িতে করিয়া কুমুদিনীকে উঠাইয়া ধরা হইতেছিল তখন তাহার মাথার টায়রা আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, তাহার সুডৌল ভাঁজ-পড়া গলাতে ঝুলানো সোনার হারের চুনি ও পান্না আলোতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তাহার মুখে ঝলক ফেলিয়া দিতেছিল। তাহার ডাগর চক্ষু ও চন্দন চর্চিত স্ফীত গণ্ডদেশ ওড়নার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ভবনাথ দুষ্টগ্রহের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া একবারও কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলনা। সে আগাগোড়া মুখ অবনত করিয়া রহিল। কুমুদিনী কিন্তু ওড়নার তল দিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রত্যেকবারই ভবনাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

বিবাহের গোলমালে ভবনাথের এই অস্বাভাবিক ব্যবহার কেহই লক্ষ্য করিয়া দেখিল না।

সম্প্রদানের সময় কুমুদিনীর সুডৌল হাতখানি যখন ভবনাথের হাতের উপর রাখা হইল তখন মোহাবিষ্ট কুমুদিনী ওড়নার তল দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল। ভবনাথ কিন্তু কঠিন সংকল্পে পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল, কুমুদিনীর হাতখানি একবারও চাহিয়া দেখিল না।

বিবাহের পর পরই বন্ধু বেবী বলিল, এই কুমু, এই ভাই কুমু ?

কুমুদিনী বলিল, কি ভাই ?

—মুঠোর মধ্যে রাখবি কিন্তু

—রাখবো, রাখবো, নিশ্চয়ই রাখবো।

মেয়ে সুরেশদের বাড়ীতে রওনা হইবার সময় যখন পরেশ আশৈশব ভরণ পোষণের মূল্য স্বরূপ প্রচলিত রীতি অনুসারে মেয়ের হাত হইতে ইঁদুরের মাটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন তিনি জোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি বলিলেন, মা, তোকে ত আমি

বিদেয় দিচ্ছিনে মা। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এবাড়ী তোদেরই বাড়ী মা—তোর আর বিমলের। যাবার পর আমার যা কিছু থাক্‌বে তা তোকে আর বিমলকে ভাগ করে দিয়ে যাব।

সুরেশদের বাড়ীতে কুমুদিনীর চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই পরেশ বিষম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছিলেন। সেদিন অষ্ট মঙ্গলের পর বিকালে মেয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিল সে দিন তিনি গহনা ও শাড়ী পরা মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিবাহের সময় ঝামেলায় তিনি মেয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার অবসর পান নাই। আজ বধুবেশে সজ্জিতা মেয়েকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এমন অপরূপ পরিপূর্ণ ভাব মেয়েকে তিনি আর কোনও দিনও দেখেন নাই। তাঁহার মন স্নেহের কোমলতায় দ্রব হইয়া গেল। ভাবিলেন তাঁহার জীবন স্বার্থক হইয়াছে। তিনি ঘরের চৌকির উপর গিয়া বসিলেন, মেয়েকে অসীম তৃপ্তিতে পাশে বসাইলেন, ও পরে মেয়ের মাথা বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় তুষার-শীতল শান্তিতে ভরিয়া গেল ও নিজের অজ্ঞাতে তাঁহার চোখ দিয়া অবিরলধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একদিন পরেশ বাবুর স্ত্রী পরেশ বাবুকে বলিলেন, জামাই কেমন হ'ল ?

—সবাই যখন বল্‌ছে ভাল, তখন ভাল।

—দ্যাখো একটায় কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে।

—কি ?

—সাতপাকের সময় জামাই কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে একবারও চাইল না।

—যাও, যাও, সব নাটুকে ভাব। চাইলে না। তুমি চেয়েছিলে ? আমি চেয়েছিলেম ?

—সেকাল গিয়েছে এককাল। তখন ছোট বিয়ে হ'ত। মেয়ে যে তাকিয়ে দেখলে ?

—আজকাল মেয়েরা অন্য ধরণের। তা ঠিক। কিন্তু বিয়ের সময় তো কত বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। এস-ডি-ও, রাজশেখর বাবু, মুন্সেফ চন্দ্রবাবু ছিলেন, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কে জান ? তিনটা এম-এ। তারপর আই-সি-এস্। চেহারায় তো পুরাদস্তুর সাহেব। উকিল নরেশ বাবু ছিলেন। কই, তাঁরা তো কেউ কিছু বলে না। আরও খাবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট বলে গেলেন, বেশ জামাই পেয়েছেন পরেশ বাবু। বিয়েতে আয়োজনও করেছেনও খুব। কত বড় কথা বলতো। আমি তার কাছে কি ? যাও, যাও ভেবনা। কোন ব্যাটা জামাইয়ের সাধ্যে আছে যে ঐ রকম মেয়ের গোলাম না হয়ে যায়। গোলাম হবে না ! কি ঘরে বিয়ে হয়েছে ওর। আমি কি বিয়ে দিতেম যদি মেয়ে বেঁকে না দাঁড়াতো। যাও, ভেবোনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

(৩২)

বিবাহের পরে কিছুদিন বাপের বাড়ী থাকিবার পর কুমুদিনী সুরবালাদের বাড়ীতে আসিয়াছে।

কুমুদিনী চেয়ারে বসিয়া আছে। সুরবালা কুমুদিনীর পিছনে দাঁড়াইয়া কুমুদিনীর চুল বাঁধিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিরুণী দিয়া কুমুদিনীর চুল আঁচড়াইতেছে।

সুরবালা বলিল, কিগো, কথা যে বড় বলিস্‌নে ! পছন্দ করা বর চোখে লেগেছে তো।

কুমুদিনী বলিল, কথা বলতে ইচ্ছে হয় না ভাই।

—কত কথা ত বল্‌তিস আগে। এখন বেরয় না কেন বল দেখি?

—কি করে বল্‌বো?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরবালা বলিল, আচ্ছা কমু, সত্যি করে বলতো। সত্যি বল্‌বি তো?

—কি?

—আচ্ছা আগের জীবনের সঙ্গে এ জীবনের তফাৎ কিছু দেখছিল্‌ কি?

—দেখছি বই কি।

—আচ্ছা ভাবটা কি বল দিকি।

—কি করে বল্‌বো তা আর।

—আচ্ছা ফুলশয্যার রাতে কি ঠাকুরপোই তোর সঙ্গে আগে কথা বলেছিল?

—যাঃ; তুই বড় বাজে বকিস্‌।

—আচ্ছা পর হয়ে গেলি এর মধ্যেই তুই আমার?

—পর হতে যাব কেন?

—বল্‌তে আপত্তি কি তবে?

—থাক্‌ ভাই এখন। অন্য সময়ে বলবো।

—না, এখনই বলতে হবে তোকে।

পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে প্রকাশ পাইল কুমুদিনী সে রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল অন্য কোন কথা হয় নাই।

সুরবালা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তোকে জাগিয়ে উঠায়নি ঠাকুরপো? বলিস্‌ কি?

—না।

—ঘুম এল তোর?

—আমিও তো ভাবি কি করে এল।

—ভয়ানক অন্যায় কাজ করে ফেলেছিস্। আশ্চর্য্য! ঘুম তোর কি করে এল তাই ভাবি।

—কি করা যাবে বল্। ঘুম এল।

—আমার তো সেদিন ভাই মোটেই ঘুম পায়নি।

—কথা বলেছিলি তোরা সেদিন?

—বলেছিলেম না! কোথায় দিয়ে যে রাত কেটে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি।

—কে আগে কথা বলেছিল ভাই? তুই না সুরেশ বাবু?

—আমি আগে কথা বল্‌তে যাব কেন?

—কি কথা হয়েছিল ভাই?

—দূর! সে কথা কি মনে আছে ছাই! পাগল হয়েছিলেম সে রাতে দুজনেই।

নীরব আগ্রহে কুমুদিনী কথাগুলি সবই শুনিল। প্রত্যেকটি কথা তাহাকে শূল-বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে-ও তো মনে করিয়াছিল স্বামীকে আদর দিয়া কথা বলিয়া সেই মধুর যামিনী সে কাটাইয়া দিবে। সে-ও ভাবিয়াছিল সে রাত্রিতে তাহাদের কথা ফুরাইবে না, কিন্তু সাংঘাতিক স্বামী একটা রা—ও মুখ দিয়া বাহির করে নাই। সে সারারাত্রি অসম্ভব ভাবে বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল।

সুরবালার কথা শুনিয়া কুমুদিনী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুরবালা বুঝিল, কুমুদিনীর হৃদয়ে কিসে যেন ভয়ানক ব্যথা লাগিয়াছে। বলিল, ভাই কুমু, কষ্ট পেলি ভাই?

কুমুদিনী হাল ছাড়িয়া দেওয়ার ভাবে বলিল, কষ্ট কেন পাব ভাই?

—তবে দীর্ঘশ্বাস ফেললি কেন ভাই?

কুমুদিনী নীরব রহিল।

সুরবালা আগ্রহের স্বরে বলিল, বাস্তবিকই কি ঠাকুরপো তোর সঙ্গে সেদিন একটা কথাও বলেনি ?

কুমুদিনীর বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতে চাহিল। বলিল, যাক্ ভাই অন্য কথা বল।

—না, বল্‌তেই হবে তোকে। বলেনি একটা কথাও ?

—না।

এই কথা বলিবার পর আর কুমুদিনী নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

প্রবল সহানুভূতিতে সুরবালা গলিয়া গেল। নারী জীবনের যা কিছু পবিত্র, যা কিছু সুন্দর, উহা এই সহানুভূতির স্পর্শে সুরবালার হৃদয়ে ফুট হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ কুমুদিনীর মুখটা পিছন হইতে বাহুবেষ্টিত করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, দুঃখ করিস্‌নে ভাই। অনেকে জায় ফুলশয্যার রাতে কথা বলে না। দ্যাখতো মুখখানা কি তোর! তোর মুখ দেখে আমারই চুমো খেতে ইচ্ছে হচ্চে, ঠাকুরপো তো কোন ছার!

এই বলিয়া সুরবালা কুমুদিনীর গালে ক্ষিপ্রভাবে চুম্বন করিল।

নূতন ভাবে সহসা কুমুদিনীর মুখ লাল হইয়া গেল। সে সমস্ত জড়তা ও বিষাদ নিমেষের মধ্যে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, যাঃ, বড় ফাজিল তুই, বড় নোংরা।

সুরবালা রসায়িত হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, রাগ করলে কেন চল্‌বে ভাই ? তখন দেখিস্ সুরবালা কি বলেছিল। তখন তো ঠাকুরপোর কথা মুখে ধরবে না।

সুরবালার কথায় কুমুদিনীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

পরে খোঁপা বাঁধা শেষ হইলে সুরবালা নিজের হাতের তালু দিয়া

কুমুদিনীর মাথায় একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়া রসান্বিত ভাবে বলিল, কি চেহারা হয়েছে তোর স্থাখতো। প্রণাম কর গিয়ে ঠাকুরপোকে এখনই। এ চেহারা দেখলে শিবেরও তপস্যা ভেঙ্গে যাবে।

কুমুদিনীর সমস্ত বিষাদ কাটিয়া গেল। সে ক্ষিপ্রভাবে চেয়ারের উপর ফিরিয়া বসিয়া সুরবালার গালে ছোট্ট একটা চড় বসাইয়া দিল। গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিল, তপস্যা ভঙ্গ এতই সোজা! ভারি কথা বলেছিস্।

সুরবালা 'উঃ' কথাটা দীর্ঘান্বিতভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

(৩৩)

এত আশার পর পরিশেষে মোকদ্দমায় হারিয়া গেলেন মোহিনীই। সুশীলার নিয়মিত সত্য নারায়ণের পূজা বৃথা হইল। মোহিনীর [illegible]লপের ইচ্ছায় চন্দ্রকান্তের রোজ শালগ্রাম শিলার মাথায় এক কুশী করিয়া জল দেওয়াও নিস্ফল হইয়া গেল।

আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল জগদীশের শালা নিজের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারাই নিলামে সম্পত্তির এক অংশ কিনিয়া লইয়াছে। জগদীশের স্ত্রী স্ত্রীধনের দ্বারাই অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করিয়াছে।

মোহিনী মোকদ্দমার এই আশাতীত পরাজয়ে আদালতেই ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম করিলেন।

রায় প্রকাশিত হইবার পর মোহিনী আদালতের দোতলা সিঁড়ি দিয়া টানিতে টানিতে নামিয়া আসিয়া আদালতের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিলেন অদূরে গাছতলায় হরিহর পণ্ডিত তাঁহার দেহযন্ত্র সটান রাখিয়া হৃষ্ট মনে একটানাভাবে বিড়ি টানিয়া যাইতেছেন ও মোহিনীর দিকে আড় চোখে চাহিতেছেন।

নিজেকে কোন প্রকারে সামলাইয়া মোহিনী দূরে এক নির্জ্জন গাছের তলায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার কি হইল; সুশীলাকে বাড়ী গিয়া কি বলিবেন? ভাবিলেন এত বড় আঘাত সুশীলা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না।

মোহিনী ভাবিয়াই চলিলেন। মাঝে মাঝে ছোটস্বরে তিনি ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন হাতের দুই তালুতে মুখ ঢাকিয়া। চোখের জলে তালু ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দুপুরে রায় প্রকাশ পাইয়াছিল, এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছি। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। অস্তমিত সূর্য্যের লালরশ্মি তখন গাছের মাথায় ছিনি মিনি খেলিতেছিল।

পরে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া ঘন আঁধারে পরিণত হইবার উপক্রম করিল।

মোহিনী কাঁদিয়াই চলিলেন।

বেলা দশটার সময় আশা ও নিরাশার মধ্যে নিদারুণভাবে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তিনি আদালতে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই এই ভাগ্যবিপর্য্যয়। যে উকিল কথার মার প্যাঁচে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার বাড়ীতে আর ফিরিলেন না। পরিশেষে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে নিজের জীবনের দুর্ব্বহ বোঝা মহাদুঃখে টানিয়া লইতে লইতে তিনি ধীরে ধীরে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুই মাইল দূরে রেল ষ্টেশন। এই পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে বসিতে হইল। বসিয়া একবার তিনি হৃদয়ের নিদারুণ ব্যথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাবা গো!

অন্ধকারে পথিক ট্রেন ধরিবার আশায় দলে দলে ছায়ামূর্ত্তির মত ছুটিয়া চলিতেছিল। তাঁহার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া পেবজন ক্ষনিকের

জন্তু চমকিয়া দাঁড়াইয়াই চলিয়া গেল। তাহাকে অস্পষ্টভাবে বলিতে শোনা গেল, ভিখিরি বোধ হয়।

হঠাৎ হুহু করিয়া জোরে মোহিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই কান্না দেখিবার ও শুনিবার জন্য সেই জনশূন্য রাজপথে কোন লোক ছিল না। পরে দুঃখের বেগ কথঞ্চিৎ কমিয়া গেলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পুনরায় ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ষ্টেশনের টিউব ওয়েলে তিনি প্রাণ ভরিয়া জল খাইলেন।

শেষ রাত্রিতে বাড়ীতে পৌঁছাইবার পরই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল।

বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন আগের দিন বিকালে জগদীশ চোরের মত তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মূল্যবান কয়েকখানা বাসন লইয়া গিয়াছে। ঐ চোরকে শৈল দূর হইতে দেখিয়াছে। সুশীলা দেখেন নাই।

সকাল বেলা জগদীশ জোরে জোরে মোহিনীর পরিবারকে শুনাইয়া শুনাইয়া মোহিনীর নিন্দা করিতেছিল। প্রবল জ্বরের অবস্থায়ই ভাইয়ের আঘাত মোহিনীর হৃদয়ে গিয়া বিষম ভাবে বাজিল। জ্বরের অবস্থায়ই উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু কাঁপিতে কাঁপিতে উঠাই তাঁহার সার হইল, কথা আর বলা হইল না। সমস্ত কথা কণ্ঠে রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতেই ধড়াস্ করিয়া মাটিতে ফিট হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান আর তাঁহার ফিরিয়া আসিল না।

সংবাদ পাইয়া জগৎ ডাক্তার ছুটিয়া আসিলে।

ভয়ানক রোগের যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্ত অবস্থায়ই মোহিনী কাতরাইতে লাগিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, প্রবল একটা সক্ পাইয়া মোহিনীর মস্তিষ্কের একটা রক্তের নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়া মস্তিস্কে ভয়ানক ভাবে রক্ত জমিয়া গিয়াছে।

সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া কঠিন রোগের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিলেন মোহিনী। পরিশেষে মাঝ রাত্রিতে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্রই গ্রামের লোক প্রবল সহানুভূতিতে মোহিনীর বাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চন্দ্রকান্ত রোগের অবস্থায়ই আসিয়াছিলেন।

মোহিনীর শব যখন উঠানে নামানো হইল তখন সুশীলা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের সুরে মহা বিপর্য্যয়ে প্রাণান্তিক দুর্দ্দশায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, জেঠা মশায়, কি যে সর্ব্বনাশ হ'ল যে আমার জেঠা মশায়। ওগো আমার কি হল গো! ওঃ আমরা যাব কোথায় গো! আমি না ওঁর মুখের দিকে চেয়েই বুক বেঁধেছিলেম জেঠামশায়! ওঃ, ও-হো-হো! আমার কি হ'ল গো! আমাদের যে দাঁড়ানোর স্থানটুকুও রইল না জেঠা মশায়!

শৈল ঘরের ভিতর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া আছারি বিছারি করিয়া কাঁদিতেছিল।

চন্দ্রকান্তের চোখ দিয়াও অবিরলধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পরে প্রবল সংযমে আত্মসংযম করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, মা, মা, মা।

কিছুক্ষণ পরে তিনি সুশীলাকে লক্ষ্য করিয়া জোরে জোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কাঁদ মা, কাঁদ—, জোরে জোরে যত পারিস্ কাঁদ মা। দুঃখ ক্ষয় হয়ে যাক্। ভগবানকে ডাক মা। জোরে জোরে প্রাণ দিয়ে ডাক। এইতো ডাকবার সময় মা। তাঁর করুণায় অভিষিক্ত হয়ে তোর দুঃখ ক্ষয় হয়ে যাবে মা। তারা, তারা, তারা! করলি কি মা তুই! ওঃ, কি ভয়ানক! মা, কাঁদ মা, যত পারিস্ কাঁদ। ভাবিস্‌নে। তোর এ বুড়ো ছেলে বেঁচে থাক্‌তে এক মুঠো অন্নের জন্য তোকে ভাবতে হবে না মা।

জগদীশকে চন্দ্রকান্ত শবদাহের জন্য শ্মশানে যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। জগদীশ আসিল না।

শঙ্কর কয়েকদিন হইল বাড়ী আসিয়াছে। সুবিমলও সঙ্গে আসিয়াছে। শঙ্কর কলেজ ছাড়ে নাই, কেননা সে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে পরিচিত হয় নাই। হঠাৎ সুবিমলের সঙ্গে তাঁহার সৈদপুর ষ্টেশনে দেখা হয়। সে সুবিমলকে হরিপুরে আসিতে অনুরোধ করে। সুবিমলও স্বীকার করে এই কারণে যে কয়েকটা ডাকাতির পরে তাহার সহরে থাকা আদৌ নিরাপদ নহে।

চন্দ্রকান্ত মোহিনীর শবদাহের জন্য শঙ্করকে সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শঙ্কর সুবিমলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল।

সুবিমল জানিত না মোহিনীর বাড়ী কোন গ্রামে। সে জানে নাই কাহার মৃতদেহ পোড়াইবার জন্য তাহার ডাক পড়িয়াছে। শঙ্কর তাহাকে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলে নাই।

উঠানে মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকা ছিল। সুবিমলেরা উহা উঠাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সহসা লণ্ঠনের ম্লান আলোকে আশ্চর্য্য দৈব প্রকাশের মত এই

সাংঘাতিক দুর্দ্দশার মধ্যেও সুবিমল সুশীলার নজরে পড়িল। সুশীলাও সুবিমলের নজরে পড়িয়া গেলেন।

সুবিমল অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সুবিমলকে দেখিয়াই সুশীলার শোকের উচ্ছ্বাস আবার নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। দেখিয়াই তিনি জোরে জোরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, এঁ্যা বিমল! বিমল এসেছিস্! এসেছিস্ তুই সোনার ধন! ও শৈল, এসে ত্যাখ তোর বিমল দা এসেছে রে।

মায়ের কথাগুলি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শৈল বাহির হইয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেও কতকটা সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই সে সুবিমলকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কিছুদিন হইল সুবিমল লোমহর্ষণ ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া জীবন কাটাইয়া আসিতেছিল। এ পর্য্যন্ত সে ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। আজ কিন্তু অতি দুঃস্থ, সহর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত, পাড়াগাঁয়ের এক কদর্য্য বাড়ীতে অবস্থিত সুরুচিসম্পন্ন সুশীলা মাসিমা ও তাঁহার কন্যার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। নীরবেই তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুবিন্দু একের পর আর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নামাবলীর নীচে মৃত মোহিনী হাড়ে মাত্র অবশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই হরিনামাঙ্কিত ঢাকনির তল দিয়া মোহিনীর হাড়ে-অবশিষ্ট শুকনা ঠাণ্ডা পা ও হাতের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। মোহিনীর কাঠের মত শক্ত সরু সরু দুই হাঁটু নামাবলী ঠেলিয়া উঠিয়াছিল।

সুবিমলকেই প্রথমে মৃতদেহ ধরিতে হইয়াছিল। নামাবলী সরাইলে যখন মোহিনীর মুখ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল তখন সে দেখিল মোহিনীর মুখ

ক্লেদে অসাধারণভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার সাম্‌নের দাঁত দুটী বিকট ভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মুখ দেখিয়া সুবিমল আঁৎকাইয়া উঠিল। এরূপ চেহারার মৃতদেহ সে আগে কোনও দিন দেখে নাই।

যখন মৃতদেহ ঘাড়ে করিয়া গ্রামের কীর্ত্তনের দল দ্বারা অনুসৃত হইয়া সুবিমলেরা ভারাক্রান্ত মন লইয়া শ্মশানের দিকে চলিতেছিল, তখন সাম্‌নের দূর আকাশে কালো কালো খণ্ড খণ্ড মেঘের ফালির আড়ালে আড়ালে উঠন্ত সূর্য্যের রশ্মি মলিন বিচ্ছিন্ন রেখাকারে দেখা যাইতেছিল ও নিদ্রিত হিমসিক্ত প্রভাতের ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়া তাহাদের শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

মরা-পোড়ানো শেষ হইলে শ্মশানের রুক্ষতার মধ্যে কর্কশ সুরে যখন সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল তখন আকাশ বাতাস যেন এক উদাস ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শ্মশানের শিমুল গাছের উপর বসিয়া সেই সময়ে একটা চিল একটানা সুরে থামিয়া থামিয়া ডাকিয়া চলিতেছিল। অপর একটা শিমুল গাছে মরা-খেকো তীক্ষ্ম চক্ষু শকুনি বাসায় বসিয়া শাঁ শাঁ শব্দ করিতেছিল। সেই সময়ে এলোমেলো হাওয়াও বহিয়া যাইতেছিল। সেই চিল ও শকুনির ডাক ও বিশৃঙ্খল হাওয়াতে সেই উদাস ভাবটা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।

ফিরিবার পথে শ্মশান-বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল, ওঃ, ওদের কি যে হবে ভেবে পাইনে। মেয়েটার বিয়ে হয়নি। দেখবার ওদের কেউ নেই। ওঃ, কি যে হবে!

অপর একজন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, তাইতো!

শবদাহ শেষ হইয়া গেলে জমিদার রমেশ বাবুর স্ত্রী ক্রন্দনশীল সুশীলাকে প্রায় আছড়াইয়া পড়ার অবস্থায় ধরিয়া নদীর ঘাটে লইয়া

গেলেন। সুশীলার কান্না বাঁশ বাগান ও আম বাগানের হাওয়াকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া ওপারের বাড়ীগুলিতে গিয়া পৌঁছিতেছিল।

জ্ঞানদা দাসীর বাড়ীতে দাসীর যুবতি মেয়ে বলিল, দেখছিস্ মা, সুশীলা মা ঠাকরুণ কেমন করে কান্‌ছেন্।

দাসী বলিল, ও আর বলিস্ নে মা। ওঃ!

নদীর ঘাটে রমেশ বাবুর স্ত্রী সুশীলার হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া কপালের সিন্দুর মুছিয়া দিলেন ও স্নানের পরে তাঁহাকে সাদা কাপড় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিধবার বেশে সাজাইয়া দিলেন। যে সব মেয়েরা ঘাটে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিষম দুঃখে মুখ অবনত করিলেন ও 'ওঃ' কথাটা অস্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে পরণের কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

(৩৪)

পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া প্রবল সংকল্পে কুমুদিনী নিজের বর পছন্দ করিয়াছিল। তাহার সমস্ত আশা নিষ্ফল হইতে চলিল।

ফুলশয্যার দিন স্বামী বালিশের উপর শুম হইয়া পড়িয়া থাকায় কুমুদিনীর হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সুরবালাকে সে বলিয়াছিল ঘুমাইয়া পড়ার জন্য স্বামীর সঙ্গে তাহার কোন কথা হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। পড়াও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রাত্রিশেষে প্রভাতে অসীম উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তিতে সে তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই অবস্থায় ভবনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছিল। নিজে উঠিবার সময় দুঃসহ বেদনায় কুমুদিনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ব্যাপার এমনি যে কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় ছিল না।

এবার পূজার সময় ভবনাথ কয়েক দিনের জন্য রাজসাহীতে আসিয়াছিল। কুমুদিনীও সুরবালাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। আসিয়াই সে বুঝিয়াছে ভবনাথ তাহাকে ভালবাসে না। নীরবে কুমুদিনীর হৃদয়টা ছুমরাইয়া ছুমরাইয়া অসার হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ভবনাথের পক্ষ হইতে কোন কথা উপস্থিত না হওয়ায় কুমুদিনী গায়ে পড়িয়া কোন কথা বলিবার চেষ্টা করে নাই। নীরবে সে হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া দিয়া সব সহ্য করিয়া গিয়াছে।

পরের রাত্রিতে ভবনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। কুমুদিনী মনে মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্থির করিল যে স্বামীর সঙ্গে আজ একটা বুঝা-পড়া করিতে হইবে; যে ব্যাপারের উপর নিজের জীবন-মরণ নির্ভর করে সেই ব্যাপারে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। সুতরাং আজ রাত্রিতে স্বামীর শয্যায় শুইয়া সমস্ত অভিমান ও সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে গায়ে পড়িয়া আগেই কথা বলিল। বলিল, আপনি কালই কলিকাতায় যাবেন?

কথাটা দাঁড়াইয়া গেল একেবারেই সংক্ষিপ্ত কাটা-ছাঁটা ধরণের। ভবনাথের কয়েকদিনের ব্যবহারে কুমুদিনীর ভাবের উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কথা এখন তাহার মুখ দিয়া ভালভাবে বাহির হইতে চাহিল না।

কথাটা নীরস হইলেও নব বধুর মুখ হইতে এই প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ। ঐ হিসাবে ভবনাথের কাছে কথাটার বিলক্ষণ গুরুত্ব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু ভবনাথ এই গুরুত্ব স্বীকার করিয়া না লইয়া নিষ্ঠুর অভদ্রভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ, কেন?

এই হৃদয়হীন উত্তরে কুমুদিনী মুষড়িয়া গেল। যে সংকল্পের পাহাড় সে এতক্ষণ বহুযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ধ্বসিয়া পড়িল। আর সে

কথা বলিতে পারিল না। সারারাত্রি ধরিয়া হাহাকারে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে চোখের জলের মধ্যেই সে সংকল্প করিল, যে তাহাকে এমনভাবে আহত করিল, যে তাহাকে অমানুষের মত তুচ্ছতার আঘাতে এমনভাবে নীচে নামাইয়া দিল, তাহার নাম সে কোনও দিনও করিবে না।

পরদিন সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, কথা হয়েছে ভাই ?

কুমুদিনী হাসির ভান করিয়া বলিল, হয়েছে।

—কি কথা হয়েছে ভাই ?

—তা কি মনে আছে।

সুরবালা অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন কিছু বাহির করিতে পারিল না। পরিশেষে সে হাল ছাড়িয়া দিল।

কুমুদিনী ভাবিল সে নিজের আগুনে নিজেই জলিয়া পুড়িয়া মরিবে, অন্যকে উহা জানিতে দিবে না।

(৩৫)

কয়েকমাস চলিয়া গিয়াছে। কুমুদিনী বাপের বাড়ীতে আছে। সুশীলা ও শৈল চন্দ্রকান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

চেষ্টা করিয়াও পরেশ সুবিমলের কোন খোঁজ পান নাই।

মোহিনীর শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়া সুবিমলের মনে ভয়ানক ঘা লাগিয়াছে। এখন সে পিতামাতার কথা প্রায়ই ভাবে ও নিজের বর্ত্তমান জীবনের নিষ্ঠুরতা ও শূন্যতার কথা ভাবিয়া নিজকে ধিক্কার দেয়।

এইরূপ অবস্থায় একদিন নির্দ্দেশ আসিল তাহাকে এক বিবাহের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যাইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে

সে হাফ্‌প্যাণ্ট ও সর্ট পড়িয়া রীতিমত মিলিটারি হইয়া উঠিল ও পরে পকেটে শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চ ও রিভলবার পূরিল।

ঘটনার সময় গুলি চালানো শেষ হইলে অমল ও সুবিমল একটা ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল একজন যুবতী উপর হইয়া মেঝেতে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। উভয়েই ধারণা করিল হঠাৎ গুলি লাগিয়া মেয়েটীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অমল বলিল, নরেন ?

সুবিমলের নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

সুবিমল উত্তর করিল, আজ্ঞে ?

—তোমাকেই এই মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—কি ব্যবস্থা ?

—একে পদ্মায় ফেলে দিতে হবে।

—সে যে অনেক দূরে।

—এক মাইল।

উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। পরে সুবিমল বলিল, কি করে নিয়ে যাব ?

—ঘাড়ে করে।

—ঘাড়ে করে !

—হাঁ, ঘাড়ে করে।

—অসম্ভব।

—অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।

সুবিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, পারবো না।

সুবিমল এই প্রথমে অমলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

অমল ভয়ানক উগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, চুপ কর, পারতে হবে।

এরূপ উগ্রভাব সুবিমল অমলের ভিতর আগে কোনও দিন দেখে নাই

অমল জবরদস্তী করিয়া সুবিমলকে নীরব করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সুবিমল নীরব হইল না বরং ঘা খাইয়া তাহার মন অসাধারণ-ভাবে দৃঢ় হইয়া উঠিল। বলিল, পারবো না।

—কেন ?

—পারবো না। এর কোন কেন নেই।

—বটে !

এই বলিয়া অমল পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই রিভলভার ধরিয়া প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবিমল নিজের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল।

উত্তেজিতভাবে অমল বলিল, বিমল ?

—বলুন।

—এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।

—কিছুতেই আমি একাজ করতে পারবো না।

—তবে তোমাকে আমি এখনই হত্যা করবো।

সুবিমল উত্তেজনা দমন করিতে না পারিয়া বাঘের মত লাফ দিয়া অগ্রসর হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে অমলের হাত চাপিয়া ধরিল। সেই চাপে অমলের হাত ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরে রিভলভার অমলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া সুবিমল ভয়ানক উত্তেজনায় বলিয়া উঠিল, আমিও আপনাকে তবে হত্যা করবো।

কিন্তু উত্তেজনা সত্ত্বেও কেহ কাহাকেও গুলি করিল না। উভয়ে

উভয়ের দিকে চোখ ছুটিয়া যাওয়ার অবস্থায় চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ।

সুবিমলের আক্রমণে বলিষ্ঠ অমল মোটেই দমিল না। সে স্থির অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক প্রবল সংকল্পে তাহার বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইয়া গেল। পরে চোখের দৃষ্টি সংযত করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, ছাড়, পাগলামী করো না।

সুবিমল হাত ছাড়িয়া দিল।

ইহার পর অমল রিভলভার নীচু করিয়া ধরিয়া কিছুকাল ঘরের ভিতর খাঁচায় বদ্ধ দুর্দ্দান্ত বাঘের মত সবেগে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। পরিশেষে মন একটু শান্ত হইলে সে ফিরিয়া আসিয়া সুবিমলের সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের সুরে বলিল, শোন নরেন, শুধু একটা খেয়ালের জন্য তুমি এই কাজটা করতে আপত্তি করছ। দলে যে আর কেউ নেই যে ঐ মরাটা ঘাড়ে করে একলা অতদূরের পথে যেতে পারে। ভেবে দেখেছ ব্যাপারটা কি ঘটে গেল? কেউ কি ভেবেছ আমাদের ক্ষমা করবে? ভেবে দেখেছ কি?

সুবিমল গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, দেখেছি।

—বুঝেছি, আপত্তি তোমার মরা ঘাড়ে করে নেওয়া, যা কেউ বড় একটা করে না।

—তা ভাবলে কি নিতান্ত অন্যায় করা হবে?

—অন্যায় করা হবে না ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন এখানে। এখানে তর্ক চলে না।

কেহ কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। পরে অমল বলিল, ভেবে দেখলে?

—দেখলেম।

—তবে কি করবে ?

সুবিমল চুপ করিয়া রহিল।

অমল বলিল, রাজি হলে তবে ?

সুবিমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, হলেম।

—শুধু হলেম বল্‌লেই চলবে না। কাজটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। নৈলে পুলিশ এসে পড়বে।

—পুলিশ এসে পড়বে ?

—হাঁ

সুবিমল বলিল, যাই বলুন দাদা ডাকাতি দ্বারা দেশের কোন কাজই হবে না।

অমল গম্ভীর ভাবে বলিল, হবে না।

পরে কিছুক্ষণ থামিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিল, হয়ত কাজ আর চল্‌বে না। আজই হয়ত এর শেষ।

—আপনিও এই কথা বল্‌ছেন ?

—হাঁ।

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে সুবিমল জোরে বলিয়া উঠিল, তবে ভুলিয়ে কেন আমাদের এই পথে টেনে এনেছিলেন ?

অমল উত্তেজিত হইল না। কথায় রীতিমত জোর দিয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল, থামো, উচ্ছ্বাসের জায়গা এ নয়। ভুলিয়ে কাউকে আমরা আনিনি। সত্য বলে জেনেই আমরা একাজে নেমেছিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছি উদ্দেশ্যের তুলনায় আয়োজন করা হয়েছে নিতান্তই অপ্রচুর। লোকে অতীতের বোঝা বুকে করে ঘুমুচ্ছে। পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্ম বলে পাগল হতেম। এখন দেখছি সাতশ বছর পরাধীনতার ফলে ধর্ম্ম গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য রুগ্ন মতবাদের শিকর বিস্তার করে। ওতে

মানুষের কর্ম্মশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে একদম। মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মকে ভেঙ্গে দিয়ে একধর্ম্ম সৃষ্টি করতে হবে। কেউ কি ভাবে তা? সময় এখনও আসেনি নরেন। এমন সময় আস্‌বে যখন সবাইকে বাধ্য হয়ে ভাবতে হবে এই সব নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। তখন অতীতকে লোকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখবে, শুধু মাত্র উন্মত্ত অন্ধ বিশ্বাসে পাগল হয়ে মরিচিকার পেছনে ছুটবে না। তখন ছোট বড়র সঙ্গে বুঝাপড়া করবে। তখন ছোট দাবী করে বস্‌বে বড়র সঙ্গে সমান অধিকার শিক্ষা ও স্বাচ্ছান্দের দিকে। তখন বিভিন্ন স্বার্থের ভেতর বিপ্লব-সংঘর্ষ বেধে যাবে ও ফলে এমন রক্তস্রোত বয়ে যাবে যার কথা আমরা কেউ ধারণাও করতে পারিনে। সেই ভয়ানক অবস্থার ধাক্কায় সমস্ত পুরাতন ভেঙ্গে পড়বে ও জীবন্ত নূতনের কায়েমী প্রতিষ্ঠা ঘটে যাবে।

—আমাদের কি হবে?

—কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাক্‌বো, পরে আকাশ পরিষ্কার হ'লে আবার নূতন উদ্যমে কাজে লেগে যাব।

সুবিমল ভাবিতে লাগিল।

অমল বলিল, ভয় পেওনা নরেন কিছুতেই। জীবনে পিছিয়ে যেওনা। মেঘ চির দিন থাকে না। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি আমাদের একটা কিছু বড় ভাল কাজ করে যেতেই হবে।

অমল কথাটা প্রাণের সমস্ত সরলতার জোর দিয়া বলিয়াছিল সুতরাং কথায় জোরের প্রেরণা ছিল। সেই প্রেরণার প্রাণস্পর্শ সুবিমলের অন্তরে তৎক্ষণাৎ কাজ করিল। সে প্রবলভাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

অমল বলিল, যাক্ বক্তৃতের জায়গা এ নয়। অনেক বক্তৃতে করা হয়েছে। এখন কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল।

মনের রীতিমত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সুবিমল মেয়েটিকে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছিল। সেই সময়ে মেয়েটিকে চিনিবার জন্য তাহার চেষ্টা করিবার অবসর ছিল না।

নদীর তীরে পৌছিবার পথে তাহার উৎসাহ একেবারে নিভিয়া গেল। নদীতীরে পৌছিয়া অসীম ক্লান্তিতে মৃতদেহটা নামাইয়া রাখিয়া সে একটু জিরাইবার জন্য বসিয়া পড়িল।

তখন ঘন আঁধারে চৈত্রের উচ্ছৃঙ্খল বাতাস বহিতেছিল। সেই হুতাশকরা চৈত্রের বাতাস বালির চরের ছোট ছোট ঝাউগাছে প্রতিহত হইয়া শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছিল।

এই সময়ে সুবিমল নিজকে ভয়ানক দুর্ব্বল মনে করিল। সে ভাবিতে লাগিল।

একবার তাহার মনে হইল যে সে মৃত রমণীর দিকে একবার চাহিয়া দেখে। কিন্তু ভাবিয়াই চলিল সে। দেখা আর হইল না।

পরিশেষে অসীম ক্লান্তিতে নিজের দেহটা টানিয়া উঠাইয়া সে দাঁড়াইল। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখিবার ক্ষীণ কৌতুহলে সে টর্চটা টিপিয়া ধরিল।

দেখিয়াই সে আঁৎকাইয়া উঠিল।

ভাবিল, সে তো ভুল করে নাই!

নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সন্তর্পণে কয়েক পা অগ্রসর হইল সে। টর্চের আলো মেয়ের মুখের ফেলিয়া দিয়া সে একাগ্রভাবে চাহিয়া রহিল।

দেখিল সে ভুল করে নাই, কুঁড়িতে আঁটা আধেক-ফোটা গোলাপের মত মুখখানি আকাশের দিকে রাখিয়া শৈল সেই বালির শয্যায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে।

সুবিমলের নিকট জল, স্থল, আকাশ, বাতাস সব একাকার হইয়া

গেল। সে বুঝিতে পারিল না, কে সে, কোথায়ই বা সে আসিয়া পড়িয়াছে।

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট অবস্থায় থাকিবার পর যখন সে চেতনা পাইল তখন সে আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল।

'তবে কি শৈল বাঁচিয়া আছে?' এই কথাটা রুদ্ধশ্বাসে ছোটস্বরে বলিতে বলিতে সে একেবারে শৈলর কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। একাগ্র ভাবে শৈলর নাকের কাছে হাত লইয়া গিয়া বুঝিল নিঃশ্বাস নিয়মিতভাবে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। বুকটা অতি ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হইয়া যাইতেছে।

যখন সে বুঝিতে পারিল শৈল সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছে তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, উঃ বাঁচলেম! উঃ!

এখন সুবিমলের উপর এক বড় দায়িত্বের বোঝা আসিয়া চাপিয়া পড়িল। শৈলর চৈতন্য হওয়া চাই। টর্চ্চ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল শরীরের কোন জায়গায় গুলি লাগে নাই।

এখন সে নদী হইতে রুমালে করিয়া জল আনিয়া সেই জল শৈলর মুখে চোখে ছিটাইয়া দিতে লাগিল। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

পরিশেষে অনেক চেষ্টার পর শৈল চোখ মেলিয়া চাহিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, আমি কোথায়?

সুবিমল উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না।

আবার ক্ষীণস্বরে শৈল প্রশ্ন করিল, আমি কোথায়?

সুবিমল উত্তর করিল, তোমার কোন ভয় নেই শৈল।

শৈল নির্ভয়ে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে?

—আমি সুবিমল শৈল। একটু ঘুমোও।

শৈল চোখ বুঁজিল, আর কথা কহিল না। সুবিমল টর্চ্চের বাতি নিভাইয়া দিয়া—আঁধারেই শৈলর পাশে বসিয়া রহিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে শৈল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

এমন সময়ে জ্যোৎস্না উঠিতেছিল। বাতাস পড়িয়া গিয়াছিল। পাখীরা গাছে গাছে কলরব করিতেছিল। দশমী তিথি। ভোর হইবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে।

সুবিমল বলিল, শৈল?

—আজ্ঞে

—আমায় চিনতে পেরেছিস্?

—পেরেছি।

—বুঝতে পেরেছিস্ কি করে এখানে এলি?

শৈল কোন উত্তর করিল না।

—আমায় দেখে কি ঘৃণা হচ্ছে?

শৈল কোন উত্তর করিল না।

—আমি যে ডাকাত।

শৈল নীরব রহিল।

সুবিমল বলিল, আমি ডাকাত। এখানে বসে থাকলে ধরা পড়বো।

শৈল পূর্ব্ববৎ নীরব রহিল।

সুবিমল বলিল, জ্যোৎস্না উঠছে এখন সাহস করে কি যেতে পারবি নে তুই সে বাড়ীতে?

শৈল এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, চিনিনে তো আমি।

—না হয় সকাল হলে ফিরে যাস্।

শৈল নির্ব্বাক রহিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নিজে নিজেই উচ্চারণ করিল সুবিমল, আশ্রম আছে ছ' ক্রোশ দূরে।

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, ঘোড়ায় চড়তে পারবি আমি যদি তোকে ধরে রাখি ?

শৈল কোন উত্তর করিল না।

কথাটা সুবিমলের নিজের নিকটই বেখাপ্পা বলিয়া বোধ হইল। ভাবিল, মেয়ে হইয়া কি করিয়া ঘোড়ায় চড়িবে শৈল ?

পরক্ষণেই সে মরিয়া হইয়া উঠিয়া ভাবিল, সে ডাকাত, জীবন মরণের ধার ধারে না। তাহার আবার দয়া মায়া কি ? যদি শৈল মরিত তবে তো তাহাকে এত ভাবিতে হইত না। শৈলর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে।

সুবিমল সংকল্প স্থির করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, এখানে তোকে ফেলে রেখে যাওয়াই ঠিক। ডাকাতের আবার দয়া মায়া কি ?

আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় শৈলর সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সুবিমলের পা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃসহায়ের কাতর কণ্ঠে আত্মসমর্পণের ভাবে সে বলিল, না, আপনি যেতে পারবেন না। না, না, আমায় ফেলে রেখে যেতে পারবেন না কিছুতেই।

জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিঝুম নিস্তব্ধ জনশূন্য নদীতটে ধূলি-লুণ্ঠিত পরিচিত অসহায় রমণীর এই আবেদন। সুবিমল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরিশেষে সুর নরম করিয়া অনুনয়ের ভাবে বলিল, ঘোড়ায় চড়তে পারবিনে শৈল, যদি আমি ধরে রাখি ? পারবিনে ?

শৈল চুপ করিয়া রহিল।

সুবিমল এবার কাতর মিনতির সুরে বলিল, আর যে কোন উপায় নেই শৈল। দেরী করাও চলে না। পুলিশ এসে পড়ল-যে! চড়তে

পারবি নে যদি আমি ধরে রাখি? পারবি নে? কোন কষ্ট হবে না তোর শৈল? পারবি নে?

শৈল কমনীয় কণ্ঠে বলিল, পারবো।

অবশেষে একটা উপায় আবিষ্কৃত হইল দেখিয়া সুবিমল হৃষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটা ঘোড়া চুরি করিল ও উহার পিঠে গদি আঁটিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিবার পথে সে দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল একজন দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ডাকাতির বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। যখন তাহারা সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শেষ রাত্রিতে একটা শুক্‌না নালার খাত হইতে উপরে সমতলক্ষেত্রে উঠিতেছিল তখন তাহাদিগকে গাছপালার পরিপ্রেক্ষিতায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

শৈলকে ঘোড়ায় উঠাইয়া দিতে সুবিমলের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। সুবিমল একটু সাহায্য করিল মাত্র। ভাব দেখিয়া বুঝা গেল না শৈল এতক্ষণ মুর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

পরিশেষে সুবিমল নিজে লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া শৈলর পিছনে ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল ও এক হাতে লাগাম ও অন্য হাতে শৈলকে ধরিয়া সে ঘোড়ায় চাবুক কষিল। অদ্ভুত এই দুই আরোহীকে পিঠে করিয়া পদ্মার ধূসর বালির উপর দিয়া শেষরাত্রির নিদ্রিত গাছপালার পরিবেশের মধ্য দিয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিল।

(৩৬)

বিবাহের পর ছয় মাস গেল, তবুও কুমুদিনী ভবনাথের নিকট হইতে কোন চিঠি পাইল না।

কুমুদিনীর কয়েকজন বন্ধুর কিছুদিন আগে বিবাহ হইয়াছিল। তাহারা প্রায়ই কুমুদিনীর কাছে আসিত। স্বামী আদর করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। তাহারা সেই সব চিঠি কুমুদিনীকে দেখাইত।

বন্ধুদের মধ্যে যেদিন একজন বলিল, কুমুদিনীর ভাগ্য ভাল, তাই সে ভবনাথের মত একজন বরের মত বর পাইয়াছে, সেই দিনই কুমুদিনীর মনে অতীতের নিষ্ফলতা সত্ত্বেও কল্পনা প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, হয়ত স্বামীই ভাল, সে-ই হয়ত খারাপ। সেই হয়ত স্বামীর কাছে নিজেকে ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই।

ভাবিয়া ভাবিয়া কুমুদিনী স্থির করিল সে-ই আগে স্বামীকে একখানা চিঠি লিখিবে।

কিন্তু চিঠি লিখিতে বসিয়া সে যেমনভাবে লিখিতে চাহিয়াছিল সেরূপ ভাবে লেখা চলিল না। দুঃসহ দুঃখে সে কাঁদিতে লাগিল ও চিঠির কাগজ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শৈশব কাল হইতে সুখে লালিত পালিত হইয়াছিল সে। কষ্ট বলিয়া কিছু কোন দিনও সে জানে নাই। ধনবানের আদরের মেয়ে ও নিজে শিক্ষিতা বলিয়া সে সর্ব্বত্রই আদর ও সম্মান পাইয়াছে। সে আজ এই দুঃসহ দুঃখের অতলগর্ভ গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। অপার হতাশায় সে বুক-ফাটা কান্না কাঁদিয়াই চলিল। একখানা চিঠির কাগজ নষ্ট হইয়া গেল, সে অপর একখানি লইয়া লিখিতে বসিল। চোখ মুছিতে মুছিতে লিখিয়া লিখিয়া সে কথার উপর কথা সাজাইয়া গেল বটে কিন্তু সেই সাজানো জিনিষের রূপটা তাহার মোটেই পছন্দসই হইল না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল।

একদিন সে চিঠি পাইল। চিঠির উপরে কলিকাতা পোষ্টাফিসের সীল ও ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা দেখিয়া সে স্থির করিল চিঠি ভবনাথই

লিখিয়াছে। চিঠি হাতে লইয়া সে কাঁদিতে লাগিল এবং খুলিয়া পড়িবার সাহস ও সংকল্প মনে গঠন করিয়া তুলিতে পারিল না। তাহার হৃৎপিণ্ড জোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে তখনই গিয়া বিছানায় চিত হইয়া পড়িল ও বুকের উপর চিঠিখানি রাখিয়া চোখ বুঁজিয়া সুদীর্ঘকাল স্থির হইয়া রহিল।

পরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গেলে যখন সে মনের অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইল তখন সে চিঠি খুলিল এবং চিঠির উপর হাতের লেখা দেখিয়াই বুঝিল তাহার এক বন্ধু কলিকাতা হইতে লিখিয়াছে। দুঃখে তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভাব হইল। পরে বিষম ক্রোধে সে চিঠিখানি মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও পরে বিছানায় উপুড় হইয়া ও বালিশে মুখ গুঁজিয়া আশাভঙ্গের ভয়ানক দুঃখে সে নিদারুণ ভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই সময় সুরমা গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মেয়ের কান্না দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, কুমু, কাঁন্‌ছিস্‌ মা তুই ?

এই বলিয়া মেয়ের পাশে গিয়া বসিলেন ও আদরে মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, বল মা, কাঁন্‌ছিস্‌ কেন মা ? কি দুঃখ হয়েছে বলনা আমায় ?

কুমুদিনী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাঁন্‌ছিনে মা। কিছুই, হয়নি মা।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমায় কি ফাঁকি দিতে পারিস্‌ মা ! আমি সব বুঝতে পারি। বলনা কেন কাঁদ্‌ছিস্‌ মা ? কি দুঃখ হয়েছে বলনা মা ?

কি দুঃখ হয়েছে মা তাই বল্‌ছ ! বাবার পা[illegible] তো এই

হ'ল। উঃ তিনি যদি এ বিয়ে না দিতেন! বাবা তো না শত্তুর! উঃ কি বিয়েই দিয়েছেন!

মেয়ের দুঃখে মা গলিয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে চাহিলেন না কিসে মেয়ের বুকে এত বড় আঘাত হানিয়াছে। তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না এ ব্যাপারে যদি দোষ কোন কিছু ঘটিয়া থাকে তবে দোষী কে? বলিলেন, কাঁদিস্‌নে মা। আমি যে আর সহ্য করতে পারিনে। একেতেই তো প্রাণটা রাবণের চিতে হয়ে আছে। বিমল তোর মনে এতও ছিল! কি করা যাবে? উঃ!

এই বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

চিঠি পরিশেষে একদিন আসিল। চিঠিতে ভবনাথ এই কয়েকটি কথা মাত্র লিখিয়া রাখিয়াছে :—

কুমুদিনী, তোমাকে বিবাহ করা আমার উচিত হয়নি। তোমাকে ভালবাসিনে, বাসতেও কোনও দিন পারবো না। যে ভুলটা করেছি তা তো শোধরাবার আর উপায় নাই। জানবে আমি তোমার কেউ নই। আর চিঠি লিখে আমাকে বিরক্ত করো না।

চিঠি পড়িয়া কুমুদিনী কাঁপিতে লাগিল। কথাগুলি গুলির মত ছুটিয়া গিয়া তাহার হৃদয় ভেদ করিল। সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

(৩৭)

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই শৈলকে লইয়া সুবিমল আশ্রমে গিয়া পৌঁছিল।

বিগত রাত্রির অসাধারণ উদ্বেগ ও ক্লান্তির ফলে আজ দুপুরের আহারের পর পরই সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল দিবা নিদ্রার ফলে তাহার আলস্য আসিয়াছে।

কালকার রাত্রিতে সে শৈলর আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ভাবে কাজ করিয়াছিল। সেই সঙ্কটসময়ে শৈলকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যতিরেকে তাহার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হয় নাই, হইতেও পারে নাই।

আজ কিন্তু কালকার অশ্বারোহণের সময় শৈলর স্পর্শরঞ্জিত সান্নিধ্যের ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি অংশগুলির উপাদান লইয়া কল্পনা তাহার মনের সামনে এক ছবি অঙ্কিত করিল। কাল কিছুই একদম ঘটে নাই, আজ মনের স্থির অবস্থায় সেই ছবি তাহার মনে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এখনও সে দেশ সেবার আদর্শ ত্যাগ করে নাই, যদিও কাল রাত্রিতে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবার সময়ই গোলমালের মধ্যেই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে আর কোন সংযোগ রাখিবে না। কিন্তু শৈশব কাল হইতেই সে শুনিয়া আসিতেছে ও এই শিক্ষাই পাইয়াছে যে নারী কুহকিনী, সে তাহার মায়ায় ভুলাইয়া পুরুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, নারীর রূপ দেখিয়া যে মজিল সেই মরিল।

সুতরাং শৈল যে রঙে তাহার কল্পনার সামনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল সে রঙটা এখনকার গুপ্ত সমিতির বাহিরের জীবনেও তাহার আকাঙ্ক্ষিত নহে।

কিছুক্ষণ পরে সে এই মোহের স্পর্শ হইতে জাগ্রত হইয়া ভাবিল, ছি, ছি, সে না পুরুষ! এক তুচ্ছ রমণীর মোহে সে জীবনের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে সে!

ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

পরে মনের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য সে জোরে উঠিয়া দাঁড়াইল ও সংকল্প করিল যে সে তদ্দণ্ডেই আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

শৈলর বিষয়ে সে আশ্রমে ভাল ভাবেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। শৈলকে বাড়ী হইতে লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোনই অসুবিধা হইবে না। তবুও যাইবার পূর্ব্বে শৈলর সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন মনে করিয়া সে শৈল যে ঘরে থাকে সেই ঘরের সাম্‌নে গিয়া রূপকথার রাজপুত্রের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

ঘরের দরজার ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিল, শৈল এক চৌকিতে শুইয়া দরজা পশ্চাতে করিয়া বক্র অবস্থায় বিভোরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার মাথা বালিশ হইতে গড়াইয়া পড়াতে তাহার অবিন্যস্ত, রুক্ষ, বিদ্রোহী চুলের বিশাল খোপাটা শ্লথ হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

রূপ দেখিয়া সুবিমল থমকিয়া দাঁড়াইল ও ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়াই সে মুখ অবনত করিল।

শৈলকে সুবিমল শৈল বলিয়া ডাকিল ধীরে পরিপূর্ণ সম্ভ্রমে।

ডাক শুনিয়া শৈল পাশ ফিরিয়া শুইল। সুবিমলকে দেখিয়াই সেই অসামান্য ফুটন্ত সুন্দরী 'ওমা' এই কথাটা অস্ফুটে কোমল সুরে উচ্চারণ করিয়া চমকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিল ও পরে গায়ের কাপড় সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া মুখ অবনত করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিবার পর অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুবিমল বলিল, শৈল!

শৈল বিনীতভাবে ধীর কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে।

কথাটা বলিবার সময় লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডলে লালের খেলা চলিতে লাগিল।

সুবিমল আগের মতই তাকাইয়া বলিল, মাসিমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

শৈল কোন উত্তর করিল না।

সুবিমল একবার শৈলর দিকে চোখ সোজাভাবে উঠাইয়াই উহা অবনত করিল। বলিল, কিন্তু চিঠিতে আমার নাম দেব না। বুঝেছ তো ?

শৈল নীরব রহিল।

সুবিমল বলিল, আর তো আমি এখানে থাকতে পারছি নে। আমি চল্লেম। তোমার এখানে কোন অসুবিধা হবে না।

শৈল কোন কথা কহিল না।

কাল রাত্রিতে সাংঘাতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে শৈলর যে সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়া সে সুবিমলের পায়ে ধরিয়া কাতর অনুনয় জানাইয়াছিল আজ পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সঙ্কোচ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিল। উপস্থিত সময়ে কথা বলার ভয়ানক প্রয়োজন থাকিলেও একটা কথাও সে মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শুধু পলকের জন্য সুবিমলের দিকে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া সে মুখ অবনত করিল। পরক্ষণেই তাহার চোখ দিয়া অসীম নিঃসহায়তার জল ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

এই কটাক্ষদৃষ্টি ও কান্নার অবস্থা দেখিয়া সুবিমল একদম বিপর্যাস্ত হইয়া গেল। সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিল এই কটাক্ষদৃষ্টি ও কান্না যেন তাহার বুকে হাতুরি দিয়া জোরে জোরে ঘা দিতেছে।

ভাবিল, না, আর না।

বলিল, শৈল আমি চল্লেম।

শৈল রুদ্ধকণ্ঠে চোখের জল কাপড় দিয়া মুছিতে লাগিল। কথা বলিতে চেষ্টা পাইল সে, কিন্তু কথা তাহার মুখ দিয়া সরিল না।

আর কোন কথা না বলিয়া স্থির সংকল্পে, দৃঢ়চিত্তে দৃঢ় পদবিক্ষেপে সে আশ্রমের বাহির হইয়া গেল।

(৩৮)

জগদীশের পাড়ায়ই পোষ্টাফিস। সেই পোষ্টাফিসের সাম্‌নে একটা পুকুর।

প্রত্যহ সকাল বেলায় ডাক আসে। পোষ্টাফিসের কাছে পুকুরের ধারে গ্রামের লোক আসিয়া জড় হয় ও যতক্ষণ ডাক না আসে ততক্ষণ জটলা করে।

আজ গ্রামের অন্য কেহ আসে নাই, শুধু জগদীশ ও জগদীশের দলের কয়েকজন আসিয়াছিল।

মেদের বোঝা, কালো-মস্থন কদাকার মুর্খ জগদীশ একখানা ছড়ি হাতে করিয়া পুকুরের অপর পারে পাইচারি করিতেছিল।

এধার হইতে একজন বৃদ্ধ ডাকিয়া বলিলেন, জগদীশ, শোন, শোন।

ডাক শুনিয়া জগদীশ ধীরে ধীরে আসিয়া পৌঁছিয়া বলিল, বলুন।

—বোস।

জগদীশ পুকুরের ধারের ঘাসের উপরে আলগোছ হইয়া বসিল।

বৃদ্ধ বলিল, শুনেছ?

—বাকি আছে কি শোনবার! বলে এলাম এ সব আমরা কিছুতেই হতে দেব না।

—কাকে বলেছ?

—বলেছি ঠাকুরকেই।

এই সময়ে একজন নবাগত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, কি ?

বৃদ্ধ বলিলেন, না, মোহিনীর মেয়ের কথা হচ্ছিল।

—কেন, সে তো চন্দর ঠাকুরের বাড়ীতে আছে ?

—আর কিছু শোননি ?

—না।

—তবে তুমি শোননি, বল জগদীশ।

জগদীশ বলিল, দাদার মেয়ের কথা হচ্ছিল। গিয়েছিল চন্দর ঠাকুরের বেটার বৌয়ের ভাইয়ের বিয়েতে।

নবাগত বলিলেন, তার মানে রামচন্দ্রপুরের সতীশ বাবুর ছেলে।

জগদীশ বলিল, হুঁঃ! সতীশ বাবুর ছেলে! যেমন তোমার বুদ্ধি!

—বুদ্ধি বুঝি আপনারই ? সতীশ বাবুকে আমি চিনিনে ? সতীশ বাবুর মেয়েকেই তো বিয়ে করেছিল চন্দর ঠাকুরের ছেলে!

—হুঁঃ! ছেলেই তো! জমিদারী সেরেস্তায় কলম ফেঁসতে ফেঁসতে বুদ্ধির মাথাটা খেয়েছ কিনা!

ভদ্রলোক অল্প বেতনে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন।

ভদ্রলোক চটিয়া গেলেন। বলিলেন, আপনার বুদ্ধি যা তা আমার জানা আছে। অহঙ্কারটা আপনার কোথায় থাক্‌তো যদি ভাইয়ের সর্ব্বনাশ না করতেন।

কথায় জোরের আক্রমণ ছিল। জগদীশ ভয়ানক চটিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, মুখ সামলে কথা বল্‌বি হারামজাদা।

ভদ্রলোক আহত হইয়া জগদীশের দিকে সরোষে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, ভারি যে টাকার অহঙ্কার দেখ্‌ছি তোর হারামজাদা! কি করবি বল্ তুই আমাকে ? বল কি করবি ?

মারামারি হইবার উপক্রম দেখিয়া অন্যান্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে থামাইয়া দিল।

মেয়েরা পুকুরের ঘাটে কেহবা জল লইতে কেহবা স্নান করিতে আসিয়াছিল। এই কোলাহলের অবস্থায় কুমারী মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া বিষম বিস্ময়ে এই যুধ্যমান দুই মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া রহিল। যে সব বউ স্নান করিতেছিল তাহারা অতিমাত্র সঙ্কোচে, উগ্র কৌতুহলে, রহস্য-ঘেরা চাহনীতে, চিবুক পর্য্যন্ত মাথা জলে ডুবাইয়া ঘোমটা হাতের নখ দিয়া বন্ধ করিয়া, শুধু চোখের সাম্‌নে ফাঁক রাখিয়া, সেই ফাঁক দিয়া চাহিয়া চাহিয়া ব্যাপারটা উপভোগ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শান্তি আসিলে বৃদ্ধ জগদীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তারপর? মোহিনীর মেয়েকে পেল কোথায় চন্দর ঠাকুর?

—এক আশ্রমে পেয়েছিল বলে।

—কি ভাবে পেয়েছিল?

—বলে, এক ডাকাত মেয়েকে আশ্রমে রেখে গিয়েছিল।

—ডাকাত ধরা যেত তো আশ্রমের পরিচয় ধরে?

—কোথায় আশ্রম? বিশ্বেস করেন আপনিও? পুলিশ গিয়ে ত্যাখে একটা খালি বাড়ী পড়ে আছে। মেয়ে বলে সে ডাকাতের নাম বা ঠিকানা কিছু জানে না।

—তা ঠাকুর বলে কি?

—বলে আর কি? বাঁধা কথা! মেয়ের চরিত্র খারাপ হয়নি। সমাজে যদি একলাও থাকতে হয় তবুও সে মেয়েকে ত্যাগ করবে না।

—তা বুঝেছি। ঠাকুরের কিছু পয়সা আছে কিনা, তাই ঠাকুরের এত অহঙ্কার।

পয়সার কথা শুনিয়া জগদীশ কথার সূত্র হারাইয়া পয়সার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল, পয়সা! পয়সাই তো সব! ছেলে বলুন, মেয়ে বলুন, কেউ কারুর নয়। বুড়ো হয়ে পড়ুন। পয়সা হাতে না থাকলে স্ত্রীও দূর করে তাড়িয়ে দেবে আপনাকে। বড় খাঁটি জিনিষ পয়সা। পয়সা করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমরা ঠাকুরের পয়সার কথা বলছি।

—তা পয়সা আছে অহঙ্কার তো হবেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিয়া উঠিল, কত পয়সা করেছে ঠাকুর! পায় তো চাল কলা! কিছু হয়েছে। তা কত! দেখবো এবার কত পয়সার জোর তার! দেখ্‌বো মেয়েকে ত্যাগ না করে যায় কোথায় ঠাকুর!

বৃদ্ধ বলিল, যাক্ এখন কি করা যায় বল।

জগদীশ বলিল, আপনারা দলবদ্ধ হন। এই দণ্ডেই গিয়ে বলুন ঠাকুরকে যে সে ব্যভিচারিণী মেয়েকে ত্যাগ করুক। আমার বাড়ীতে বিগ্রহ আছে মশায়। আমি অন্ততঃ সমাজে কদাচার সহ্য করতে পারিনে।

বৃদ্ধ বলিলেন, আচ্ছা যদি ডাকাতের কথা সত্যিই হয়?

একজন ভদ্রলোক দাঁতন করিতেছিলেন। ঘটি হইতে কয়েক গণ্ডষ জল লইয়া মুখ ধুইয়া তিনি বলিলেন, না, না, ও সব বাজে কথা। আচ্ছা বলুন দেখি আপনারা ডাকাতের কি স্বার্থ আছে যে মেয়েকে নিরাপদে ভাল জায়গায় রেখে যাবে?

জগদীশ বলিল, না, না, ও সব কিছু নয়, কিছু নয়। মেয়ে রীতিমত ব্যভিচারিণী হয়ে গিয়েছে। আর এটা যে হবে তা আমি আগেই জানি। মেয়ের চাউনি দেখেছেন? দাদাকে কতবার বলেছি,

বৌদিকেও, যে তোমরা মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দাও। বলেছি মেয়ে মহাপাপ, যত ঘাড়ে থেকে নেমে যায় ততই ভাল। কিন্তু তাঁরা কি শুনলেন আমার কথা? তারপর মোটেই আর কিছু বলিনে। ভাবলেম পরের জন্য কেন এত মাথা ব্যথা আমার! শেষে দাদা করলেন কিনা মোকদ্দমা। সব ঠাকুরের পরামর্শে। ঠাকুর কি সোজা লোক! সোজা লোক পেয়েছেন ঠাকুরকে?

জগদীশ আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েছে, এখন উপস্থিত কি করা যায়?

জগদীশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, কর্ত্তব্য ত পরিষ্কার। সমাজের কেউ ওঁর সংশ্রব রাখবে না।

—সমাজ যদি ওঁকে ত্যাগ না করে?

—আলবৎ করবে। আমি যা বলবো তার বিরুদ্ধে গাঁয়ে কথা বলবার কেউ নেই জান্‌বেন।

কয়েকদিন পরে এক বিবাহের ভোজে জমিদার বাড়ীতে গ্রামের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

আহারের সময় চন্দ্রকান্ত সকলের সঙ্গে পংক্তিতে বসিয়াছিলেন। দেখিয়া জগদীশ পাশের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কানাঘুষা করিল। পরে রমেশ বাবুকে ডাকিয়া বলিল, দেখুন ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে কিন্তু কেউ আমরা খাবো না।

রমেশ বাবু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কি করেছেন ঠাকুর মশায়?

—কি করেছেন! ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, দাদার মেয়েকে উনি বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কি না, মেয়ে ব্যভিচারিণী কিনা?

এই ভয়ানক আক্রমণে সকলেই অবাক্ হইয়া জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রকান্ত গায়ের চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া বাঁধিয়া বৃদ্ধ বয়সেও ব্যাটা ছেলের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কি বল্‌লি হারামজাদা? চুপ কর বল্‌ছি। মোহিনীর মেয়ের কথা বল্‌তে লজ্জা করলো না তোর হারামজাদা?

জগদীশ বলিল, দেখুন, যা তা বলবেন না বল্‌ছি।

ঘূর্ণমান চোখে কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া গলার আওয়াজ ঝাঁকুনি দিয়া বাহির করিতে করিতে তিনি বলিয়া চলিলেন, একশো বার বল্‌বো হারামজাদা। সবাইকেই আমি বল্‌তে পারি জানিস্! আমার বয়স হয়েছে আশির কাছাকাছি। সকলেই আমার যজমান। আমি মোহিনীর মেয়ের মত একটি মেয়েও দেখিনি। তুই তাড়িয়ে দিতে বল্‌লেই আমি দেব হারামজাদা? তোর না ভাইয়ের মেয়ে। আজ দুপুরে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে যে ভাবে অপমান করলি হতভাগা তার সাজা তোকে ভগবান দেবেন। ভাইকে মেরেছিস্, আবার যাচ্ছিস মারতে ভাইয়ের মেয়েকে। জগদীশ, তোর পাপের ভরা ডুবেছে রে, ডুবেছে। যা লোকে করতে ভয় পায় তাই তুই দিন রাত করিস্। তোর নরকেও স্থান হবে না হতভাগা। আর জানবি সে রকম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি নই যে দুটি অন্নের কাঙাল। তবে যে যজমানি করি সে কেবল যজমানদের ভালবাসি বলেই। কি করবি তুই আমাকে? তোর মত লোকের মুখে আমি পদাঘাত করি।

এই বলিয়া ঠাকুর রাগে উন্মত্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রমেশ বাবু ছুটিয়া আসিলেন। দোতালার বারান্দায় বাড়ীর মেয়েরা সশঙ্কভাবে আসিয়া জড় হইল। আরও কয়েকজন ছুটিয়া আসিল। সকলেই বৃদ্ধ পণ্ডিতকে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বসাইলেন।

পণ্ডিতের এই তেজস্বিতা দেখিয়া সকলেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অবাক্ হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জগদীশও মুক বনিয়া গেল।

এইখানেই ব্যাপারটার ইতিশেষ হইল না। একটু শান্তির ভাব আসিলে একজন সুবেশ, সুদর্শন, সোনার চশমা-পরা ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের শিক্ষিত যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখুন জগদীশ দা, আপনার কিছু টাকা হয়ে ভয়ানক বাড় হয়েছে দেখছি। তাই আজ পণ্ডিত মশায়কে প্রকাশ্যভাবে অপমান করতে সাহস করলেন। তিনি গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁকে অপমান করে রেহাই পেতে চান আপনি? তা পাবেন না কিছুতেই। এর সাজা গ্রামের লোক আপনাকে দেবেই। যে মেয়ের কথা বল্‌ছেন তিনি আপনার ভাইয়ের মেয়ে। তার কুৎসা রটনা করতে আপনার জিভের বাধলে না? আশ্চর্য্য! আপনার টাকাকে আমরা গ্রাহ্য করিনে জান্‌বেন। আপনার আশ্রয় তো পুলিশ, আর সরকারী আদালত? আপনার মত বদমাইস লোকের হাড় গুঁড়ো করে দিয়ে আমরা জেলে যেতেও প্রস্তুত আছি। শুধু এখানেই নয়। কোন জায়গায়ই আপনার মত লোকের অভাব নেই। সমাজকে বাঁচতে হলে আপনার মত লোকদের ভয়ানক সাজা হওয়া দরকার। সাবধান হয়ে চল্‌বেন জগদীশ দা। যদি স্বভাব সংশোধন না করেন তবে পরিণামে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

যুবকের কথায় জগদীশের চৈতন্য হইল না। রাগে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু যুবকের কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার সাহস সে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিল না।

কুমুদিনীর মুর্চ্ছিত হওয়ার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ভবনাথের চিঠি পাওয়া যায় নাই। চিঠি পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। কেন না একমাত্র চিঠিতেই সে চূড়ান্ত কথা লিখিয়া দিয়াছে।

মেয়ে জামাইয়ে যে বনিবনা হয় নাই একথা পিতা না বুঝিলেও মাতা বুঝিতে পারিয়াছেন। কি দুঃখে কুমুদিনী ফিট হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন।

স্ত্রী আশঙ্কার কথা বলিলে পরেশ কথাটা উড়াইয়া দিয়া কথার বিষয়টা মোটেই নিজের অনুধাবনের মধ্যে আনেন না। মেয়ে জামাইয়ের গড় মিলের সম্ভাবনার কথা তাহার মনে স্থানই পায় না।

পরেশ ডাক্তারকে গিয়া বলেন, বড়ই আদরের ও আমার ডাক্তার বাবু। ওর কিছু হ'লে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

ডাক্তার বলেন, ও ব্যারাম বিয়ের পরে অনেকের হয়। ও আপনা আপনিই সেরে যাবে। ভাববেন না আপনি।

যাহা হউক দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য তিনি টনিক ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

কুমুদিনী ঔষধ মোটেই খায় না। মা পীড়াপীড়ি করিলে সে দামী ঔষধের বোতল ঘরের মেঝেতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। বোতলের কাচ ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া চুড়মার হইয়া যায়। মা ভীতভাবে অবাক্ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকেন।

দেখিতে দেখিতে আবার পূজা আসিল। সুরবালা আগেই কুমুদিনীকে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। সুরমা বলিয়াছেন,

ওকে নিয়ো না এখন সুরবালা। ওতো তোমাদেরই। জামাই আসুক, নিয়ে যেও। বিমল নেই। মনটা আমার দিনরাত খাঁ খাঁ করে। ও গেলে আমি আর বাঁচবো না।

পূজায় জামাই আসিল। মনের ভাব যাহাই থাকুক না কেন, অন্ততঃ লোক লজ্জার ভয়ে কুমুদিনী সুরবালাদের বাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইল।

একদিন দুপুরে ভবনাথ ঘুমাইয়া আছে। কুমুদিনী হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত স্বামীর চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কি সুন্দর চেহারা স্বামীর! কতবার দেখিয়াছে সে! কিন্তু আজকার মতনটি সে আগে কোনও দিনই দেখে নাই। কিছুক্ষণ সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরাণ ভরিয়া স্বামীকে তাকাইয়া দেখিল। পরে বুক-ভেদ-করা এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

যাইবার পূর্ব্বে সে দেখিল স্বামীর বুকের উপর তাঁহার ডান হাতের তলে একখানা ছবি দেখা যাইতেছে। প্রবল উৎসুক্যে এদিক ওদিক চাহিয়া অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ছবিখানি সে আস্তে আস্তে টানিয়া লইল। দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ছবি সুরবালার একখানা কার্ড সাইজের ফটো

হঠাৎ স্থিরসংকল্পে কুমুদিনী ছবিখানি সেমিজের তলে লুকাইল। কেন যে লুকাইল সে তাহা জানে না।

কুমুদিনীর কাছে যাহা এতদিন অজ্ঞাত ছিল তাহা আজ এই একটি-মাত্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুর ঘটনায় কুমুদিনীর চোখের সামনে একেবারে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। এতক্ষণে সে নিদারুণভাবে বুঝিতে পারিল কোন

মায়াবিনী, কালসাপিনী তাহার বুকের ধনকে নির্ম্মমভাবে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে। ভাবিল, উঃ! মানুষ কি ভয়ানক!

কুমুদিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে টলিতে টলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

এই সময়ে ভবনাথের ঘুম ভাঙ্গিল। সে দেখিল কুমুদিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

পাশের ঘরে গিয়া কুমুদিনী নিতান্ত অসহায় ভাবে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চোখের সাম্‌নে ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, পাগল হইয়া গিয়াছে যেন সে।

রাত্রিতে ভবনাথের ঘরে কুমুদিনী কিছুতেই যাইতে চাহে না। সুরবালা রাজি করাইতে গিয়া কুমুদিনীর মুখ হইতে কড়া কড়া কথা শুনিল, কিন্তু সে হাল ছাড়িয়া দিল না। বলিল, বয়স হয়েছে কুমু তোর। কি ছেলে মানুষী করছিস্, বল দেখি? বর পছন্দ তো তুই-ই করেছিস্। কি যে তোর হ'ল ভেবে পাইনে। ঝগড়া করেছিস্! তা ঝগড়া হয়েই থাকে। যা পাগলামি করিস্‌নে ভাই। ছি, লোকে বলবে কি বল দেখি?

কুমুদিনী কিছুতেই রাজি হ'ল না।

পরিশেষে সুরবালার মা আসিয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া কুমুদিনীকে ঘরে পাঠাইলেন।

সুরবালা মাকে বলিল, কি হল মা? এরকম তো দেখিনি কোন জায়গায়।

সুরবালার মা বলিলেন, তাই ত। কি যে হ'ল ভেবে পাইনে। ভাবনার কথাই হয়ে পড়ল দেখছি।

সুরবালা বলিল, ভয়ানক খেয়ালী ও যে! বোধ হয় কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই অভিমানে যেতে চাচ্ছে না।

সুরবালার মা বলিলেন, হতে পারে। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। আমার চোখে এ রকম তো কোনও দিনও পড়েনি।

ঘরে গিয়া স্বামীর শয্যার এক কোণে স্বামীর সঙ্গে রীতিমত ব্যবধান রাখিয়া স্বামীকে পিছন করিয়া কুমুদিনী শুইয়া বালিশে কঠিন সংকল্পে মুখ গুঁজিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভবনাথ ক্রোধের সুরে বলিল, কুমুদিনী?

কুমুদিনী কোন উত্তর করিল না।

ভবনাথ কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় করিয়া বলিল, কুমুদিনী?

কুমুদিনীও অনুরূপ কণ্ঠে উত্তপ্ত মেজাজে উত্তর দিল, বলুন!

—আমার ছবি নিয়েছ?

—নিয়েছি

কথা বলিয়াই কুমুদিনী উঠিয়া বসিল। ভবনাথও উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই কুমুদিনী মেঝেতে দাঁড়াইল, ভবনাথও উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

কুমুদিনী স্পষ্ট বুঝিল আজ এক কঠিন পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভবনাথ বলিল, ফেরত দাও ছবি।

—না দেব না আমি।

—কেন দেবে না?

—দেব না বল্লেম। কিছুতেই দেব না।

—ছবি দেবে না কেন? কেন তুমি মিছি মিছি আমাকে বিরক্ত কর? লিখেই তো দিয়েছি আমি সব। আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলছি আমি সুরবালাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসিনে।

কুমুদিনী ভবনাথের মুখ হইতে এমন স্পষ্ট নির্লজ্জ কথা শুনিবার আশা করে নাই। সে ভীত হইয়া নিজের মস্তিস্কের সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিল। জরাগ্রস্ত দৃষ্টিতে হতভম্বের মত সে কিছুক্ষণ ভবনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভবনাথ টলিল না। অটলভাবে সে বলিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কারণ তো মোটেই নেই। আমি আবার স্পষ্ট করে বল্‌ছি আমি সুরবালাকে ভালবাসি; তোমাকে ভালবাসিনে।

কুমুদিনী প্রতিক্রিয়ার শক্তি ফিরিয়া পাইল ও দুর্জ্জয় ভাবে দৃঢ় হইয়া উঠিল। বলিল, ভালবাসতে যদি না পারেন, তবে আমায় বিয়ে করেছিলেন কেন?

--সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তোমার কোন লাভ নেই। আমি তো চিঠিতে যা বলবার তা লিখে দিয়েছি। দাও, ছবি দাও। নিয়ে এস গিয়ে।

—না দেব না, আন্‌বো না

অন্যের প্রণয়াসক্ত ভবনাথ বিচারবুদ্ধি হারাইয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইল। সে শিষ্টাচার ভুলিয়া ক্রোধের উন্মত্ততায় কুমুদিনীকে জোরে ধাক্কা দিল। ফলে কুমুদিনী দূরে ছিটকাইয়া গেল। মেঝেতে পড়ি পড়ি করিয়াও পড়িল না।

আহত অভিমানে ফিরিয়া আসিয়া দুর্জ্জয় ক্রোধে সে ভবনাথের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। দৃঢ় সংকল্পে সে বলিল, দেখুন আজ আপনি যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে আমার উপর আঘাত করলেন তার প্রতিফল আপনি ভয়ানকভাবে নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি ভয়ানক লোক। তা এখনও লোকে জানে না। কিন্তু জানবে একদিন তারা নিশ্চয়ই। তখন আপনি কিছুতেই বাঁচবেন না।

এই কথা বলিয়া কুমুদিনী ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া উন্মত্ত ক্রোধে ঘরের বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া যাইবার সময়ে সে ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরের বারান্দায় সে আড়ষ্টভাবে সুদীর্ঘকাল বসিয়া রহিল। পরে সে সংকল্পের উপর সংকল্প গড়িয়া তুলিয়া মনটাকে দৃঢ় করিয়া ফেলিল। সারা রাত্রিই এই ভাবে কাটিয়া গেল। পরে ভোর হইতে হইতেই সুরবালাদের বাড়ীর কাহাকেও না বলিয়া লোকনিন্দার কথা একবারও না ভাবিয়া সোজা হাঁটিয়া গিয়া বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

(৪০)

হঠাৎ দুপুর রাত্রিতে আগুন লাগিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তিনি কয়েকখানা টিনের ছাপরা তুলিয়া তাহাতে বাস করিতেছেন।

একদিন সুশীলা চন্দ্রকান্তকে বলিলেন, আমাদের জন্যই তো এই হ'ল অপনার জেঠামশায়।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, কি যে বলিস্ তুই মা! কি হয়েছে আমার? একখানি বাড়ী গিয়েছে। মহামায়ার কৃপায় আর একখানা হবে। আর না হলেই বা কি? দিন তো চলে যাচ্ছে।

—তা আপনার বাড়ী আবার হবে। তবে কিনা জেঠামশায়—

—তবে কিনা কি? বলতে লজ্জা করলো না তোর মা! আমি কি তোদের পর?

অপ্রতিভ হইয়া সুশীলা চুপ করিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বেশ বুঝতে পারছি কে এই কাজটা করেছে। এ কাজটা আর কারুরই নয়। কাজটা ঐ হতভাগা জগদীশটার। তা করুক। ও আমার যজমান। ও আমার অনিষ্ট চিন্তে করতে পারে। আমি তো পারিনে। তাই ভাবি সুশীলা, তোদের পুণ্যের বংশে কি করে ঐ কুলাঙ্গারের জন্ম হ'ল। হয়ত পিতৃ-মাতৃকুলে খারাপ ছিল কেউ কোনও দিন। সেই স্বভাব ও পেয়েছে। তা ছাড়া কুসংসর্গ। নীচ যে নীচের সংসর্গ কামনা করে। রাস্তার লোম-ওঠা কুকুর দেখ না। রাস্তার পচা উচ্ছিষ্ঠ খাদ্যের দিকেই ওর নজর বেশী। যখন মানুষ ঢালু পথ বেয়ে নেমে যায় তাড়াতাড়ি তখন তো সে ভাল কথা শুনে না। তখন কেউ যদি তাকে জ্ঞানের কথা বলে, কেউ যদি বলে সাবধান হও সে তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। ওরও তাই হয়েছে। বিপরীত বুদ্ধি এসে জুটেছে ওর মনে। ওর ধ্বংস অনিবার্য্য। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন মহারাজ, আপনার দুর্য্যোধনের বিপরীত বুদ্ধি এসে জুটেছে, ওর ধ্বংস অনিবার্য্য। শুনলে কি ধৃতরাষ্ট্র সে কথা? শুনলে কি দুর্য্যোধন? জগদীশেরও তাই হয়েছে। আমি বলে দিলেম সুশীলা দ্যাখো ওর কি হয়। না, না, সুশীলা তা বলে আমার রাগ নেই। আমার মুখ দিয়ে রাগের কথা বের হলে ওর অমঙ্গল হবে।

—আমাদের আশ্রয় না দিলে জেঠামশায় আপনার এত কষ্টে পড়তে হত না।

—কষ্ট বলিস্ কেন মা? আমি না দেখলে তোদের কে দেখবে বল তো? বিপদ আসবে আসুক। তা বলে ভয় করলে তো চলবে না। বলছিস্ আমার কষ্ট হত না। কষ্ট নিশ্চয়ই হত ওর দ্বারাই। ওযে কারুর ভাল দেখতে পারে না। তারা, তারা, মা শৈল, এক কল্কি তামাক সেজে নিয়ে আয় তো মা।

শৈলকে জোরে ডাকিয়া চন্দ্রকান্ত শেষের কথাটি বলিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিতে লাগিলেন, ওর মতলব আমাকে ভয় দেখিয়ে ও আমাকে দমন করবে। ভয় পাবার লোক যে আমি নই, তা ও জানেনা। কিসের জন্ম ভয় করবো ? ও জানেনা মানুষের সুখ দুঃখের কর্ত্তা হলেন স্বয়ং ভগবান। ছাখো সুশীলা, আর এক কথা। খারাপ লোকের সঙ্গে বাস করলে আস্তে আস্তে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমারও তাই হচ্ছে। আমি দেখছি আমার ভেতর অহঙ্কার এসে জুটেছে। আমি আজকাল কাউকে ভয় করিনে, আমার টাকা আছে বলে স্পর্দ্ধা করছি।

সুশীলা শুনিয়া চলিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই ভাবছি সুশীলা এ সমাজে হ'ল কি ? চোখের সাম্‌নেই সোনার দেশটা মহাশ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। এখন লোকে উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে ভোগ সুখের পেছনে। কি যে হল! চল মা। দুই মায়ে ছেলেতে কাশী চলে যাই। যেতেম তো অনেকদিন আগেই। কিন্তু যাইনি শুধু কেবল বাড়ীঘর আর যজমানদের মমতায়। বাড়ী পড়ে গিয়ে আমার এই লাভ হয়েছে যে বাড়ী ঘরের ওপর আর আমার মমতা নেই। চল মা, চল, আর না! চল কাশী যাই। মা, মা, মা, বোঝবার উপায় নেই কি খেলা খেলছিস্ তুই মা! ছেলে চন্দ্রকান্তের ওপর কি তোর দয়া হবে না মা!

এই বলিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, রাগ করিসনে মা, একটা গান গাই, গলা নেই যদিও। বড় সুখ পাই মা গান করে। গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে মনটা অনেক উপরে উঠে যায় মা। গানটা যে ভগবানেরই দান মা। ওযে অব্যক্ত পুরুষকায় ব্রহ্মেরই একটা রূপ। ব্রহ্মানন্দ যে কি জিনিষ তা কি আমরা ভাবতে পারি মা! আমরা কেউ তা বুঝিনে। টাকা টাকা করে মরি আমরা। টাকা কর সাধু উপায়ে। টাকা না

করলে চল্‌বে কি করে। কিন্তু টাকা জিনিষটার ওপর মায়া থাক্‌বে কেন? যখন যম এসে গলা টিপে ধরবে সে সময়ে টাকা কি তোমায় রক্ষে করবে? জগদীশ টাকা করছে। জগদীশের টাকা কি তার সঙ্গে যাবে? কিছুই যে থাক্‌বে না মা। শিবশক্তি যে সব সংহার করে ফেলবে। মোহিনীর তো কত চিন্তে ছিল। কোথায় গেল সে চিন্তে? জগদীশ মোহিনী তো ছার! অত বড় রাজা যুধিষ্ঠির! কোথায় গেলেন তিনি? কোথায় ভীম? কোথায় অর্জ্জুন? পূর্ণব্রহ্ম যে রামচন্দ্র তিনিই বা কোথায়? দুদিনের খেলা এ জগতে খেলে সবাই চলে গিয়েছেন। তাই আমরা বুঝিনে। চোখের ঠুলি খুলে দে মা। চেয়ে দেখি তোর খেলাটা ভালভাবে।

গান গাই:—

আমি চল্লেমরে ভাই আনন্দ কাননে,
সংসারেরই লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে।

চন্দ্রকান্ত গান সম্পূর্ণ করিলেন না। উপরের দুই লাইনই তিনি কখনও হাতের তুড়ি যারা তাল মিলাইয়া, কখনও করতালি সহকারে উন্মত্তভাবে গাহিতে লাগিলেন। গান শেষে দেখা গেল তাঁহার চোখ দিয়া অবিরলধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, প্রেমের আলোকসম্পাতে তাঁহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

সুশীলাও চন্দ্রকান্তের ভাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আঁখি সজল হইল। বিষণ্ণভাবে বলিলেন, শ্মশানকে আনন্দ-কানন কয়জন বলতে পারে জেঠামশায়? মরা তো ভাল, কিন্তু কয়জন শ্মশানকে আনন্দ-কানন বলে মরতে পারে? ভগবান সুমতি দাও, মরবার সময় যেন তাই ভাবতে পারি।

এই সময়ে শৈল কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে মুখ লাল করিতে করিতে চোখ মুছিতে মুছিতে তামাক সাজিয়া আনিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, রেখে দে মা তামাক। এখন খাবার ইচ্ছে নেই।

ভাবের ঘোরে চন্দ্রকান্ত শৈলর দিকে চাহিয়া দেখিলেন এই আনন্দময় পৃথিবীর মধ্যে নিরানন্দ কেবল শৈল।

চন্দ্রকান্ত মাদুরের উপর বসিয়াছিলেন। ভাবাবেশে মত্ত অবস্থায়ই তিনি শৈলকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

শৈল কাছে আসিয়া বসিলে চন্দ্রকান্ত শৈলর মাথাটা নিজের কোলের উপর রাখিলেন। সেই অবস্থায় চিত হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া শৈল চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলকে এই অবস্থায় রাখিয়া চন্দ্রকান্ত আবার গান ধরিলেন :—

মা তোমার মায়াবিভূতি কে জানে মা তোমা বিনে,
জানলে জানে সেই মাত্র নর যে নয় তন্মাত্র অধীনে।

সুশীলা বলিলেন, জেঠামশায়, আপনার শৈলকে নিয়ে আপনি থাকুন। আমি যাই।

সুশীলা চলিয়া গেলে ও গান থামিলে চন্দ্রকান্ত শৈলর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, শৈল-মা, তোর দুঃখ কিসের মা ?

আশ্রম হইতে এখানে আসিবার পর জগদীশের দলের আন্দোলনের তাৎপর্য্য শৈলর কানে গিয়াও পৌঁছিয়াছিল। সে-ও ভয়ানক দুঃখে দিন কাটাইতেছিল। চন্দ্রকান্তের স্নেহের কথায় তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, সে কাঁদিয়া ফেলিল।

পরণের কাপড় দিয়া শৈলর চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, শৈল মা, আমি থাকতে তোর কিসের দুঃখ মা ? দুঃখ করিস্‌নে মা !

শৈল কথা কহিতে চাহিল। কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহার কথা কণ্ঠে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকান্ত হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মা তোকে যে আশ্রমে রেখে গিয়েছিল তার নামটা তুই জানিস্ মা। বুড়োকে কি ফাঁকি দেওয়া সহজ মা! জানিস্‌নে মা?

শৈল এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই কথার পর সে চন্দ্রকান্তের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই অবস্থায় চন্দ্রকান্তের নিকট মিথ্যা কথা বলা সম্ভব নয়, অন্ততঃ চন্দ্রকান্তের উপস্থিত উচ্ছ্বসিত স্নেহের সহজাত কৃতজ্ঞতার খাতিরে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সুবিমলের নাম সে কিছুতেই প্রকাশ করিবে না। সে প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলিল। সে মাথা নাড়াইয়া বলিল যে সে জানে।

চন্দ্রকান্ত স্নেহের সুরে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিশেষে তিনি জানিলেন সুবিমল শৈলকে আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছিল।

জানিয়াই তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, যাঃ, তোর সব কথা ধরে ফেলেছি। বিমলকে তুই ভালবেসেছিস্।

এই পূজনীয় পণ্ডিতের কাছে আত্মপ্রকাশের লজ্জায় যেন শৈল ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৪১)

—ঠাকুর পো, আমার যে বড় ভয় হচ্ছে।

—কেন?

—বলুন তো এ রকম চিঠি পেলে কার না ভয় হয় ?

—তা বটে, কিন্তু আমার মতে আগেই এত ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

—সেয়ার বিক্রির জন্য আপনি জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন কয়দিন আগে ?

—ছয় দিন।

—তখন কোন অসুখই দেখেন নি ?

—অসুখ দেখিনি বটে কিন্তু শরীর খারাপ দেখেছি। সুরেশ দা যে বেজায় খাটেন।

—যাক্ সে কথা। আপনি কি মনে করেন চিঠিটা ? নিজে লিখলেন না !

—হয়ত ব্যারাম খুব বেশী হয়েছে।

—বলেন কি ? তবে এখনই চলে যাই।

—একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয়। তবে ব্যারামটা—

—আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে। ব্যারামটা মানে ?

—না বল্‌ছি যে ব্যারামের কথাটা লিখেছে সে ব্যারামটা তো সোজা নয়। আর হরিময়ই বা মিথ্যে লিখ্‌তে যাবে কেন ? চিঠিতো হরিময়ই লিখেছে দেখছি।

কথা চলিতেছিল রাজসাহীর বাসাতে ভবনাথ ও সুরবালার মধ্যে। কিছুদিন পূর্ব্বে সুরবালার সঙ্গে কথা বলিতে ভবনাথ ঘামিয়া উঠিত। এখন সে মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যাস করিয়াছে।

আজ কলিকাতা হইতে হরিময় বাবু চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে সুরেশ হঠাৎ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

চিঠি ভবনাথের হাতে ছিল। সুরবালা বলিল, দেখি চিঠিখানা আগে।

চিঠি লইয়া সুরবালা দেখিল গত পরশু উহা বৌ বাজারের ডাকে দেওয়া হইয়াছে।

সুরবালা চিঠি এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, না, না, আর দেরী করা চলে না। এখনিই আমায় নিয়ে চলুন।

—আচ্ছা একটা টেলিগ্রামই করে দেই এখন। টেলিগ্রামই করে দিই এখন। টেলিগ্রামের জবাব এলে একটা কিছু করা যাবে।

—টেলিগ্রাম করে কি হবে? শুধু শুধু দেরী হয়ে যাবে।

—তাও বটে।

সুরবালা ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, পরেশবাবু তো আত্মীয়। তাঁর একটা পরামর্শ নিলে হয় না?

—না, না, তা নিয়ে দরকার নেই। তিনি কুমুদিনীর কথা নিয়ে একটা গোলমাল বাধিয়ে বস্‌বেন।

—কেন কুমুদিনীর সঙ্গে কি আপনার রাগারাগি হয়েছিল?

—হয়েছিল না? তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি?

—বুঝতে তো পেরেছি। নৈলে অমনভাবে চলে যাবে কেন? তবুও কারণটা কি দাঁড়িয়েছিল বলুন তো।

—কারণ এমন বিশেষ কিছু নয়। বিশেষ কেন একেবারেই কিছু নয়। সবে তো বিয়ের পর দুই দিন দেখা। বড় খেয়ালী মেয়ে বৌদি, বড় খেয়ালী মেয়ে। আগে যদি জান্‌তেম তবে বিয়েই করতেম না।

—কারণটা কি তাই বলুন না। কি বাজে বক্‌ছেন!

—কারণ আর কিছুই নয়। সাধারণ কথা কাটাকটি। তাতেই এত চটে গেল যে সারারাত বাইরেই কাটিয়ে দিলে।

সুরবালা এই বিপর্য্যয়ের অবস্থায় নীরবে ভবনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভবনাথ বলিতে লাগিল। পরেশ বাবু শ্বশুর স্বীকার করি, কিন্তু যে পাগল তাতে আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি এমন এক কাণ্ড করে বস্‌বেন, এক ভয়ানক গোলমাল বাধিয়ে দেবেন, যাতে আজ আপনার কিছুতেই যাওয়া হয়ে উঠবেনা।

সুরবালা মাথা অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরে মাথা উঠাইয়া বলিল, নাটোরের মোটর কটায় ?

ভবনাথ উত্তর করিল, বারোটায়।

—এখন কয়টা বাজে ?

—দশটা।

—না, না, আর পরামর্শ নিয়ে কাজ নেই। এক ঘণ্টার ভেতর তৈরি হতে হবে আমাকে।

—আচ্ছা চলুন তবে। মাকে সঙ্গে নিলে হয় না ?

—না, না, ওসব বিপদ টেনে আনবেন না। মা, বুড়ো মানুষ, ওকে নিয়ে দরকার নেই।

—তা তো বুঝলেম্‌।

—তার মানে ?

—মানে কিছুই নয়। তবে—

—আমি যুবতী। এই ত ?

এই কথা বলিয়া সুরবালা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভবনাথের দিকে চাহিল।

ভবনাথ এই দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। সে মুখ অবনত করিল। পরে কতকটা ইতস্ততের ভাবে বলিল, তা ঠিক নয় যদিও তবে ঠিকও যে না কতকটা তা নয়।

—বেশ ! ভেবে পাইনে কি করে এ যুক্তি আপনার এল ।

আর কোন কথা হইল না। ঠিক হইল তাহারা বারোটায় মোটরে নাটোরের পথে কলিকাতায় রওনা হইয়া যাইবে।

সুরেশের গুরুতর অসুখের সংবাদে যে সুরবালা অস্থির হইয়া উঠিবে তাহা ভবনাথ বিলক্ষণ জানে। বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামীর হেপাজত হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া যে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় একথা সে একবারও ভাবিল না। দৈব ও মানুষের ধিক্কৃত এক ভয়ানক কাজে লিপ্ত হইয়া সে সুশৃঙ্খল সমাজের বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত হানিল। যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অনেক সময় দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডাও পশ্চাৎপদ হয় ভবনাথ আজ অন্ধ উন্মত্ততায় সেইরূপ কাজে অদৃষ্টবিতাড়িত হইয়া হাত দিল।

কয়েক মাস ধরিয়া সে প্রাণপণ যত্নে সুরবালার হাতের লেখার অনুকরণ করিয়া আসিতেছিল। এখন সেই লেখা সে হুবহু জাল করিতে পারে।

কলিকাতা হইতে সুরেশের কঠিন পীড়ার সংবাদ জানাইয়া ভবনাথ হরিময়কে একখানা চিঠি লিখিতে বলিয়া আসিয়াছিল। সেই চিঠি আজ তাহার জলপাইগুড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার পর পরই রাজসাহীতে আসিয়া পৌছিয়াছে। সুরেশের অসুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সুরবালাকে লইয়া রওনা হইবার পূর্ব্বে ভবনাথ সুরেশের নামে সুরবালার হাতের লেখার অনুকরণে যে চিঠিখান রাজসাহীতে পৌছিবার পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিল সেই চিঠিখানি ডাকে দিল।

চিঠিখানি এই :—

শ্রীচরণেষু—

কি লিখিব? লেখার কিছুই নাই। আপনি আমায় প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। এই হিসাবে এই চিঠি লেখা অন্যায়। তবে লজ্জার মাথা

খাইয়া লিখি আমি আপনার সঙ্গে উপরে উপরে যেরূপ ভাল ব্যবহারই করিয়া থাকি নাই কেন, কোনদিনই আপনাকে ভালবাসি নাই।

কথাটা আপনার কাছে স্পষ্ট করিয়াই বলি। আমি ভবনাথকে দেখিয়া মজিয়াছি। আপনার অনুপস্থিতে আমাদের প্রেমের খেলা চলিয়াছে। শেষে নিজেকে ধরিতে পারিলাম না। আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। বিচার-বুদ্ধি দিয়া দেখি আপনার সঙ্গে ভবনাথের তুলনা হয় না, কিন্তু ভবনাথকে দেখিলেই আমার মন পাগল হইয়া যায়।

তাই ভবনাথকে লইয়া দেশত্যাগী হইলাম। যেথানেই দুই চোখ যায় সেথানেই আমরা চলিয়া যাইব।

মাকে বলিলাম আপনার ডিপথিরিয়া হইয়াছে।

আপনি আমার খোঁজ করিবেন না। খোঁজ করিয়া লাভ কি? আপনি এই চিঠি পাইয়া ভয়ানকভাবে কাঁদিবেন জানি, কিন্তু কি করিব মাথায় খুন চাপিয়াছে, তাই খুন করিতে চলিলাম।

যখন আপনি এই চিঠি পাইবেন তখন আমরা বহুদূরে চলিয়া যাইব। যত কঠিনই হ'ক না কেন আমার স্মৃতি আপনার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবেন। আপনি খুব ভাল লোক। আমাকে ও ভবনাথকে বড় বেশী বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার ফল আজ ফলিল।

ভবনাথ প্রণয়াসক্ত—
সুরবালা

নিজের হস্তাক্ষরে ভবনাথ এই চিঠি লিখিল :—

সুরেশ দা,

সুরবালার চিঠি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। বিশেষ আর কি লিখিব? অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—
ভবনাথ সান্যাল

ঈশ্বরদি ষ্টেশনে ভবনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুরবালা জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল ভবনাথ দূরে প্ল্যাটফরমে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

ভবনাথ ফিরিয়া আসিলে সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ঠাকুরপো ?

—উনিই হরিময়বাবু, যিনি চিঠি লিখেছেন ।

—কোথায় যাচ্ছেন উনি ?

—রংপুরে।

—কি বল্লেন তিনি ? কে আছে ওঁর কাছে ?

ভবনাথ কোন উত্তর করিল না।

সুরবালার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল। বলিল, কি বল্লেন তিনি ? কে আছে ওঁর কাছে ?

—যাক্ আর পৌঁছতে কয় ঘণ্টাই বা দেরী। গিয়েই সব দেখা যাবে।

—আমি বল্‌ছি বলুন না তিনি কি বল্লেন।

—বলে তো লাভ নেই।

—তবে কি তিনি নেই ?

এই বলিয়া সুরবালা কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড়ই নিষ্ঠুর আপনি ঠাকুরপো। বলুন না কি হয়েছে ? নেই কি তিনি ?

ভয়ানক এক সংকল্পে ভবনাথ মনটা পাথরের মত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছিল। সুরবালার কান্নায় সে দমিল না।

বলিল, না, না, তা নয়। বেঁচে তিনি আছেন। তবে ব্যারামটা খারাপ।

সুরবালা বলিল, কি ব্যারাম ?

—ডিপথিরিয়াই। তবে আজ জল পর্যান্ত খেতে পারছেন না।

সুরবালা ভয়ানক উৎকণ্ঠায় বলিল, কখন ছাড়বে গাড়ী ঠাকুরপো ? ছাড়েও ত না। ও গাড়ী কোথাকার ?

এই সময়ে প্ল্যাটফরমে নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসিয়া দাঁড়া য়াছিল। ভবনাথ বলিল, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস। এক ঘণ্টা আগে পৌছবে।

—তাহলে চলুন ঐ গাড়ীতেই যাই।

—চলুন।

ভবনাথেরা পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জারে দেড়া ভাড়ায় আসিয়াছিল। এবার নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শূন্য কামড়ায় গিয়া উঠিল।

ভবনাথ গার্ড সাহেবকে এই পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়া আসিল।

গাড়ী দাক্ষণের কেবিন ও দূরবর্ত্তী সিগন্যাল পার হইয়া গেল। খোলা মাঠে গিয়া পড়িলে ভবনাথ যেরূপ দৃষ্টিতে সুরবালার দিকে যাইতে লাগিল তাহা মোটেই শিষ্টাচারসম্মত নহে। নাটোর হহতে ঈশ্বরাদ পর্য্যন্ত গাড়ীতে লোকের ভিড় ছিল, সুতরাং সেখানে ভবনাথের সুরবালার প্রতি নিরঙ্কুশ ব্যবহারের সুযোগ ঘটে নাই। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য কামড়ায় সেই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে আসিয়া জুটিল।

সুরবালা মুখ অবনত করিয়া নিজের দুঃখে নিজেই মগ্ন ছিল। ভবনাথ এই অবসরে তাহার দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সুরবালা এই লুব্ধ দৃষ্টির কথা বুঝিতে পারে নাই।

দেখিয়া দেখিয়া পরিশেষে ভবনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উত্তেজনার চরমে গিয়া

পৌঁছিল। সেই চরম মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া গিয়া লজ্জা ও সুরুচির মাথায় পদাঘাত করিয়া সুরবালার পাশে বসিল। চক্ষের নিমেষে সে নিজের ডান হাতখানি সুরবালার পিঠের উপর রাখিল। পরক্ষণেই বাম হাত দিয়া তাহার মাথা টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া কতকটা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, সুরবালা তোকে আমি ভালবাসি সুরবালা। তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। সুরেশদার অসুখের কথা সব মিথ্যা।

বিপদ অতর্কিত, বিস্ফোরণের ন্যায় ভয়ানক। পলকের মধ্যে সব ঘটিয়া গেল। কিন্তু সেই ভয়ানক পলকের মধ্যেই দুরাচার সাংঘাতিক ভবনাথের মুখ হইতে উচ্চারিত কথাগুলি হইতে নিজের প্রাণপণ মুক্তির চেষ্টার মধ্যে নিজের অবস্থার কথা সুরবালা নিদারুণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল। দ্রুতগতিতে প্রাণপণ মরিয়ার শক্তিতে নিজকে সে ভবনাথের বাহুমুক্ত করিয়া লইল ও লাফ দিয়া উঠিয়া দূরে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতিহত বাঘিনীর মত সুরবালার চোখ জ্বলিতে লাগিল। প্রতিহত ফণা-ওঠানো কাল সাপের মত গর্জ্জন করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সে বলিল, কুকুর, এই ব্যবহার তোর!

রেলগাড়ীর এই নির্জ্জন কামড়ায় সুরবালার ক্রোধে ভবনাথ দমিল না।

সুরবালার কথায় বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয়ের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া উদ্ধত তেজে ভবনাথ বলিল, তোমরা রাগ বলে আমি ভয় করিনে সুরবালা। আত্মসমর্পণ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই তোমার সুরবালা।

সুরবালা দমিল না। ভয়ানক ক্রোধে শশব্দে গাড়ীর কামড়ার মেঝেতে পদাঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, চুপ কর শয়তান।

পরে কম্পিত ওষ্ঠাধরে কতকটা হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘনশ্বাসে বুক প্রবলভাবে উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে থামিয়া থামিয়া সে বলিল, উপায় আছে কি না আছে তা আমি বেশ জানি। সাবধান কুকুর! যেখানে আছিস্ সেইখানেই থাক্‌বি তুই!

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জমাট-বাঁধা অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে বাবলা গাছের শ্রেণী নীচে রাখিয়া একটানা হরর হরর শব্দ করিতে করিতে জোরে দৌড়াইয়া গাড়ী পাকৃশী ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া চলিল। তখন সুরবালা গাড়ীর দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিপর্য্যয়ের অবস্থায় যে দিকে তাহার ঠেলা দেওয়া উচিত ছিল সে দিকে ঠেলা সে দিতে পারিল না। দরজাও খুলিল না। পরিশেষে সে নিরুপায় হইয়া দূরে গিয়া ভবনাথকে পিছন করিয়া বসিল।

বিপর্য্যস্ত অবস্থায় সুরবালার কূল-ছাপানো যৌবন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দেখিয়া ভবনাথ আরও পাগল হইয়া গেল। সে ছুটিয়া গিয়া মাতালের জ্ঞানশূন্য মত্ততায় প্রাণপণ শক্তিতে সুরবালাকে জড়াইয়া ধরিল।

এবার নিজকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া সুরবালার সঙ্গে ভবনাথের রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল।

ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সে সুরবালার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। পরিশেষে সুরবালা তাহাকে লাথি দিয়া সরাইয়া দিল।

মেয়ে মানুষের লাথির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পুরুষ ভবনাথ রেলগাড়ীর কামড়ার মেঝেয় সশব্দে সটান পড়িয়া গেল।

সুরবালা জোরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, কুকুর! শয়তান! পাজি!

এই সময়ে গাড়ী পদ্মার সেতুর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সতর্কতার মার নাই বলিয়া রাজসাহী হইতেই ভবনাথ একখানা ছোরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেই ছোরাখানি সে কাপড়ের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ক্ষিপ্ত অভিমানে ভবনাথ ছোরা হাতে করিয়া বেপরওয়ার মত উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, রাজি আমার কথায় তোমার হতেই হবে সুরবালা। নৈলে তোমাকে খুন করে আমি নিজেই খুন হব।

ছোরা দেখিয়া সুরবালার সমস্ত সাহস নিমেষেই উবিয়া গেল। তবুও ভবনাথের কথার উত্তরে মহাতঙ্কে মরিয়ার সুরে সে বলিল, চুপ কর শয়তান! কুকুর! বদমাইস!

এই কথা বলিয়া সে গাড়ীর চেনে টান দিল। এই টান দেওয়ার পর ভয়ানক বিপদে দিশেহারা হইয়া নিমেষের মধ্যে সে পুরুষের মত করিয়া কাপড় পড়িল। নিমেষের মধ্যেই সে আঁচল ঘুরাইয়া দিয়া মাজায় শক্ত করিয়া বাঁধিল।

ছোরা হাতে করিয়া অনন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভবনাথ সুরবালার দিকে অগ্রসর হইল। সে যে গাড়ী থামিয়া যাইতেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল না।

গাড়ী লোহার বেড়া পার হইয়া ভেড়ামারার দিকের খোলা সেতুর উপর দাঁড়াইয়া গেল।

এবার সুরবালা প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ঠিকভাবেই টান দিল। এবার দরজা খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গেই সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই দরজার ফাঁক দিয়া মহাশূন্যে লাফাইয়া পড়িল। গাড়ীর থামিবার অপেক্ষায় সে থাকিতে পারিলনা।

ভবনাথও যন্ত্রচালিতবৎ হাতের ছোরাখানি পদ্মার জলে ফেলিয়া দিল।

ভয়ানক এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আঁধার মহাশূন্য সুরবালাকে নিষ্ঠুর ভাবে গ্রাস করিল।

আঁধার রাত্রিতে গার্ড ও ড্রাইভার লণ্ঠন লইয়া সেতুর লোহার পাতের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া আসিল। ভবনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, দুইজন ডাকাত গাড়ীতে উঠিয়া তাহার সুটকেস্ লইয়া গিয়াছে ও চেন টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দিয়া নামিয়া গিয়াছে।

গার্ড ও ড্রাইভার দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ভদ্রলোক আরোহীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আলোকের ফোকাস্ নিক্ষেপ করিয়া তাহারা এদিকে ওদিকে দেখিল কিন্তু কোন জায়গায়ই ডাকাতের সন্ধান মিলিল না। তাহারা চলিয়া গেল।

গাড়ী ঈশ্বরদি ষ্টেশন ছাড়িবার পনর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এতগুলি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

(৪৩)

বর্ষায় ভয়ানদী পদ্মার দুইকূল ছাপিয়া উঠিয়াছে। আঁধার রাত্রি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে।

আকাশের এই অবস্থায় সুরবালা পদ্মার জলে পড়িয়া গেল। পড়িয়া সে মরিল না।

পড়িবার পর সে গভীর জলে ডুবিয়া গেল। জলের তলে মর্ম্মান্তিক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া সে ভাসিয়া উঠিল ও মুক্ত বায়ুর স্পর্শে পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরিয়া পাইল।

অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল।

যখন সে ভাসিয়া উঠিল তখন সে দেখিল যে তাহার কোন ভয়ই হয় নাই। বড় নদীর সঙ্গে জীবনের প্রথম হইতেই পরিচিত সে। সে ভাবিল সে বিদ্যুতের আলোকে পথ স্থির করিয়া আস্তে আস্তে প্রায় ভাসিয়া ভাসিয়াই কূলে গিয়া উঠিবে। জোরে হাত পা সঞ্চালন করিয়া সে সাঁতার দিয়া চলিতে চেষ্টা করিল না। রাত্রির ঘন আঁধার তাহার সাহস বাড়াইয়া দিল।

ক্ষণে ক্ষণে মেঘ ভয়ানক শব্দে ডাকিয়া ওঠে, বিদ্যুৎ আকাশের বুক চিড়িয়া ঝলক হানিয়া জ্বলিয়া ওঠে।

বিদ্যুতের আলোকে সে তীরের গাছের শ্রেণী দেখিয়া আশা পায়।

চিৎকার করিয়া সে অনির্দ্দিষ্ট নৌকাবাহীর সাহায্য প্রার্থনা করিল না। পদ্মার ঢেউয়ের উপর দিয়া ওঠা নামা করিতে করিতে সে ভাসিয়া চলিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই নদীপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল সুরবালা! কিন্তু এপর্য্যন্তও সে তীরে উঠিতে পারিল না।

বিদ্যুতের আলোকে একবার সে চাহিয়া দেখিল যে সে যে দিকে চলিয়াছে সে দিকে দূরে চাহিয়াও গাছ দেখা যায় না।

সে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া কল্পিত তীরের দিকে মুখ করিয়া আস্তে আস্তে হাতের দাঁড় টানিতে লাগিল। পুনরায় বিদ্যুতের আলোকে চাহিয়া দেখিল যে সে নূতন করিয়া যে দিকে চলিতেছে সে দিকে দূরে চাহিয়াও গাছ দেখা যায় না।

কি ভয়ানক! তবে কি পুনঃ পুনঃ ভুল করিতেছে সে? তবে কি করিয়া সে দিক নির্ণয় করিবে?

এবার তাহার বুক আশঙ্কা ও আতঙ্কে প্রবলভাবে কাঁপিয়া উঠিল।

এতক্ষণে সে চিৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল। ভাবিল কাছে নৌকা থাকিলে নৌকাবাহীরা তাহার

চিৎকার শুনিয়া সাহায্য করিতে আসিবেই। এখন সে বুঝিতে পারিল কিছুক্ষণ পরেই তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া সে ডুবিয়া যাইবে।

নিরুপায় হইয়া সে কয়েকবার চিৎকার করিয়া ডাকিল। রাত্রির নির্জ্জনতায় পদ্মার জলতরঙ্গের উপর কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া মর্ম্মান্তিকভাবে উচ্চ হইতে লাগিল সেই স্বর ও দূরে দূরে ভাসিয়া চলিতে লাগিল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, সূর্য্য উঠিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে।

রাজশেখর বাবু রাজসাহী হইতে বদলি হইয়া সম্প্রতি পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। রূপে, গুণে, প্রবীণতায় তিনি অদ্বিতীয়। সম্প্রতি পুলিশ লঞ্চে তিনি সহরে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি সেই লঞ্চ প্রভাতে ছাড়িয়া দিবার উদ্দেশ্যে পাবনা সহরের কয়েক মাইল উজানে নঙ্গর করিয়া আছে।

তিনি নিদ্রিত ছিলেন। হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তিনি শুনিলেন যেন দূর হইতে এক অসহায় আর্ত্তনাদের ক্ষীণ আওয়াজ বাতাসে ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। নিবিষ্ট মনে কান খাড়া করিয়া থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন লোক জলে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

সারেঙ্গকে ডাকিলে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া পরবর্ত্তী ডাকের অপেক্ষায় ডেকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। পরের ডাক শুনিয়া সে জানাইল একজন ভদ্র যুবতী জলে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। আওয়াজ উজান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ লঞ্চের সার্চ্চ লাইট জ্বালা হইল। তৎক্ষণাৎ ঠং ঠং শব্দ করিয়া নঙ্গর তুলিয়া খালাসীরা সেই শব্দের দিকে লঞ্চ ফিরাইয়া সার্চ্চ লাইট ফিরাইল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে খালাসীরা ক্ষণে ক্ষণে ভয় নাই, ভয় নাই বলিয়া জোরে চিৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ঠং ঠং শব্দ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল!

কিছুক্ষণ পরেই সকলের দৃষ্টিতে পড়িল, দূরে সার্চ্চ লাইটে একটি মাথা চিক চিক করিতেছে ও উহা দ্রুতগতিতে স্রোতের বরাবর ভাসিয়া আসিতেছে। যখন ঢেউয়ের উপর উঠিতেছে তখন উহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পরক্ষণেই ঢেউয়ের নীচে পড়িয়া উহা মিলাইয়া যাইতেছে।

লঞ্চ সেই মাথাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ঢেউয়ের উপর উঠিলে উহাকে দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলেই 'ওই' 'ওই' বলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

লঞ্চ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে বুঝিয়া এতক্ষণ সুরবালা পুরাদমে সাহস পাইয়া আসিতেছিল। এখন সে বুঝিতে পারিল তাহার হাত পা যেন অসার হইয়া আসিতেছে, দম যেন ফুরাইয়া যাইতেছে।

লঞ্চের নৌকা আগেই জলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

লঞ্চ যখন একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ও খালাসীরা যখন সুরবালাকে নৌকায় টানিয়া তুলিবে তুলিবে এই সন্ধি সময়ে তাহার হাত পা একেবারেই অসার হইয়া গেল। সে কাতরকণ্ঠে কতকটা জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে বাঁচান, আমি আর পারলেম না!

যখন সুরবালা একেবারেই ডুবিয়া যাইতেছিল তখন খালাসীরা তাহাকে হাতে ধরিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নৌকায় টানিয়া তুলিল ও পরে উঠাইয়া লঞ্চের ডেকের উপর শোয়াইয়া রাখিল। পরক্ষণেই প্রবল আগ্রহে তাহাকে দেখিবার জন্য তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

রাজশেখর বাবু ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন ও অবাক্ হইয়া জোরে বলিয়া উঠিলেন, এযে সুরবালা !

রাজসাহীতে রাজশেখরবাবুর বাসা সুরবালার বাসার কাছেই ছিল। সেইজন্ত তিনি সুরবালাকে ভালভাবেই জানিতেন।

সফরে যাওয়া স্থগিত করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পাবনায় ফিরিয়া আসিলেন ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায়ই সুরবালাকে নিজের কুঠিতে লইয়া গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ অনেক সাধ্য সাধনার পর ডাক্তার ও রাজশেখর বাবুর পুত্রবধু মিনতি রায়ের যত্নে সুরবালার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালে সুরবালা সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তখনও তাহার বিছানা হইতে উঠিবার সাধ্য ছিল না। মিনতি চামচে করিয়া সুরবালাকে গরম দুধ খাওয়াইতেছিলেন। সেই অবস্থায়ই সুরবালা ধীরে ধীরে চামচের ফাঁকে ফাঁকে থামিয়া থামিয়া নিজের দুঃসহ কাহিনী বলিয়া শেষ করিল।

শুনিয়া রাজশেখর বাবু ও মিনতি অবাক্ হইয়া গেলেন। উভয়েই অবাক্ হইয়া গেলেন এই ভাবিয়া কেমন করিয়া সুরবালা অত উঁচু হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া বাঁচিল, ও বাঁচিয়াও সাঁতার দিয়া মাইলের পর মাইল চলিয়া আসিবার সাহস ও শক্তি রক্ষা করিতে পারিল।

রাজশেখরবাবু ভবনাথকে ভাল বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু স্পষ্ট-সত্যকে তিনি পূর্ব্বের ধারণার উপর নির্ভর করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না।

রাজশেখর বাবুর পুত্র সুশীল রায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। মিনতিও অক্সফোর্ডের বি, এ। তিনি কলিকাতায় স্বামীর কাছে থাকেন। কিছুদিন হইল তিনি পাবনায় শ্বশুড়ের বাড়ীতে আসিয়া আছেন।

দুইখানি চিঠি গিয়াই সুরেশের হাতে পড়িল ঠিক পরের পরের দিন। দুইখানি চিঠিই সুরেশ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া ফেলিল।

অসুখ সংবাদে শ্বাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া চিঠি দিয়াছেন। সে চিঠিও সুরেশ পড়িল।

সুরবালার চিঠি সুরবালার নিজের হাতের লেখা। সুতরাং চিঠির সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কবিবার অবসর সুরেশের রহিল না।

স্নেহাশ্রয়, নীতিধর্ম্ম, সব পদদলিত করিয়া শেষে এই কাণ্ড করিয়া বসিল সুরবালা!

সুরেশ মর্ম্মান্তিক ভাবে এই কথাটা ভাবিল। এ যে একেবারেই অসম্ভব!

ছি, ছি, এ যে অতি ঘৃণিত জিনিস। আর ভবনাথ! সেই কিনা এত বড় সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিল!

সুরেশের সাম্‌নে হইতে বিশ্বসংসার মুছিয়া গেল।

আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! বড়ই অদ্ভুত! না, না, সে স্বপ্ন দেখিতেছে! সুরবালা! সতী লক্ষ্মী সুরবালা!

সে-ই এই কাজ করিয়া বসিবে!

অসম্ভব!

কিন্তু সন্দেহ থাকে কোথায়?

আবার চিঠি পড়িয়া দেখিল সুরেশ ঘন দুরাশার আঁধারে একটা আশার আলো আবিষ্কার করিবার জন্য। কিন্তু স্পষ্ট কালির অক্ষরে নিজের হাতে লিখিয়া রাখিয়াছে সুরবালা সেই নিদারুণ ঘটনাটা।

বোঁ বোঁ করিয়া সুরেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা তাহার চোখের সাম্‌নে পাক খাইয়া আসিল। পায়ের নীচের মেঝে জোর কাঁপুনিতে কাঁপিয়া উঠিল।

বিষম ব্যথায় সুরেশের কপাল ঘামিয়া গেল। সেই ঘাম তাহার চিবুক চোয়াইয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়িতে লাগিল। সেই ঘাম সে হাত দিয়া মুছিল। ঘামে হাত ভিজিয়া গেল। বড় ব্যথা হৃদয়ের! উঃ! তাহার হৃৎপিণ্ডটা সহসা কে যেন মোচড়াইয়া দিল।

চাকর আসিয়া ডাকিল, বাবু চা হয়েছে।

সুরেশ উত্তর করিল না।

চাকর আবার বলিল, চা হয়েছে বাবু।

সুরেশ উত্তর করিল না, চাকর চলিয়া গেল।

দস্তখতের জন্য কোম্পানীর পিওন আসিল। সুরেশ কম্পিত হস্তে যে দস্তখত করিল তাহা তাহার দস্তখত বলিয়া কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না।

আজ সুরেশ কিছু খাইল না।

সকালে বসিয়া ছিল সে কপালে হাত দিয়া, বিকালে চাকরেরা তাহাকে সেই ভাবেই বসিয়া থাকিতে দেখিল।

বিকালে টেলিগ্রাম লইয়া পিওন ঘরে ঢুকিল। রাজশেখর বাবু টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র চলিয়া আইস, সুরবালাকে পাওয়া গিয়াছে।

আর সুরবালা! সুরেশ ভাবিল, রাজশেখর বাবু সব কথা জানেন না।

তখনই সে রাজশেখর বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া দিল, তাহার যাওয়া অসম্ভব।

দুইখানি চিঠিই সে শ্বাশুরীকে পাঠাইয়া দিল। শুধু পাঠাইয়াই দিল, নিজে কোন কথা লিখিল না।

চিঠি পাঠানোর পর ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সেই গরমের দিনে এক মোটা চাদর দিয়া আপাদ মস্তক ঢাকিয়া সে বিছানার উপর সটান শুইয়া পড়িল।

শুইবার আগে 'কেউ যেন আমায় না ডাকে' এই বলিয়া কড়া হুকুম দিল।

মোটা চাদরের নীচে তাহার ঘুম আসিল না। সে অসহ্য ব্যথায় হৃদয়ের অসহায় কাতরতায় বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রিও কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ভয়ানক বিপর্য্যয়ের ভাবে সে হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল, কেষ্ট, কেষ্ট।

চাকর কেষ্ট আসিয়া দেখিল বাবুর চোখ অসম্ভব রকমে লাল হইয়া গিয়াছে।

সুরেশ বলিল, এই চিঠিখানা রমেন বাবুকে দিবি, বুঝলি? বুঝলি রমেন বাবুকে দিবি? রমেন বাবু! চিনিস্ তো?

—হাঁ, চিনি বাবু।

—তারপর কি করবি শুন্‌লি? এসে আমার জিনিষপত্রগুলি গুছিয়ে রাখবি।

কেষ্ট বলিল, বাবু যাবেন কোথায়ও?

—হাঁ।

—কোথায়?

সুরেশ উত্তর করিল না।

রমেন বাবু কোম্পানীর একজন পদস্থ ডিরেক্টর। সুরেশ তাঁহাকে লিখিল :—

রমেন বাবু,

আমি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করিলাম। পারেন যদি কোম্পানী চালাইবেন। না হয় উঠাইয়া দিবেন। হঠাৎ অনেকদিনের জন্য আমি চেঞ্জে চলিলাম।

আপনার—

সুরেশ রায়

কেষ্ট ফিরিয়া আসিবার পর পরই রমেন বাবুকে দেখা করিবার অবসর না দিয়া সে হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। সব শেষ হইয়া গেল, কোম্পানী, স্বাধীন জীবিকা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব।

(৪৫)

কানাকানিতে পাড়ায় রটিয়া গেল পরেশ বাবুর খেলওয়ার মেয়ে কুমুদিনী রাগ করিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ায় জোর আলোচনা চলিতে লাগিল।

সে দীপ্ত অভিমানে হাতে গামছা ঝুলাইয়া মায়ের সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত। পথে রামী, বামী, তরুলতা, কাদম্বিনী, হেমপ্রভা, কনকলতা, রেখা, ইলা, মীরা—কেহবা খোলা মাথায় শুধু হাতে, কেহবা খোলা মাথায় কলসী কাঁখে করিয়া, কেহবা ঘোমটা দিয়া মাথা ঢাকিয়া সেই ঘোমটার তল দিয়া উদ্ধত বড়লোকের মেয়ে কুমুদিনীর দিকে তাকাইয়া মনে করিত, ছি, ছি, এত বড় মেয়ে স্বামীর ঘর করে না! ধিক্

লেখাপড়ায়! ধিক্ টাকা পয়সায়! হিংসার জ্বালায় তাহারা এইরূপ ভাবিত। হিংসার জ্বালায় কুমুদিনী চলিয়া গেলে তাহারা বলাবলি ও প্রায় মুখে মুখে মুখ লাগাইয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িয়া পড়িয়া কানাকানি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিত।

এ বাড়ী হইতে মোক্ষদা ঝি ও বাড়ীর মানদা ঝিকে ডাকিয়া বলিল, ও মানদা দিদি, শোননি, পরেশ বাবুর মেয়ের কথা? কুম্যাদিনীর কথা?

মানদা উত্তর করিল, শুনেছি। ওরূপ যে হবে তা আগেই জানি।

বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা দলে দলে পরেশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া গায়ে পড়িয়া কুমুদিনীর মাকে বলিতেন, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে ও। তারা পুরুষ মানুষ। তারা সহ্য করবে কেন?

কুমুদিনী ঝগড়া করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা নিরস্ত হন না।

কুমুদিনীর মা বুঝিয়াও বুঝেন না। সুলতা দিদিকে বলেন, আমি তো এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে, মেয়েও তো কিছু বলে না।

সুলতা দিদি বুঝ মানেন না, কুমুদিনীর এই দুঃসময়ে বিষাক্ত উপদেশ দিয়া হুল ফুটাইতে ছাড়েন না।

সুরমা মেয়েকে বলেন, আর পারিই নে যে এদের জ্বালায়।

কুমুদিনী পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলে না।

পরেশ আসিয়া বলেন, বল না মা, কি হয়েছে। আর যে সহ্য হয় না।

কুমুদিনী বলে, মোটেই কিছু হয় নি।

পরেশ বলেন, হিংসুটে ব্যাটারা! হিংসেয় জ্বলে মরছে হারামজাদারা।

প্রথম প্রথম নিজের অহঙ্কারের দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহিলেও পরে আলোচনার বিষয়গুলি কুমুদিনীকে চাপিয়া ধরিল। তখন ঐগুলি তাহার

নিকট সংসারটাকে আগামস্ব করিয়া তুলিল। সে বিষম সঙ্কটে পড়িয়া কেবলই ভাবিয়া চলিল, আর যে পারিইনে, কোথায় পালিয়ে যাই।

আজ দুপুরে সে একখানা আয়না সাম্‌নে করিয়া বসিয়া আছে। মাতা অন্য ঘরে নিদ্রিত আছেন। পিতা কাচারীতে গিয়াছেন।

কুমুদিনী দেখিল মলিন হইলেও সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় তাহার মুখখানি জ্বল জ্বল করিতেছে। হাতখানির দিকে চাহিয়া দেখিল উহা আগের মতই সুগোল রহিয়াছে, সৌন্দর্য্য হারায় নাই। আগের মতনই হাতে সোনার চুড়ির গোছা আঁটিয়া আছে। চাহিয়া দেখিল দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলানো ড্রেসিং টেবিলের উপরে তাহার নিজের চেহারার তৈলচিত্রখানি ভরপুর উজ্জ্বলতায় জ্বল জ্বল করিতেছে ও তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

গ্রীষ্মের দুপুর বেলা। বেজায় গরম পড়িয়াছে। ঘরের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া গরম বাতাস বহিয়া যাইতেছে। কুমুদিনীর মনে হইতেছিল সেই হাওয়ার সমস্ত উত্তাপ যেন তাহার শরীরের সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, ফলে তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিছানায় গিয়া শুইল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

মাতার ইতিমধ্যেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বলিলেন, কুমু মা, দুঃখ করিস্‌নে মা, সব দুঃখ তোর কেটে যাবে মা।

মায়ের এই স্নেহের কথাও কুমুদিনীর হৃদয়ে গিয়া রূঢ় হইয়া বাজিল। মনে হইল, না, না, এ সংসারে তাহার কেউ নাই।

কুমুদিনী ভাবিল মরণ কি তাহার পক্ষে ভাল? মরিলে কি সবই

ফুরাইয়া যায়? মরিলে কি স্বামীর অত্যাচারের কথা মন হইতে মুছিয়া যায়?

এতক্ষণে বিকাল হইয়াছিল। বাহিরে শব্দ হইল! কুমুদিনী বুঝিল পিতা কাচারী হইতে ফিরিয়াছেন।

পরেশ বাবু সুরমাকে বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। হাতমুখ ধুই। তারপর সব বল্‌ছি:

হাতমুখ ধোওয়ার পর তিনি বলিলেন, কুমু কেমন আছে? সুরমা বলিলেন, মাথার ব্যথা আজ একটু বেড়েছে।

—কোথায় সে?

—ঘরে ঘুমুচ্ছে।

—অপরাধ কি মাথা ব্যথার! বেটা হারামজাদা!

—কেন, কি হয়েছে?

—চুপ, চুপ, এখানে না। কুমু শুনবে! চল আমরা ঘরে যাই।

কুমুদিনী কিন্তু সব কথাই শুনিল। আরও কথা শুনিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ জন্মিল।

পিতার ঘরটা তাহার ঘরের সঙ্গে লাগা ছিল। মধ্যে দরজা ছিল। দরজা বন্ধ করা ছিল। সেই দরজায় কান ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ বলিলেন, আজ বুঝলেম কুমুর কি কষ্ট। উঃ! হারামজাদা বেটা!

—কেন?

—উঃ বল্‌তে বুক ফেটে যায়।

কুমুদিনীর মা আতঙ্কিত হইয়া বলিল, বল শীগগীর কি?

—চুপ, চুপ। আঃ! জোরে কথা বলো না! কুমু শুনবে যে!
ফিস্ ফিস্ স্বরে কথা চলিল, কিন্তু কুমুদিনী সব কথাই শুনিল।

পরেশ বলিলেন, শুনেছ মেয়েটা কি করেছে? সেই বদমাইস মেয়েটা? সেই তোমাদের সুরবালাটা?

—না তো?

—বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে!

পরেশ অসীম যন্ত্রনায় চাপা বিকৃত স্বরে বলিলেন, হাঁ, বেরিয়ে গেছে।

—সে কি!

—হাঁ, হাঁ, সে আবার কি? সত্যি, একেবারে খাঁটি সত্যি।

—বল কি? কার সঙ্গে?

—আর আবার কার সঙ্গে? তোমার গুণধর জামাই গো! তোমার গুণধর জামাইয়ের সঙ্গে! সেই ব্যাটা ভবনাথের সঙ্গে!

মহাতঙ্কে সুরমা বলিয়া উঠিলেন, ওমা, বল কি! প্রাণ যে কেঁপে ওঠে শুন্‌লে!

—প্রাণ তো কাঁপে! কি যে করেছি মেয়ের বাপ হয়ে! এক গ্লাস জল আন আগে। খাই। উঃ! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ভয়ানক ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে! এখনই ফিট হয়ে পড়বো! মরবো, মরবো আমি সব শালারা আমার পিছু লেগেছে! বাঁচতে দেবেনা শালারা আমাকে!

স্ত্রী যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত হাঁটিয়া গিয়া জল আনিলেন। নিঃশেষে চা-খোর পরেশ পুরা এক গ্লাস জল পান করিয়া 'ও' শব্দ করিয়া একটু শান্ত হইলেন।

কুমুদিনীর মা বলিলেন, বল কি? সুরবালা কল্‌কাতায় গিয়েছে

পরেশবাবু মুখ মুছিয়া জোরে টানিয়া টানিয়া চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কথা বলিয়া চলিলেন। কুমুদিনী যে শুনতে পারে একথা তাহার মনে রহিল না।

বলিলেন, অসুখের সংবাদ কলা! সব মিছে কথা! সব মিছে কথা পাজি মেয়েটার।

—মিছে কথা! বল কি! ওমা যাবো কোথায়। বুক যে কাঁপছে আমার তোমার কথা শুনে!

—হাঁ, মিছে কথা। মিছে কথা। হাতে পেলে দেখিয়ে দিতেম ব্যাটাকে।

পরেশ থামিয়া থামিয়া ঢোক গিলিয়া গিলিয়া সমস্ত ঘটনার কথা বলিলেন। বলিলেন আত্মীয় বোধে সুরবালার মা তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন। সুরবালার চিঠিও তিনি তাঁহাকে দিয়াছেন।

পরেশ বলিলেন, কি পরামর্শ দেব এখন বল তো। কি পরামর্শ দেব আমি!

চিঠি পড়িয়া কুমুদিনীর মা বিপর্যস্তের সুরে বলিলেন, বিশ্বেস হয় না আমার। এ হতেই পারে না কখনও।

পরেশ বিষাক্ত শ্লেষের সুরে বলিলেন, আর বিশ্বেস হয় না! উপায় কি আছে আর বিশ্বেস না করবার! উঃ, কি বদমাইস মেয়েটা!

সুরমা বলিলেন, না, না, তুমি অমন কথা বলো না। তোমার কথা জামাইটাই খারাপ ও নির্দোষ।

—বলবোনা। মেয়ে মানুষ তোমরা বোঝো কি? কত প্রেমের ঢলাঢলি চলেছে আগে তা জান কি? আর ওই জামাইটা। ওর জেলের ঘানি টান্‌তে হবে বলে দিলেম, যদি পরেশ চৌধুরী বেঁচে থাকে।

সুরমা বেপরওয়ার সুরে বলিয়া উঠিলেন, মেয়ে মানুষ বোঝে, বোঝে!

এই কথাটা বুঝলে এতটা ঘটত না। ওঃ! জামাই! ওঃ! ও-ই ভয়ানক। ওঃ! কার হাতে মেয়ে দিয়েছিলেম! ওঃ!

সন্ধ্যার সময় পিতা ঘরে ছিলেন না। সেই সময়ে চিঠিখানি সে পিতার বিছানার তল হইতে চুরি করিল।

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া চিঠি পড়িয়া সে ভাবিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পিতার উপর তাহার বিষম রাগ হইল। ভাবিল পিতা যদি এ বিবাহে সম্মতি না দিতেন তবে তাহার অদৃষ্টে এতটা ঘটিত না।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার ফিট হইয়া গেল।

ভাবিতে ভাবিতে অসীম হতাশায় নিজের ঘরে বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এই ফিটের কথা জানিতে পারিলেন না।

রেবা আসিয়া দেখিল সেই সন্ধ্যার আঁধারে অন্ধকার ঘরে কুমুদিনী ফিট হইয়া আরাম কেদারায় পড়িয়া আছে। ইলেক্‌ট্রিক সুইচ টিপিলে আলো হইল, কলের পাখা ঘুরিতে লাগিল। রেবা মাথার কাছে চেয়ারে বসিয়া কুমুদিনীর মাথা টিপিয়া ধরিল।

কুমুদিনী কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া রেবাকে দেখিয়া বলিল, কে? রেবা? এসেছিস্?

—এসেছি ভাই।

থাক্ কিছুক্ষণ। ওঃ, কিছুই ভাল লাগে না! বুক ফেটে গেল!

রেবা কুমুদিনীর আগের সব কথাই জানে।

বলিল, একটু ঘুমো কুমু।

কুমুদিনী বলিল, ঘুম! ঘুম কোথায় রেবা? আমার কি ঘুমোনোর জো আছে?

কিছুক্ষণ পরে ভীষণ অস্থির হইয়া উঠিয়া বলিল, মরবো, মরবো রেবা! আর আমার অন্য গতি নেই। উঃ, আর বাঁচলেম না।

এই কথা বলিতে বলিতে কুমুদিনী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। পরে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া জরাক্রান্ত উত্তেজনার চরম উৎক্ষেপের ন্যায় উৎক্ষেপে বলিল, আর যে সহ্য হয় না রেবা! সুরবালাকে নিয়ে পালিয়ে গেল শেষে ও! পালিয়ে গেল সুরবালাকে নিয়ে! সুরবালা! সুরবালাকে নিয়ে পালিয়ে গেল!

এই বলিয়া কুমুদিনী আবার তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তন্দ্রার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ ভাবে তাহাকে বলিতে শোনা গেল, সহ্য হয় না যে কিছুতেই।

পলায়নের কথাটা রেবা আগে শুনিবার সুযোগ পায় নাই। শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিরুপায় হইয়া কুমুদিনীকে তন্দ্রার অবস্থায় রাখিয়াই রেবা চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবার সময় সে জোরে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এইরূপ তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যে সময় কাটাইয়া দুপুর রাত্রিতে ঘনঘোর নির্জ্জনতার মধ্যে কুমুদিনী শেষ বারের জন্য জাগ্রত হইল। সদর রাস্তায় শববাহী চিৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল, হরিবোল!

শেষের হরিবোল ধ্বনির শেষ রেশটুকু এক ভয়াবহ ভৌতিক শব্দের রেশের মত জোরে উঠিয়া সেইরূপ ভৌতিক শব্দের মতই আকাশে মিলাইয়া গেল।

চমকিয়া উঠিয়া কুমুদিনী স্থির করিল, মৃত ব্যক্তি তাহার মতই দুঃখী ছিল; মরার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সব দুঃখ মিটিয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ ঝলকিয়া উঠিল তাহার মনে এক সাংঘাতিক সঙ্কল্প। মর্ম্মান্তিকতার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে সেই সংকল্প তাহার মনে হঠাৎ ভীষণ ভাবে দৃঢ় হইয়া গেল।

সে সঙ্কল্প করিল এখনই পদ্মায় ডুবিয়া মরিবে সে, তাহার বাঁচিয়া লাভ নাই।

তৎক্ষণাৎ সে শয্যাত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই সে উঠিয়া বাক্সের ভিতর হইতে সুরবালার সেই কার্ড সাইজের ফাটো বাহির করিল। পরক্ষণেই সে উহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই টুকরাগুলির উপর জোরে জোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সে দেশলাইয়ের আগুন জ্বালাইয়া টুকরাগুলি পোড়াইয়া দিল।

পাগলামির ঘোরেই মাতাকে জানানো প্রয়োজন মনে করিয়া সে মাতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। তাড়াতাড়ি অস্পষ্টভাবে এই কথা কয়েকটা সে লিখিল :—

মা, পদ্মায় ডুবিয়া মরিতে চলিলাম। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কুমুদিনী।

চিঠি লেখার সময় তাহার শরীর ভয়ানক ভাবে কাঁপিতেছিল।

চিঠি লেখার পর তাহার মনে একটুকু দুঃখ আসিবারও সুযোগ পাইল না। কোমলতার এক ফোঁটাও তাহার হৃদয়কে সিক্ত করিল না। ভয়ানক উগ্র প্রচণ্ডতায় কম্পিত অবস্থার মধ্যেই তাহার সমস্ত সত্ত্ব কঠিন হইয়া গেল।

ভৈরবের বিষাণ তাহার মনে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের শ্মশানে নাচিতে লাগিল ডাকিনী যোগিনী তাথৈ নৃত্যে, ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল শ্মশানের চিতার আগুন। চিতার ঘন ধূমে ধূমাইত আকাশে ফিরিতে লাগিল শ্মশানের ছেঁড়া কাঁথা উড়াইয়া প্রেতিনী বিকট উল্লাসে হি, হি হাস্য করিয়া।

ভয়ানক ব্যথায় তাঁহার মাথা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভাবিবার কোন শক্তি রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে সে কতকটা দম বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলিল ও সেইরূপ নিঃশব্দেই দরজা ভেজাইয়া দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পরে সদর রাস্তায় পড়িয়া সে সোজা ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

পরে পদ্মায় পৌঁছিবার সোজা পথ ধরিয়া যে প্রচণ্ড গতিতে চলিতে লাগিল সেই রাত্রির অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে, কখনও ঝোপের ধার দিয়া, কখনও গাছের তল দিয়া, কখনও বড় রাস্তার উপর দিয়া।

এক জায়গায় অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে গিয়া সে এক প্রাচীরের গায়ে হাঁটুতে লাগিয়া বিষম চোট পাইল। টাল সামলাইতে না পারিয়া সে উল্‌টিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

পরক্ষণেই সে উঠিয়া মনের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া মরিয়া হইয়া ছুটিয়া চলিল।

এক সদর রাস্তায় পড়িয়া সে দেখিল একটা লোক হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

এক বাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় সেই বাড়ীর কুকুর হঠাৎ জোরে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

কুকুরের ডাক শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

পরে পদ্মার ধারে যে জায়গায় গিয়া সে উপস্থিত হইল সে জায়গায় নদী বাঁকা। স্রোতের ধাক্কা আসিয়া জোরে তীরে লাগিতেছে, আর সশব্দে পাড় ভাঙ্গিয়া বড় বড় মাটির চাপ গাছ পালা লইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিঃশব্দে কুমুদিনী সেই নদীতটে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

সে শুনিল দূরে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট সুপারি গাছগুলির ওপার হইতে কয়েকটা কাক মর্ম্মান্তিকভাবে থামিয়া থামিয়া ঝাঁকি দিয়া দিয়া তিন বার কা-আ, কা-আ, কা-আ করিয়া উঠিল।

কাকের ডাক থামিয়া শান্তি আসিলে বিশৃঙ্খলভাবে ডানায় ঝর ঝর শব্দ করিয়া একটি মাত্র পেচক তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল ও কর্কশ শব্দ করিয়া ডাকিয়া গেল।

পরক্ষণেই সে শুনিল পাশের বাড়ীর খড়ের চালের মাথার উপর বসিয়া হুতুম ধূ-ধূ-ধূ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

হুতুমের ডাক থামিয়া গেলে সমস্ত আকাশ বাতাস ভিন্ন করিয়া হঠাৎ খাটাস নিদারুণভাবে ডাকিয়া গেল, মাপ্, মাপ্।

ম্লান জ্যোৎস্না ভৌতিক একটা রঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। ধূসর পটভূমিকায় আঁকা অস্পষ্ট ছবির মত কুমুদিনীকে দেখা যাইতে লাগিল।

কুমুদিনী অবচেতনায় বিষম ভয় পাইল। একটু পরেই সে দুর্জ্জয় সাহস সঞ্চয় করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ডুবিয়া গেল ও কিছু পরেই তাহার ভবনাথের প্রতি মরণ-চিহ্নিত ভালবাসার নাটকের শেষ অঙ্ক জলের নীচে মর্ম্মান্তিক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সমাপ্ত হইয়া গেল।

(৪৬)

ধরা পড়িবার ভয়ে বিপ্লবী দলের লোকেরা যে কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। সুবিমলের লক্ষ্যভ্রষ্ট মনে বিষম ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছে।

সে গঙ্গার প্রবল বেগ দেখিয়াছে হরিদ্বারের উদ্যানে। ঘরের ভিতর বিছানার উপর শুইয়া সে জানালা দিয়া তাকাইয়া দার্জ্জিলিংয়ে আশ্চর্য্য মেঘের খেলা দেখিয়াছে। পুরীতে সে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিয়াছে। কিন্তু যে মনের স্থৈর্য্য সে লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহা সে পায় নাই।

এই অবস্থার মধ্যেও শৈলর কটাক্ষদৃষ্টির স্মৃতি তাহার মনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাকে দিশেহারা করিয়া দিবার উপক্রম করে; বাধা মানে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুবিমল একদিন পদ্মাতীরে উপস্থিত হইয়া ফোটা ফুলে ভরা এক বড় গাছের কাণ্ডে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইল।

তখন বিকাল হইয়াছে। অস্তগত সূর্য্যের লাল আলো নদীর জলের স্থানে স্থানে পাড়য়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দূরে মন্দগতিতে পাল তুলিয়া নৌকা আনমনে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিমল দেখিল দুইটি কৃষকের মেয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়া কলসী কাঁখে করিয়া নদীর ঘাটে জল লইতে আসিতেছে। নিকটে আসিলে স্পষ্ট বুঝা গেল তাহারা শাশুড়ী ও পুত্রবধূ।

উভয়ের অবয়বই পরিপুষ্ট। বধূর গায়ের রঙ গৌর, তাহার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ। তাহার শরীরের যৌবনশ্রী বিজলীর মত চঞ্চল ও দীপ্ত, তাহার প্রতি পদক্ষেপে চাপা আনন্দ উচ্ছলিত ভাবে তরঙ্গায়িত।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বধূ ঘোমটার তল দিয়া সুবিমলকে হঠাৎ দেখিয়া ভয়ানক চমকিত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি টান দিয়া বেশী করিয়া ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে জোরে হাঁটিয়া শাশুড়ীর পাশে আসিয়া পৌঁছিয়া চলিতে লাগিল। পরে জলের ধারে পৌঁছিয়া কলসী নামাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় ঘোমটা পিছনে টানিয়া দিল ও যেটুকু ঘোমটা বর্ত্তমান রহিল তাহার তল দিয়া আড়চোখে সঙ্কোচজড়িত কাঁচা

বয়সের কাঁচাদৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন সুবিমলের দিকে চাহিতে লাগিল।

জল ভরিবার সময় শাশুড়ীর অলক্ষ্যে পুনরায় সে সঙ্কোচ-মধুর আবেগ-বিহ্বল ক্ষিপ্র দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করিতে লাগিল ও পরে ফিক্ করিয়া ছোট হাসি হাসিয়া উঠিয়া জল ভরিল।

জল ভরা শেষ হইলে সে কলসী ঝাঁকি দিয়া কাঁখে তুলিয়া লইয়া সুবিমলের দিকে সোজা হইয়া দাঁড়াইল ও ঘোমটা টানিয়া দিল। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ হেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘোমটার তল দিয়া প্রবল আক্রমণে নির্লজ্জ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুবিমলের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ঘাটের উপর সমতল পথে চলিবার সময় সে চলিতে লাগিল তাহার সুদৃঢ় অবয়বে জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়া দিয়া। সেই সরম-জড়িত, সুদৃঢ়-যৌবনা প্রাণ-ভরা নারীমূর্ত্তি চলিতে লাগিল ঢলিয়া-পড়া, উড়িয়া-চলা, গলিয়া-পড়া-ছন্দে, তাহার ঠেলিয়া-ওঠা হাসি কাপড়ের আঁচল মুখে গুঁজিয়া কোনও ক্রমে মুহুর্মুহু রুদ্ধ করিয়া ও যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত ফিরিয়া ফিরিয়া সুবিমলের দিকে তীব্র ঝলক হানিয়া হানিয়া।

মুনির মনও টলে এই দৃশ্যে। সুবিমলের আলগা মন প্রবল ধাক্কায় টলিয়া গেল। বিদ্যুৎ যেমন নিমেষের মধ্যে ঝলকিয়া উঠে, সুবিমলের মনও সেইরূপ নিমেষের মধ্যে ঝলকিয়া উঠিল।

ভদ্রতার খাতিরে শিক্ষিত যুবক সুবিমলের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবহার ও সুরুচির কথা সে সময় তাহার মনে ছিল না।

এই মোহের ভিতরও সে খোলাখুলিভাবে বধূর দিকে চাহিতে পারিল না। সেই বিজন সান্ধ্য আবেষ্টনের মধ্যে সমাজচক্ষুর অন্তরালে

তাহাকে বাধা দিবার কেহই ছিল না, তথাপি তাহার ভগ্নহৃদয়ে পূর্ব্বের কঠোর সংযমের যেটুকু রেশ এখনও বর্ত্তমান ছিল, উহা তাহাকে বেপরওয়া বেহায়া-পনা হইতে একটু দূরে সরাইয়া রাখিল। সে অপাঙ্গদৃষ্টিতে ঘন ঘন বধূর দিকে চাহিতে লাগিল ও তাহার হৃদয়ের ঠেলিয়া-ওঠা উন্মত্তাকে সে মুহুর্মুহু নিরুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। ফলে মনটা নিরঙ্কুশ ভাবে পাগল হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু উহার পাগল হইবার বেশী বিলম্ব রহিল না। পরিশেষে বধূ এক শেষ দৃষ্টি হানিয়া ফিক্ করিয়া আবার হাসিয়া উঠিয়া মাঠের শেষের বৃক্ষলতার সবুজে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোহিনীর মায়া মিলাইয়া গেল।

বধূ চলিয়া গেলে পর সুবিমল নিজের অজ্ঞাতে সেই মায়ার উন্মত্ততায় অনেকক্ষণ ডুবিয়া রহিল। যখন সময়ের শেষে সেই উন্মত্ততার ঢেউ ঊর্দ্ধে উঠিবার পর পরিশেষে সমতলে নামিয়া আসিল তখন সে আস্থাটা বিচারবুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। এখন সে বুঝিতে পারিল যাহাকে লোকে দুশ্চরিত্রতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে সেই গ্লানিকর অবস্থাতে গিয়া সে পড়িয়াছে ও নিজের প্রতিষ্ঠা নিজের কাছে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ভিতরের উদগ্র প্রচণ্ডতায় জাগ্রত হইয়া উঠিল ও নিজেকে বারম্বার ধিক্কার দিয়া পরিশেষে প্রবল সংকল্পে সংকল্প করিল যে সে অবিলম্বে কাশী চলিয়া যাইবে ও কঠোর সংযম-সাধনার দ্বারা এই দুষ্প্রবৃত্তিকে মন হইতে সম্পূর্ণ ভাবে উৎখতি করিয়া দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সে দেশে ফিরিবে না।

কুমুদিনীর পলায়নের পরের দিন সকালেই পরেশ বাবুর বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

সমস্ত সকালটা পরেশ চাকর ঠাকুরের উপর উচ্চ হাঁক ডাক আরম্ভ করিয়া দিলেন। যখন তাহারা খুঁজিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদিকে কোথাও পাওয়া গেল না তখন পরেশ স্বয়ং চাদর কাঁধে ফেলিয়া দিয়া 'আশ্চর্য্য মেয়ে', 'বড় অন্যায় করেছি ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে', কথাগুলি বিষম বিরক্তিতে বলিতে বলিতে খোঁজে বাহির হইয়া গেলেন। সহরময় খুঁজিয়া যখন বেলা দুপুরে তিনি বিষণ্ণমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন সুরমা ভয়ানক উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পাওয়া গেল ?

পরেশ বলিল, নাঃ, কোথায় গেল যে পাগলী মেয়ে! ন্যাখো তো!

—কোথায় আর যাবে! নেই ও আর ও!

এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরেশ কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না যে মেয়ে আত্মহত্যা করিতে পারে। স্ত্রীকে বলিলেন, নিশ্চয় কোথায়ও কোন বন্ধুর বাড়ীতে আছে ও। তুমি ভেব না! আছে কোথায়ও।

ইতিমধ্যে চাকর বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বলিল, বাবু দিদি ফিরে আসছেন।

পরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এ্যাঁ, বলিস কি ? কোথায় ?

—বাহিরে গিয়ে দেখুন।

দূরে রাস্তার বাঁকে কুমুদিনীর মত একটি মেয়েকে আসিতে দেখা গেল।

পরেশ সত্যটা স্থিরভাবে বিচার না করিয়া বাড়ীর ভি দৌড়াই আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, যাক্, আসছে ফিরে বাঁচা গেল! কি বিপদেই পড়েছিলেম।

কুমুদিনীর মা বলিলেন, এসেছে! যাই গিয়ে দেখি ওঃ!

পরে অসীম কৌতুহলে বাহিরে গিয়া দেখিয়াই বুঝিলেন. ও মেয়ে কুমুদিনী নয়।

ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জোরে কান্না সুরু করিয়া দিলেন। বলিলেন, ঠিকই বলেছি আমি। রাত করে বেরিয়ে গেছে ও। নেই ও আর। উঃ, কি যে হচ্ছে আমার বুকে! মা কালী! হে অন্তর্যামী ভগবান! আর যে দাঁড়াতে পারছিনে না!

পরেশ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, দুত্তোর, কিছুই বুঝিবে না! যাদের খোঁজে পাঠিয়েছি তারা ফিরে আসুক। দেখি তারা কি বলে।

—আর ফিরে আসা! যা হয়েছে তা আমি বুঝছি।

পরেশ বিরক্তির চরম সীমায় উঠিলেন। বলিলেন, দুত্তোর! কিছুই ভাল লাগে না আমার। মেয়ে মানুষ কিছুই বোঝে না।

—বোঝে। তোমরাই বোঝ না। নেই ও।

—আঃ তোমার জ্বালায় যে জ্বলেই মলেম আমি!

কথার উত্তর দেওয়া হইল না। ইতিমধ্যে কুমুদিনীর মা কুমুদিনীর লেখা চিঠিখানি বাক্সর ভিতরে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। বাক্সের ভিতরই উহা পড়িয়া তিনি ফিট হইয়া ঘরের মার্ব্বেলের মেঝেতে পড়িয়া গেলেন।

চিঠির কথাটা পরেশের অগোচর রহিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সুরমা র ফিরিয়া পাইলেন তখন তিনি

চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ও কুমু, কোথায় গেলি মা! আমায় কেন নিয়ে গেলি না মা!

পরেশ বলিলেন, শুধু কাঁদ কেন? বল না কি হয়েছে? তোমাকে দিয়ে আমার একদিনের জন্তও শান্তি হল না।

স্বামীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতার ভাব এতদিন কুমুদিনীর মার মনে ক্ষীণ-ভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বিচ্ছিন্নভাবে উহা কচিৎ কখনও প্রকাশ পাইলেও উহা স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। আজকার ভয়ানক দুর্দ্দশার মধ্যে সেই বিরুদ্ধতা অসম্ভবভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কুমুদিনীর মা কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই মারমুখী ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমাকে দিয়েও আমার এক দণ্ডও শান্তি হল না। ওঃ! ভগবান, একি করলে! কুমু কোথায় গেলি আমায় ফেলে রেখে মা!

পরেশ মরিয়া হইয়া বলিলেন, হয়েছে কি বলই না?

কুমুদিনীর মা-ও চোখ কপালে তুলিয়া মরিয়ার ভাবে বলিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে বলছ? চোখের মাথা খেয়েছ কি? চিঠি পড়ে ভাখো কি লিখেছে সর্ব্বনাশী।

চিঠি পড়িয়া পরেশেরও ফিট হইবার উপক্রম হইল। তিনি ঘরের খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া খাটের হাতলের উপর মাথা রাখিয়া হৃৎপিণ্ড ডুবিয়া যাওয়ার ভাবটা রক্ষা করিলেন।

বিকাল বেলায় যখন স্বামী স্ত্রী কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন তখন পরেশের স্ত্রী উন্মত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ভাখো?

পরেশ বলিলেন, বল।

—যদি মেয়ের বাপ হও বুঝলে! বুঝলে যদি মেয়ের বাপ হও! বোঝ না ত তুমি কিছু।

—সব বুঝি, বুক ফেটে যাচ্ছে। বল কি বলবে তাড়াতাড়ি। যা বলবে তাই করবো।

—বেশ। প্রতিজ্ঞা কর এর প্রতিশোধ নেবেই। হাতে পেলে কেটে ফেলবে ওকে।

পরদিন থানার দারোগা পরেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ডাক শুনিয়াই পরেশ থানার দিকে রওনা হইলেন।

থানার নিকটে গিয়া তিনি দেখিলেন থানার মাঠে লোক জড় হইয়াছে। দেখিয়া তিনি মাতালের মত টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও ছোট সুরে বলিয়া চলিলেন, ওরে বাপরে! কোথায় আমি যাব রে!

দারোগা সাহেব সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনি ভিড় ঠেলিয়া সম্মানিত সেরেস্তাদার পরেশ বাবুর আসিবার পথ করিয়া দিলেন।

কন্যার মৃতদেহ দেখিয়াই 'ওরে মারে', 'দারোগা সাহেব আমার কি হল' এই দুইটি কথা মর্ম্মান্তিক ভাবে বলিয়া উঠিয়াই তিনি ফিট হইয়া পড়িয়া গেলেন

কুমুদিনীর মৃতদেহ মাঠে আনিয়া রাখা হইয়াছিল।

রাজসাহীর জেলের জালে ঐ মৃতদেহ বাধে। সংবাদ পাইয়া দারোগা সাহেব উহা লইয়া আসেন।

পুনঃ পুনঃ লোক সরাইয়া দেওয়া হইল, পুনঃ পুনঃ লোকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

দারোগা সাহেব আবার লোক ঠেলিয়া মুক্ত হাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

পরেশ মাথা তুলিতে পারিলেন না। আগের ভাবেই পড়িয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে পরেশকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া লইয়া খেলার মাঠের এক খোলা জায়গায় এক আরাম কেদারায় শোয়াইয়া রাখা হইল।

মরণের পূর্ব্বে কুমুদিনী নীল শাড়ী পরিয়া ছিল। শরীরের চারিদিকে শাড়ীর আঁচল ঘুরাইয়া দিয়া উহা জোরে কোমরে বাঁধিয়াছিল সে। এখনও সেই শাড়ী সেইরূপ ভাবেই পরাণ আছে; সেই আঁচল সেইরূপ ভাবেই বাঁধা আছে। শাড়ীটা কাদা ও ক্লেদ লাগিয়া কদর্য্যভাবে অপরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ঠোঁট দুটী ভয়ানকভাবে সাদা ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মুখ অসম্ভব রকমে স্ফীত হইয়া গিয়াছে।

(৪৮)

ভবনাথ স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার কাজের ফলে পরেশের পরিবারের এক ভয়ানক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাইবে। স্বপ্নেও ভাবে নাই সে সামান্য একজন স্ত্রীলোক সুরবালা নিজের প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করিয়া ভয়ানক এক কাণ্ড করিয়া বসিবে।

চিরকাল ভবনাথ টাকা, আনা, পয়সার কথাই ভাবিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির কল্পনাও সে করিয়া আসিয়াছে শুধুমাত্র ঐ টাকা আনার মাপ কাঠিতে। কোনও দিনও তাহার ধারণা করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই যে মানুষ চরম অবস্থায় পড়িয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে।

সে আশ্চর্য্য হইল এই চিন্তা করিয়া কেমন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গাড়ীর ড্রাইভারের কৌতূহলী প্রশ্নের সামনে সে টিঁকিয়া ছিল।

সে তাহার পরিকল্পনাটা গড়িয়া তুলিয়াছিল মনোযোগের সঙ্গে

সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিকের মত। সে ঠাণ্ডা গণনা তৎপর মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি দিয়া উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তাহার সেই পরিকল্পনা ঠিক ঠিকভাবেই বিনা বাধায় সম্পাদিত হইয়া যাইবে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা পর্য্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাকে জোরের ধাক্কায় একদম বেশামাল করিয়া দিল। কিন্তু উপস্থিত সঙ্কটে মানসিক বিপর্য্যায় নিদারুণ হইলেও সেই বেসামাল ভাবটাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। সে সংকল্পকে কঠিন করিয়া অত্যন্ত ডাকাতের বেপরওয়াভাব গ্রহণ করিয়া বলিতে বাধ্য হইল। ইহাতে পরিস্থিতির অসহায় ভাবটা তাহার মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে অনুক্ষণ ঠেলিয়া উঠিতে ছিল। তখনি সে মনটাকে পাথরের মত কঠিন করিয়া ভাবগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপিয়া দিয়া সেই কঠিন পাথরের আবরণের উপর দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। এই নিদারুণ অবস্থায় তাহার সুরবালার প্রতি কুকুর কুকুরীর উন্মত্ত মত্ততা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। শুধু তাহাই নহে সুরবালার যে কি হইল তাহা সে একবারও ভাবিবার অবসর পাইল না।

সে ভাবিল পলায়নের ব্যাপারে সুরেশ মর্ম্মান্তিক প্রতিহিংসায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে ও তাহাকে আদালতের কাটগড়ায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সে ভাবিল সুরেশ অবিলম্বে পুলিশে খবর দিয়া আগে তাহার কলিকাতায় ঘাঁটিগুলির সন্ধান করিবে। কলিকাতায় সে যেখানেও থাকুক না কেন পুলিশ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া সে কতকটা পেরেগ আঁটা অবস্থায় গাড়ীর বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিল। পরে সে স্থির করিল যে সে কলিকাতার দিকে আদৌ যাইবে না। সে মুর্শিদাবাদ

লাইন ধরিয়া চলিয়া পরিশেষে বোম্বাই গিয়া উপস্থিত হইবে ও সেখানকার ব্যাঙ্কের সাহায্যে স্বচ্ছন্দে সুদীর্ঘকাল সে-গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিবে ও গোলমাল মিটিয়া যাইবার অবস্থা হইলে সে বহাল তবিয়াতে আবার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে।

উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া ভবনাথ আসস্ত হইল। কিছুই ঘটে নাই এই ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিরুণী দিয়া আবিন্তস্ত চুলটা আঁচরাইয়া লইয়া আগের মতই ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ট্রেণের কামড়ার মেঝের উপর দাঁড়াইয়া সে তাহার পাঞ্জাবীর ভাঁজগুলি ঠিক করিয়া দিল ও রুমাল দিয়া জুতার ধূলি ঝাড়িয়া উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। বিপদের মধ্যেই থাকিবার দৃঢ় সংকল্পে সে পুনরায় বেঞ্চির উপর স্থির হইয়া বসিল।

রাণাঘাট ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া সে মুর্শিদাবাদ লাইনে যাত্রা করিল ও কয়েক ঘণ্টা পরেই লালগোলা ঘাটে নদী পার হইয়া গোদাগাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। গোদাগাড়ীতে পুনরায় গাড়ী ধরিয়া সে কাটিহার ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিল।

কাটিহার ষ্টেশনে পৌছিবার পর পরই তাহার কৃত্রিম সাহস চলিয়া গেল ও পূর্ব্বেকার অসহায়তার ধারণা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে অবলম্বন করিতে চাহিলেও মন মোটেই সহজ হইতে চাহিল না। কি যেন একটা ভয়ানক ব্যাপার জীবনে ঘটিয়া গিয়াছে যাহা তাহার বর্ত্তমান জীবনটাকে অতীতের জীবন হইতে একদম বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। সে ষ্টেশনের গাছপালার দিকে চাহিয়া দেখিল। সেগুলি তাহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সহজভাবে দেখা দিল না। একটা প্রচণ্ড কুহেলিকায় ঢাকা হইয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহার সামনে উপস্থিত হইল। ফলে আগেকার মত সহজ হইবার চেষ্টা সত্বেও তাহার বর্ত্তমান জীবন শূন্যতায় ভরিয়া গেল।

যখন সে তাহার আকাঙ্ক্ষিত গাড়ীর অপেক্ষায় ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়াছিল তখন তাহার বিরুদ্ধচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার গুরুতর অপরাধের জ্ঞান তাহার মনকে পাইয়া বসিল। সে কয়েকবার উঠিয়া গিয়া ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমে দ্রুত পাইচারি করিয়া বেড়াইল কিন্তু নিদারুণ স্মৃতিটা সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। সে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিলেও মন তাহার জন্য কারাগার প্রস্তুত করিয়া ফেলিল ও তাহাকে সেই কারাগারে অসহনীয় অবস্থার মধ্যে বন্দী হইতে হইল। সে উন্মত্তভাবে সেই কারাগার হইতে বাহির হইতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু কুলুপ কঠিন লোহার তৈরি হওয়ায় সে উহা ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিত পারিল না।

এখন তাহার ভয় আসিয়া জুটিল। সে ভাবিল সুরেশ কিছুতেই নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া নাই; সে ইতিমধ্যেই পুলিশে সংবাদ দিয়া কড়া মনোযোগের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পুলিশও তৎপর হইয়া রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় সে ভাবিতে পারিল না যে রাজসাহী হইতে লেখা চিঠি সুরেশ এত সকালে পাইতে পারে না, আর পাইলেও পুলিশ তাহার কাটিহার ষ্টেশনের অজ্ঞাত আবাস অত দ্রুত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।

যাহারা প্রথম অপরাধ করে সেইরূপ অপরাধী হাজার চেষ্টা করিলেও ধাঁধার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। কর্ত্তব্য বোধ ত তাহার মনে লুপ্ত হইয়া যায়ই তাছাড়া অসম্ভব অমূলক আশঙ্কা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসে। যেখানে তাহার কোন শত্রু নাই, সেখানে তাহার শত্রু আছে বলিয়া কল্পনা করে ও অনেক সময় নিজের শান্তি হইতে নিজেই অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পুলিশের হাতে যাচিয়া আত্মসমর্পণ করে। খুনী আসামীকে হত মানুষের

মৃতদেহের সামনে লইয়া গেলে সে প্রায়ই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, অনিরুদ্ধ একটা করুণা ও অপরাধের ভাব তাহাকে পাইয়া বসে ও সে নিজের রচিত ফাঁদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পুলিশে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। ফলে তাহাকে ফাঁসী কাঠে ঝুলিতে হয়।

ভবনাথের মনেও কাটিহার ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া ধাঁধা আসিয়া জুটিল। ষ্টেশন ঘরে একজন দারোগাকে সে প্রবেশ করিতে দেখিল ও পরক্ষণেই সে যেন শুনিল যেন ষ্টেশন ঘরের মধ্যে তাহার নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইতেছে। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কের শক্তি এলো মেলো হইয়া গেল। বিষম উৎকণ্ঠায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া গেল। প্রকৃত ব্যাপারটাকে বুঝিবার জন্য সে মনের বিশৃঙ্খল বিদ্রোহী ভাবগুলিকে নূতন ভাবে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিতে চাহিল বটে, কিন্তু উহারা সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত হইয়া উঠিল না; মনটা সম্পূর্ণভাবে স্থির হইল না বটে কিন্তু যতটা হইল তাহাতে ঘরের দিকে কান খাড়া করিয়া ধরা গেল। এবার ভবনাথ ধাঁধার ঘোরে স্পষ্ট শুনিল তাহার নাম ষ্টেশন ঘরের ভিতরে একাধিক লোকে বিষম গোল-যোগের সঙ্গে উচ্চারণ করিতেছে। বুঝা গেল সকলেই যেন বিষমভাবে উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে। ভবনাথের আশঙ্কায় প্রাণ উড়িয়া গেল। সে নিশ্চিত ধারণা করিল তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নিশ্চিত আয়োজন চলিতেছে। সে ধারণা করিল তাহার ভয়ানক কাজের কথা শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে ও নিদারুণ সংকল্পে তাহার পশ্চাদ্ধাবণ করিবার আয়োজন করিতেছে। সে ভয়ানক ভীত হইয়া বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া ষ্টেশনের বাহিরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে গিয়া দেখিল রাস্তার এক ধারে বসিয়া এক কঙ্কালসার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখিরি হাত বাড়াইয়া উচ্চ ক্রন্দনের সুরে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিতেছে। ভবনাথ এইদৃশ্য দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। কাল সাপ দেখিলে লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া যেমন ছুটিয়া পলাইয়া যায় সেইরূপ এই এই হতভাগ্যের কবল হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া ষ্টেশনের ভিতর পুনরায় সে ছুটিয়া প্রবেশ করিল ও সেখানে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পরে মনে একটু স্থিরভাব আসিলে সে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে কম্পিত পদবিক্ষেপে ষ্টেশন ঘরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ও যখন অসাধারণ প্রচেষ্টায় মন নিবিষ্ট করিয়া ঘরের লোকের প্রতি কথা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিল কথার বিষয় সে নহে তখন সে হৃষ্ট মনে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের বেঞ্চে বসিল ও নিজের দুর্ব্বলতাকে ধিকার দিয়া মনে বলিষ্ঠ সহজভাব ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্বের সন্দেহ তাহার মনে আবার অনাহুতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল ও সে পুনরায় পূর্ব্বের মত কম্পিত পদবিক্ষেপে এবার একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘরের খোলা দরজার সামনে একটু দূরে দাঁড়াইল। গিয়াই দেখিল সকলেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবার ভাব দেখাইতেছে। সে আতঙ্কিত হইয়া জড়ভাবাপন্ন মনে ধারণা করিল সুরবালাকে লইয়া পলায়নের হাস্যকর দিকটা লইয়া তাহারা আলোচনা করিতেছে। ভয়ে তাহার বুকে খিল ধরিবার উপক্রম করিল ও তাহার স্থানে সে স্থির অচল অটল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এক পা নড়িবারও সাধ্য রহিল না। সুদীর্ঘ-কাল পরে যখন সে বিষম চেষ্টায় বুঝিল হাসির বিষয় সে নহে। বিচ্ছিন্ন বিকার শক্তির দ্বারা যখন সে ধারণা করিতে পারিল যে তাহার অপরাধ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সে ইহার অনেক আগেই গ্রেপ্তার হইয়া যাইত তখন সে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

কিন্তু মনের হৃষ্টভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পুনরায় তাহার সমস্ত মানসিকতা জঞ্জালে ভরিয়া গিয়া সে দিশেহারা হইয়া গেল।

এই মনের অস্পষ্ট অবস্থায় সে জোরে জোরে ধারণা করিতে লাগিল সে এখন পলাইতে পারিলেই বাঁচে। সে সংকল্প করিল যে সে দূরে, বহুদূরে ছুটিয়া পলাইয়া যাইবে ও অতীত জীবনের ভয়ানক ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিবে।

প্লাট্‌ফরমে তাহার আকাঙ্ক্ষিত গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে সে তাড়াতাড়ি এক দূরের কামরায় উঠিয়া গিয়া বসিল ও আবার কিছুকাল পরে গাড়ীর প্রবল ঝাঁকুনি ও দুর্দ্দমনীয় অগ্রগতির চাঞ্চল্যে মনের পূর্ব্বের বেপরওয়া ভাব ফিরিয়া পাইল।

(৪১)

বোম্বাই পৌঁছিয়া সে প্রথম পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল। সে ভাবিল বহুদূরে বোম্বাই, সেখানে কেহই তাহার খোঁজ করিতে আসিবে না। কয়েকদিন আগেকার খবরের কাগজ সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। দেখিল কোনটাতেই সুরবালা সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইল এই ভাবিয়া যে এখানে তাহার ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত হোটেলে সে আশ্রয় লইয়াছিল একদিন দুপুরে আহারের পর যে ব্যাঙ্কে তাহার আঠারো হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল সেই ব্যাঙ্কের দিকে সে রওনা হইল। ব্যাঙ্কের বাড়ীর সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল ভিতর হইতে লোক চলাচলের বা কাজের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। পরিশেষে সে দেখিল ব্যাঙ্কের

বাহিরের বারান্দার মেঝেতে দেওয়ালের নোটিশ বোর্ডের নীচে একখানা ছাপানো কাগজ পড়িয়া আছে। কাগজখানি তুলিয়া লইয়া সে দেখিল উহাতে লেখা আছে যে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, ডিপজিটরগণ ইচ্ছা করিলে রিসিভার হিউজেস্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। নোটিশটা বোর্ডে আঁটা ছিল খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া যাওয়াটা যে কি ব্যাপার তাহা ভবনাথ বিলক্ষণ জানে। টাকা যে পাওয়া যাইবে না সে বিষয়ে ভবনাথ স্থির নিশ্চয় হইল। প্রবল একশূন্যতা আসিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎবুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া দিল। সে আড়ষ্ট হইয়া ভাবিল বেশী টাকা দিয়া সে কি করিবে? অপর এক ব্যাঙ্ক এখনও তাহার সাত হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। সেই টাকার সাহায্যেই সে সুদীর্ঘকাল দেশবিদেশে গা ঢাকা দিয়া পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতে পারিবে।

সে স্থির করিল যে সে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে না কিছুতেই। সে জায়গায় জায়গায় রেল পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

ইহার কিছুদিন পরে মাদ্রাজের রেলপথে ঘুরিবার সময় একদিন ইণ্টার ক্লাসের কামরায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল।

এই সব রেল পথে বাঙালীর সংখ্যা কম থাকায় যে কয়েকজন বাঙালী থাকে তাহাদের ভিতর ভাব জমিয়া উঠে।

আলাপ জমিয়া উঠিলে ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ভবনাথ জানিতে পারিল ভদ্রলোকের নাম বিমল মুখোপাধ্যায়। তিনি পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট রাজশেখর বাবুর ছোট ভাই। রাজশেখর বাবু ভবনাথের অপরিচিত নহে সুতরাং নাম শুনিয়াই সে তাহাকে চিনিল।

ভদ্রলোক পুলিশ সব্‌ইনেস্পেক্টর, এখন ছুটিতে আছেন, হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য ওয়ালটেয়ার চলিয়াছেন।

বিমলবাবু বলিলেন, পাবনার খবর জানেন মশাই।

ভবনাথ বলিল, না।

—সুরেশবাবুর নাম শুনেছেন মশাই? সুরেশবাবু? ইংরাজীর ফার্ষ্ট ক্লাস এম. এ.।

ভবনাথ বুঝিল সে আচম্বিতে এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে।

অসাধারণ কঠোরতায় মেজাজের সমতা রক্ষা করিয়া সে বলিল, না চিনিনে তো।

—হাঁ চিনবেন কি করে মশাই! বড় একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে ওঁর জীবনে। খবরের কাগজে প্রকাশ পায়নি জানবেন কি করে?

বিমলবাবু ঘটনাটা আগাগোড়া বলিয়া গেলেন। কুমুদিনীর আত্মহত্যার কথাও তিনি বাদ দিলেন না।

ভবনাথ বর্ত্তমান অবস্থায় বিস্মিত হইতে পারে না। সে দৃঢ়ভাবে নিজের মনকে ধরিয়া রাখিয়া সহজভাব রক্ষা করিয়া চলিল।

কাহিনী শেষ হইলে ভবনাথ বলিল, এখন কোথায় তিনি?

সুরেশবাবু?

—তিনি দেশত্যাগী হয়েছেন।

—সুরবালা কোথায়?

—তিনি দাদার বাসায়ই আছেন।

—দাদা মানে রাজশেখর বাবু।

—হাঁ।

—আমার তো মনে হয় ধরা পড়বে না ভবনাথ। যে চালাক সে!

ইনেস্পেক্টর জোরে বলিয়া উঠিলেন, শুধু চালাক হলেই হয় না মশাই। ধরা পড়তো না যদি দাদা না থাকতেন, আমি না থাকতেম।

কি করবেন আপনি ?

—কি করবো বলছেন। আমাকে চিনেন না আপনি। বিমল মুখোপাধ্যায় নামজাদা পুলিশ অফিসার মশাই। চোর, ডাকাত, বাটপারের যম সে। দাঁড়ান। ছুটিতে আছি। join করি আগে। তারপর দেখবো বদমাইসটা যায় কোথায় মশাই। ইংরেজ রাজত্ব এখনও আছে মশাই। বড় কড়া শাসন, very hard মশাই।

কি করে চিনবেন তাকে ?

—চিনবো। হাঃ, হাঃ। মস্ত কথা বল্লেন মশাই। ফটো রয়েছে যে আমার কাছে।

—কি করে পেলেন ফটো ?

—দাদা পাঠিয়েছেন, পেয়েছি।

তিনি কি করে পেলেন ?

পরেশবাবু পাঠিয়েছিলেন দাদাকে। বিয়ের সময় যে বদমাইসটার ফটো নেওয়া হয়েছিল। দাদা পুলিশকে এক কপি পাঠিয়েছেন। পুলিশ ঐ কপি থেকে আরও অনেক কপি তৈরি করেছে।

—ভবনাথ যেমন চালাক, সে নিশ্চয়ই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। আপনারা তাকে কিছুতেই ধরতে পারবেন না।

পুলিশ ইনেস্পেক্টর হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া সশব্দে বলিলেন, আলবৎ পারবো মশাই। পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে কিসের জন্য ? তাকে ধরবো, মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেব, পরে জেলে পুরবো। তখন বুঝবে ব্যাটা ঘরের বৌকে টেনে বার করা জিনিষটা কি ? যে সে ঘরের বৌ নয় মশাই ! ফার্ষ্ট ক্লাশ ইংরেজীর এম. এ. মশাই ! যাবে কোথায় পালিয়ে মশাই ! আগে ধরি। পাঁচশো বার ওঠাবো নাবাবো। ফিট হয়ে পড়ে যাইতে চাইবে মশাই। আলপিন ফুটিয়ে

দেব মশাই ওর নখের ভেতরে। শীতের রাতে জলে ডুবিয়ে রাখবো। রক্ত জমে যাবে। দম বন্ধ হয়ে মরতে চাইবে মশাই। চাবুকে পিঠের চামড়া খুলে দেব মশাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় ইনেস্পেক্টরের হুঙ্কারে ও অপরাধীর শাস্তির ভয়াবহ তালিকায় ভবনাথ বিপর্যাস্ত হইল না। সে অবিচলিত ভাবে রহিল, এত আয়োজন যখন করতে যাচ্ছেন, তখন সে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

ইনেস্পেক্টর বলিলেন, আলবৎ পড়বে।

মাদ্রাজ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ভবনাথ নামিয়া গেল।

বিমলবাবু গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়ানো ভবনাথকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, নমস্কার মশাই, মনে রাখবেন কিন্তু।

ভবনাথ বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় মনে রাখবো।

রাত্রিতে হোটেলে বিছানায় শুইয়া ভবনাথ এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল বিমল বাবুর দুই পা জোড়া লাগিয়া বিষধর কাল সাপের লেজে পরিণত হইয়া গেল ও তাঁহার শরীর ও মাথা কাল সাপের দেহ ও ফণাতে পরিণত হইল। সে মহাতঙ্কে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। কাল সাপও লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ভবনাথের যতটা জোরে দৌড় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ততটা জোরে সে দৌড় দিতে পারিতেছিল না। পরিশেষে কাল সাপ কাছে আসিয়া পড়িল। সে নিজকে বাঁচাইবার জন্য দুই হাত ডানার মত ব্যবহার করিয়া উড়িয়া চলিল, কিন্তু উড়িয়া তাহার যতদূর উর্দ্ধে উঠা প্রয়োজন ছিল ততটা উর্দ্ধে সে উঠিতে পারিল না। সাপও ফণা উঁচু করিয়া উঠাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। পরিশেষে সাপেরই জয় হইল। উহা তাহার নাগাল

ধরিয়া তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দংশন করা সাপের হইয়া উঠিল না। যখন হাত পা অসার হইয়া বিষমভাবে ভবনাথ মাটিতে পড়িয়া গেল, তখন সাপ সুরবালায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। ভবনাথ দেখিল সুরবালা মাটিতে পড়িয়া আছে ও সে একখানি ছোরা তাহার বুকে আমূল বসাইয়া দিয়াছে ও সুরবালার বুকের রক্ত স্রোতে সে যে জায়গায় পড়িয়াছে সেই জায়গা ভাসিয়া যাইতেছে।

ভবনাথ ঘুমের ঘোরেই বুঝিল ভয়ানক একটা অনুভূতি উপস্থিত হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে ও উহার স্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। তাহার জিভের উপর দিয়া টাইফয়েডের রোগীর জিভের মত পুরু ছাতা পড়িয়া গিয়াছে। জিভ অসাধারণভাবে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। তাহার দাঁতটা যেন কেহ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বাঁকা করিয়া রাখিয়াছে।

এই বিপত্তির মধ্যে সে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হইল না। অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় সে হৃদয়ের কঠিন ব্যথা প্রকাশ করিয়া একটানাভাবে সুদীর্ঘকাল গোঙরাইতে লাগিল ও পরে আবেস নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৫০)

চন্দ্রকান্তের মহত্ত্ব জগদীশ বুঝিতে পারে নাই।

চন্দ্রকান্ত যে বড় বড় উচ্চভাবের অনুপ্রেরণায় মোহিনীকে সহর হইতে গ্রামে টানিয়া আনিয়াছিলেন ও পরিশেষে তাঁহার অসহায় স্ত্রী ও কন্যাকে নিজের ঘরে স্নেহাশ্রয় দিয়াছিলেন, উহা জগদীশের বুঝিবার উপায় ছিল না। জগদীশ বুঝিয়াছিল তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়েই ঢোকা-

কাটা পণ্ডিতটা মোহিনীর পরিবারকে গ্রামে আনিয়াছিলেন ও মমতা বাধাইয়া দিয়াছিলেন ও পরিশেষে তাহারই উপর টেক্কা মারিবার অভিপ্রায়ে তাহারই ভাইবৌ ও ভাইঝিকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন।

জগদীশের হীন মানসিকতার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল তাহার ঠাকুরের স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া প্রচ্ছন্ন হিংসা। ফলে ঠাকুর তাহার প্রবল শত্রুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। তাছাড়া জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণের দিন সে নিজে অপমানিত হইয়াছিল ও ঠাকুর সম্মান পাইয়াছিলেন। এই দুর্জ্জয় অপমানের স্মৃতিটা তাহাকে অহরহ পীড়িত করিত ও মাঝে মাঝে তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত।

নিদারুণ প্রতিহিংসা ও অসূয়ার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া জগদীশ গোপনে লোক লাগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছিল।

জগদীশ পাড়াগাঁয়ের দুর্দ্ধর্ষ মোড়ল। সে বদমাইসের ভিতর শ্রেষ্ঠ বদমাইস, বাটপারদের ভিতর শ্রেষ্ঠ বাটপার। তাহার পুলিশের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায়, পরোক্ষে তাহার সংখ্যাহীন কুকীর্ত্তির কথা রটিত হইলেও, কেহ তাহার সামনা সামনি কিছু বলিতে সাহস করে না।

মোহিনীর শবদাহের কাজে সে নিজে যোগ দেয় নাই। সে কি কাজ করিয়াছিল উহা সে বিলক্ষণ জানে। সুবিমলেরা যখন মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিল তখন সময় শেষ রাত্রি হইলেও সে বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিষ্ঠ দেহ সুবিমলকে ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছিল।

তখন স্বদেশী ডাকাতের সম্পর্কে স্কুল কলেজের ছেলেদের গ্রেপ্তারের হিড়িক পুরাদমে চলিতেছিল। জগদীশ সন্দেহ করে এমন বলিষ্ঠ যুবক সুবিমল যখন কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া গ্রামে আসিয়া আছে, তখন তাহার কোন ডাকাতের দলের সঙ্গে সম্পর্ক বা মিল আছে। সে কিছু দিন গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যই হরিপুরে আসিয়া আছে।

যখনই জগদীশের মনে এই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল সেই দিনই সে কাল বিলম্ব না করিয়া নৌকায় চড়িয়া থানায় উপস্থিত হইল।

দারোগা বলিলেন, কি বলছেন আপনি? দেখেছেন সুবিমল ডাকাতকে। ভয়ানক স্বদেশী ডাকাত সে যে! ওকে ধরবার জন্য পুলিশ সাহেব থানায় থানায় পরওয়ানা পাঠিয়েছেন। আগে সংবাদ দিলে ধরা পড়ে যেত। সাক্ষী দেবেন আপনি ওর বিরুদ্ধে? দিন, দিন, জগদীশবাবু। এ সুযোগ ছাড়বেন না। জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বড় পুরস্কার পাবেন।

উৎসাহ ও আনন্দ জগদীশের এত বেশী হইয়াছিল যে ফিরিবার সময় সে স্থূলকায় হইলেও সে থানার উঁচু পাকা বারান্দা হইতে লাফ দিয়া নীচে মাটিতে পড়িয়াছিল ও রীতিমত দ্রুতপদে নদী পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া নৌকায় উঠিয়াছিল।

বাড়ীতে পৌঁছিবার পর সে এক নির্জ্জন ঘরে গিয়া বসিল। সে পুনঃপুন রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্মিত হইতে লাগিল এই ভাবিয়া কি অসাধারণ শুভ মুহূর্ত্তে আজ প্রভাতে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল। আজ পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া সহযোগিতা করিবার সুযোগ পাইয়া সে নিজের ও পরিবারের কত বড় একটা ভবিষ্যতের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু তুচ্ছ আশু পুরস্কারে কি এই মূল্যবান সংযোগিতা শেষ হইয়া যাইবে? হয়ত সে কালে রায়সাহেব হইয়া দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হইয়া উঠিবে ও রমেশবাবুর উপর টেক্কা মারিতে পারিবে।

শুধু উৎসাহ ও আনন্দেই শেষ হইল না তাহার এই সৌভাগ্যের সূচনা। সে পরের অমাবস্যার রাত্রিতেই বাড়ীতে এক কালীপূজার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল।

পূজার রাত্রিতে গ্রামের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আরতির সময়ে

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পূজার মন্দিরে জগদীশ পুরোহিতের পিছনে উন্নত ধূপের ধূমের মধ্যে খালি পায়ে গলবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া দেবীর প্রতিমার দিকে গদ্‌গদ ভক্তির ভাবে চাহিয়া আছে, আর মন্দিরের সামনের উঠানে থানার কালো লম্বা জমাদার খাকীর হাফ প্যান্ট ও কোট পরিয়া ও পায়ে পুরু কাপড়ের পটি আঁটিয়া শামিয়ানের তলে চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে আরতির দিকে চাহিয়া সিগারেট টানিতেছে।

জগদীশকে দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। জমাদারকে দেখিয়া অনেকে ভাবিলেন গভর্ণমেণ্টের দরবারে গতায়ত করিয়া জগদীশ বেশ সুবিধা করিয়া লইয়াছে। যাঁহারা নিতান্তই সরল তাহারা এই ধারণায় উপনীত হইলেন যে জগদীশ দোষগুণে মানুষ, দোষ তাহার যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহার দশকর্ম্মে যে আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

যাঁহারা পাকা খেলওয়ার তাহারা সিদ্ধান্ত করিল জগদীশ-ঘুঘু কোন দাঁও মারিবার জন্য এই পূজা আরম্ভ করিয়াছে ও জমিদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে। বোধ হয় দুর্দ্ধর্ষ সুদের আসামীদিগকে লইয়া একটা গ্যাং কেস খাড়া করিবার অভিপ্রায়ে এই পূজার ভূমিকা করিয়া সে পুলিশের শরণাপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু খেতাব ও রাজসম্মান যে এই পূজার গৌণ উদ্দেশ্য তাহা কেহ ধারণায়ও আনিতে পারিল না। উহা জগদীশের মনেই গোপন থাকিয়া জাগ্রত হইয়া রহিল।

ভবনাথ কিছুতেই গা-ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিল না। অবশেষে তাহাকে ধরা পড়িতেই হইল।

পুলিশ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হাজত বন্দী করিল।

ধরা পড়িবার পূর্ব্বে পুলিশ যখন তাহার অনুসরণ করিতেছেন তখন ছুটাছুটিতে তাহার শূন্যতার ভাব কাটিয়া গিয়াছিল। সে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবনাথের গ্রেপ্তারে বিমল বাবুর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তিনি সরকার কর্ত্তৃক এই কাজের জন্য বিশিষ্টভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল হতাশার পরিবেষ্টনে পড়িয়া তাহার পলায়নের সাহস দুর্জ্জয়ভাবে বাড়িয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বের ভবনাথ আর সে ছিল না। সুরবালার আদরের, সুরেশের স্নেহের, কীডস্কিনের পামপ সু পড়া, চটুলতায় দীপ্ত বাবু ভবনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

বোম্বাই সহরে যে বাড়ীতে সে ছিল সেই বাড়ীর এক দরজা দিয়া পুলিশ ঢুকিতেই অপর দরজা দিয়া সে পলাইয়া গিয়াছিল। সহরের এক নির্জ্জন স্থানে সে এক দোতলা বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল পুলিশ নিশীথ রাত্রিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিলে সে জানালার কাঠের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া তাহাই বাহিয়া নীচে নামিয়া সে পলাইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে আফগানিস্থানে পলাইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সে পাহাড়ের পথে চলিতেছিল। যখন সে পাহাড়ের একটা খাড়া জায়গা পার হইবার পক্রম করিতেছিল সেই সময়ে সে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় ও ফলে

তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। পুলিশ এই অবস্থাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

সুরবালা এপর্য্যন্তও রাজশেখর বাবুর বাসাতে আছে। তাহার শরীর ভাল হইয়াছে।

রাজশেখর বাবু সুরবালার মাকে জানাইয়াছেন যতদিন সুরেশের সন্ধান না পাওয়া যাইবে ততদিন সুরবালা তাঁহার নিকটেই থাকিবে।

মিনতিও যতদিন সুরেশের সন্ধান না হয় ও সুরবালা ও ভবনাথের মোকদ্দমা শেষ না হয় ততদিন সুরবালার কাছে থাকিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।

রাজশেখর বাবু সন্ধান করিয়াও এপর্য্যন্তও সুরেশের খোজ পান নাই।

ভবনাথকে ধরিয়াই পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট দাখিল করিয়াছে। নিম্ন আদালতের বিচার রাজশেখর বাবুরই করিবারই কথা; কিন্তু সুরবালা তাঁহার বাসাতেই আছে বলিয়া বিচারের ভার তিনি সবডিভিসন-অফিসারের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

সুরবালাকে কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া নিম্ন ও উচ্চ আদোলত উভয় জায়গায় সাক্ষ্য দিতে হইবে। সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা ধারণা করিয়া সুরবালা একটু মাত্র ভীত হয় নাই। কেননা অসাধারণ এক বিপদের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার সাহস অপরিমেয় ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সে এক নূতন জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে ও লজ্জাশীলা ঘরের বৌয়ের আবেষ্টন ত্যাগ করিয়া সে অনেকটা বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। এতকাল সমাজের বাধা-ধরা আচার নিয়মের অধীন হইয়া অতীতকে সে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নিজের প্রকৃতিগত স্বাধীনভাব পরদার আড়াল হইতে স্পষ্ট ভাবে উঁকি-

ঝুঁকি মারিলেও সে অতীতের নাগপাশ কাটাইয়া বাহির হইতে পারে নাই। এখন সে অভাবনীয় এক বিপদ ও জীবন-সঙ্কট মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া জীবনটাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দেখিতে শিখিয়াছে ও নিজের দুঃখের মধ্যেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। জীবন ব্যাপী শিক্ষায় তাহার যাহা না হইত এই ঘটনায় তাহা তাহার অজ্ঞাতে ঘটিয়া গিয়াছে।

সুতরাং লোক সমাজের সাম্‌নে সাক্ষ্য দিয়া খুনী ভবনাথের শাস্তির বিধান করিবার সঙ্কল্প হইতে পশ্চাৎপদ হইবার সুসঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহার নিজের সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছে মিনতির কথায় ও উৎসাহে। তিনি তাহাকে পাইয়াছেন। সমাজের কলঙ্কের ভয়েই অনেক সময় অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা ধর্ষিতা নারীরা চাপা দিয়া রাখে। তাহাদের আত্মীয় বন্ধুরাও সমাজের নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী না হইয়া এইরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয়। ফলে অত্যাচারীরা সাজা পায় না ও সমাজের এই আত্মঘাতী নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়াই চলিতে থাকে। মিনতি বলিয়াছেন সুরবালাকে সমাজের জাগ্রত চক্ষুর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে ও সমাজের চিরাচরিত অজ্ঞানের পাষান প্রাচীরে জোরে ঘা দিতে হইবে। তাহাকে সমাজের সাম্‌নে এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।

এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়া ফেলিয়া সুরবালা যে একটা বড় কিছু করিয়া বসিবে এ বিষয়ে সুরবালার ধারণা না থাকিলেও সে রাজশেখর বাবু ও মিনতি উভয়েই বিনীতভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে সে সাক্ষ্য দিয়া নিজের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না। রাজশেখর বাবু ও মিনতি উভয়েই তাহার সৎসাহস দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

যথা সময়ে নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। পরেশ বাবু চিঠির

কথা বলিলেন। কেমন করিয়া মিথ্যা অবস্থার সংবাদে বিপর্য্যস্ত করিয়া আসামী সুরবালাকে ভুলাইয়া নিয়াছেন একথা সুরবালার মা বলিলেন। পরে সুরবালার সাক্ষ্যের পর বিচারক আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন নিম্ন আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে তিনটি চার্জ্জ ছিল। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া, দ্বিতীয় জাল ও প্রতারণা, তৃতীয় হত্যার চেষ্টা।

দায়রা আদালতে যে দিন বিচারের দিন ধার্য্য ছিল সেদিন আদালতের মাঠে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যে ঘরে মোকদ্দমার শুনানী হইবে সে ঘরে ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না। ঘরের দরজায় রীতিমত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

জজ সাহেব পাবনার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের লইয়া জুরিমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন।

যখন খোঁড়া-পা ভবনাথকে পুলিশ প্রহরী মাজায় দড়ি বাঁধিয়া আদালতে লইয়া আসিতেছিল তখন জনতা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রকার ক্ষিপ্তই হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় কোন দুষ্ট ছেলে ভবনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িয়াছিল ঢিলটি জোরে ছুটিয়াছিল ভবনাথের কপালে লাগিয়াছিল। কপাল কাটিয়া রক্ত তাহার গালে ও চিবুক বহিয়া রেখা কারে গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সরকারী উকিল দায়রা আদালতে ভবনাথের তিনটি অভিযোগই বহাল রাখিলেন।

সুরবালা সাক্ষীর কাটগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন সে আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়ানো ভবনাথের চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বের চেহারা মোটেই নাই। তাহার সুন্দর মুখটা কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার কপাল হইতে চিবুক পর্য্যন্ত শুষ্ক রক্তের কালো রেখা

নামিয়া আসিয়াছে। চোয়ালের হাড় অসম্ভব রকমে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। কপালের চামড়া বসিয়া গিয়া কপালে গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরে মাংস নাই বলিলেই হয়। চামড়া হাড়ে গিয়া ঠেকিয়াছে। চোখ হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

মোকদ্দমার প্রথম হইতেই ভবনাথ হিংসার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুরবালার দিকে চাহিয়াছে।

প্রথমে সেই ভয়ানক দৃষ্টির আঘাত ও চেহারা সুরবালার বুকে তীব্র হইয়া বাজিলেও সে এখন নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি এখন আর তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় না। বর্ত্তমানের কাজের চিন্তাই তাহাকে সাহস দিয়াছে।

ভবনাথের উকিল প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন পলায়নের ব্যাপারে সুরবালায় সম্মতি ছিল। আরও তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন সেই রেলগাড়ীর কামরায় ভবনাথ সুরবালার উপর আদৌ অত্যাচার করে নাই। ভবনাথ সুরবালাকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিতে যায় নাই। পুলিশ ঘটনাকে হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কারসাজি করিয়া প্রথম এজেহারের সময় লিখিয়া লইয়াছে, কেননা হাতে থাকিলে মেয়ে মানুষ সুরবালা কিছুতেই ভবনাথের দ্বারা খুন না হইয়া যাইত না। এক বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন; ভবনাথ সুরবালাকে লইয়া আচম্‌কা সুরেশের সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া এক বড় ধরণের আমোদের সৃষ্টি করিবে এই ছিল তার অভিপ্রায়। আর সুরেশের ছোট ভাইয়ের মত সম্পর্কিত ভবনাথের এরূপ আচরণে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। চিঠি লেখায় ভবনাথের হাত ছিল না। ঘুষের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হরিময় ভবনাথকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে চিঠিখানি লিখিয়াছিল। ভবনাথের কলিকাতা যাওয়ার সুযোগ লইয়া ভবনাথের ও সুরবালার

হস্তাক্ষর জাল করিয়া ঐ হরিময়ই ভবনাথকে বিষম সাজা দিবার অভিপ্রায়ে চিঠি দুইখানি এক খামে পুরিয়া ডাকযোগে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিল। ফলে কাকতালীয়বৎ যোগাযোগে নিরপরাধ ভবনাথ দোষী হইয়া পড়িল। সুরবালা প্রেমময়ী পত্নী, সে সুরেশের গুরুতর পীড়ার সংবাদে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাময়িকভাবে মস্তিষ্কের বিচার শক্তি হারাইয়া ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সে ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

এই সব উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সুরবালার জেরা করিয়াছেন বিস্তারিতভাবে অবশ্য সুরবালার প্রতি যথাযথ ভদ্র ব্যবহার রক্ষা করিয়া সুরবালাও কিছুমাত্র বিপর্যাস্ত না হইয়া সেই বিদ্বান বাগ্মী ব্যবহারজীবের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়া অকুণ্ঠিত ধারণার, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বিনম্রতায়, আচরণের সমস্ত শুচিতা ও ভব্যতা রক্ষা করিয়া। একটা বেফাঁস কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নহে। সে উকিলের দিকে, জজের দিকে, আদালতের জনসাধারণের দিকে অকুণ্ঠীতভাবে তাকাইয়াছে শান্ত সুসঙ্গত পবিত্রতায়। সকলেই তাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে, কেহ তাহার ব্যবহারে বা ভাব ভঙ্গীতে ত্রুট বা বিচ্যুতি ধরিবার অবসর পায় নাই।

উকিল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কি স্বেচ্ছায় ভবনাথের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।

সুরবালা দৃঢ়ভাবে বলিয়াছে, কিছুতেই না।

যখন জজসাহেব সুরবালার চরিত্র ও সাহসের অজস্র প্রশংসা করিয়া জুরির সামনে চার্জ্জ দখিল করিলেন তখন বিচারের ঘরটা স্তম্ভিত বিস্ময়ে চুপ করিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আসন্ন ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইয়াও সুরবালা কেমন করিয়া আশ্চর্য্যভাবে নিজের বিচার শক্তি

ও কর্ত্তব্য বোধ অটুট রাখিয়া আসামীকে বিপর্যাস্ত করিয়াছিল ও পরে নদীতে মর্ম্মান্তিক সঙ্কট ঘাড়ে করিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন, এই লাফাইয়া পড়ার কাহিনীতে পরিস্থিতির অসহায় সঙ্কটের প্রশ্ন থাকিলেও উহার পশ্চাতে সুরবালার পরিবর্দ্ধিত নৈতিক শক্তির জোর ছিল ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই হিসাবে যে সুরবালা মানুষের মধ্যে অতিমানুষ, এ দাবীটা গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

পরেশ হাঁ করিয়া সব কথা শুনিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি পাশের লোককে বলিলেন, হাঁ ঠিকই বলেছেন। জজই বটে। তা হবে না কেন। অত বড় লেখা পড়া জানা লোক।

সমবেত লোকেরা রুদ্ধ নিঃশ্বাস অপরিসীম বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করিয়া জজের প্রত্যেকটি কথা গিলিতে লাগিল। চার্জ্জ দেওয়া শেষ হইলে সকলেই অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও আনন্দে বুঝিতে পারিল ধন্য সাহস সুরবালার, এইরূপ নারী যে জাতির মধ্যে জন্মে সেই জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অসাধারণভাবে উজ্জ্বল ও গৌরবময়।

জুরিমণ্ডলী তিনটি অভিযোগেই ভবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। যখন জজ জুরিদের সঙ্গে একমত হইয়া আসামীর দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন, তখন আসামী সেই দণ্ডাদেশ বীরের মত অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিল না। সে রোল তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কাঠগড়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। কনেষ্টবলেরা এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে কাঠগড়া হইতে অপসারিত করিল।

সুরবালা দৃঢ় সঙ্কল্পে বুক বাঁধিয়াছিল, তথাপি দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কাপুরুষ ভবনাথের এই সাংঘাতিক বিপর্যায়ে সে মাথা অবনত করিয়া রহিল, চাহিতে পারিল না।

পাবনাবাসীর মধ্যে যাহারা ঘটনার কথা ভাল করিয়া জানিত না

শেষে তাহারা এক ভদ্রযুবতীর অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার কথা জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মোকদ্দমা শেষে যখন মিনতি রায় মোটরে করিয়া সুরবালাকে আদালতের প্রাঙ্গন হইতে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন তখন পাবনা-বাসীর প্রতিনিধিস্বরূপে এক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক পাবনাবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদনের চিহ্নস্বরূপ সুরবালার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

শুধু মালা পরাইয়া দেওয়াতেই সম্মান প্রদর্শনের অধ্যায় শেষ হইয়া গেল না। পরদিন সুরবালাকে সহরের কয়েকটা রাস্তা বরাবর মোটরে ঘুরাইয়া লইয়া স্থানীয় টাউন হলে বিরাট জনসভায় লইয়া যাওয়া যাওয়া হইল। সেখানে পাবনাবাসী সুরবালাকে এক মানপত্র প্রদান করিলেন।

এই সভার মূলে ছিলেন মিনতি। তিনি সহরের বিশিষ্ট ভদ্র মহিলাদিগকে সঙ্গে করিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ও সহরের মুখপাত্র স্বরূপে মানপত্রখানা তিনিই সুরবালার হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন।

এই মানপত্র গ্রহণে গৃহস্থের বধু সুরবালার যথেষ্ট আপত্তি ছিল কিন্তু মিনতির সঙ্গে সে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।

সভায় সব সময়েই সে মুখ অবনত করিয়াছিল, চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারে নাই।

মোকদ্দমা শেষে মোটরে ফিরিবার পথে মিনতি সুরবালাকে বলিলেন, ওঃ, কি ভয়ানক চেহারা লোকটার!

সুরবালা বলিল, কার?

—আসামীর।

সুরবালা অন্যমনস্কভাবে বলিল, ও রকম চেহারা ওর ছিল না। দুর্দ্দশায় পড়ে ঐ রকম হয়ে গিয়েছে।

পরেশবাবু এই মোকদ্দমার সফলতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা শেষে তিনি রাজসাহীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরেশের চিঠি সুরমা পাইয়াছিলেন। আজ পরেশের রাজসাহীতে পৌঁছিবার কথা। তিনি পরেশের প্রতিক্ষায় উৎকন্ঠিত হইয়া ঘরে বসিয়াছিল।

পরেশ আসিয়া পৌঁছিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল?

আগে যতই না কেন লাফালাফি পরেশ করিয়া থাকুন ভবনাথের এই কঠোর শাস্তিতে তাঁহার পূর্ব্বের প্রতিহিংসার ভাবটা কতকটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে আদালত ত্যাগের পর যা কিছু উল্লাস তাঁহার অবশিষ্ট ছিল তাহা বিষাদের ঘন ছায়ায় পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।

পত্নী কথার উত্তরে তিনি ক্লান্তভাবে বলিলেন, যা হবার হয়েছে।

—কি হয়েছে?

—জেল হয়েছে।

—কয় বছরের?

পরেশ বিষন্নভাবে ছোট সুরে বলিলেন, দিয়েছে ব্যাটাকে দশ বছর ঠুকে।

পরেশের স্ত্রী কোন উত্তর করিলেন না, গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পরেশ বলিলেন, অমন করে রইলে যে! কোন অসুখ করেনি তো?

না অসুখ করেনি।

—যাক্ তাও ভাল। ভাল হয়নি সাজাটা?

—ভাল মন্দ কিছু বলিনে।

—ভাল হয় নি?

সুরমা বোধ হয় এই সংবাদে আনন্দিত হইতে পারিতেছিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, না, ভাল হয়নি বলছিনে। হয়ত ভালই হয়েছে।

এই কথা বলিয়া তিনি এমন জোরে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন যে সমস্ত পরের কথায় এক কালো যবনিকা পড়িয়া গেল।

পত্নীর ভাব দেখিয়া পরেশ চমকিয়া গেলেন! তিনি থ মারিয়া মাথা গুজিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন।

(৫২)

কয়েকমাস পরের কথা। পরেশ রজেসাহীর বাসায় তালা বন্ধ করিয়া পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিবার অভিপ্রায়ে কাশীতে আসিয়াছেন।

রমেন্দ্রবাবু সুরেশের চিঠি পাওয়ার পর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে যে বাগান ভবনাথ কিনিয়াছে উহাতে কোম্পানীর লাভত হইবেই না বরং কোম্পানী উহার উপর বৎসরে বৎসরে টাকা খরচ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাছাড়া কোম্পানীর কাজ কর্ম্মে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে উহা চলিলে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

তিনি ডিরেক্টর সভা আহ্বান করিলেন। ডিরেক্টর সভা পরিশেষে কোম্পানী উঠাইবার মন্তব্য পেশ করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত গুটাইয়া লইবার ভার রমেন্দ্রবাবুর উপরই দেওয়া হইল।

চন্দ্রকান্ত পল্লীবাস উঠাইয়া দিয়া সুশীলা ও শৈলকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে আসিয়াছেন ও সেখানে একটা পাকা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

শঙ্কর কলিকাতার কলেজে বি, এ, পড়িতেছে।

পরেশ প্রত্যহ গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করেন, চন্দ্রকান্ত সেই সময়ে গঙ্গাস্নান করেন। উভয়ের বাসা কাছাকাছি।

পরেশ চন্দ্রকান্তের কান্তিমান চেহারা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ভাব এতবেশী হইয়াছে যে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে থাকিয়া পরেশ নিজের দুঃখের বোঝা হাল্কা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত পরেশের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন। আদনের পরিচয়েই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

সুরমার শরীর বর্ত্তমানে শোচনীয়ভাবে খারাপ। তিনি কাহারও সঙ্গে বড় কথা বলেন না, এমন কি পরেশের সঙ্গেও না।

একদিন পরেশ চন্দ্রকান্তকে বলিলেন, আপনি পণ্ডিত মশায় ওকে একটু দেখুন। মারা যাবে যে ও সকালেই। তাই ভাবি পণ্ডিত মশায় কি ছিলেম কি হয়ে গেলেম। ছায়া হয়ে গিয়েছে এ জীবন আগেকার জীবনের, চিন্‌তে পারা যায় না। মেয়েটা মারা গেল, ফিট হয়ে পড়লেম। সেই ফিট থেকেই আমার এই অবস্থা হয়েছে। তাই ভাবি দারোগা কেন ডাকলেন। ওঃ, কি যে চেহারা দেখেছিলেম ওর! যখন ওর কথা মনে হয় তখন মনে হয় পণ্ডিত মশায় সমস্ত বুকটা যেন আমার ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তখন মাটিতে বসে পড়ি, ফিট হয়ে যাই। অবশ্য সে ফিট দুই তিন মিনিটের বেশী থাকে না। কেউ এ পর্য্যন্ত জানে না যে আমার এই ব্যারাম হয়েছে। জীবনটা আমার অনবরত হাহাকারে ভরে থাকে। কার কাছে বলবো আমার কথা। কে শুন্‌বে? অনেক সময় পাগলের মত হয়ে যাই। তবু যে একেবারেই পাগল হয়ে যায় নি সে আমি বলেই হয়নি।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওষুধ পত্র খান পরেশবাবু। ভগবানকে ডাকুন।

পরেশ বলিলেন, কি ওষুধ-পত্র খাব? এখন মলেই বাঁচি। আর ভগবান্ ও আপনাদের মনগড়া জিনিষ। নেই পণ্ডিত মশাই, নেই, ভগবান নেই, নৈলে আমার কপালে এত দুঃখ ঘটত না। যখন দুঃখ আর সহ্য হয় না তখন পড়ে পড়ে মনে মনে ভয়ানকভাবে কাঁদি। তাতেই একটু শান্তি পাই। টিঁকে থাকতে পারি।

চন্দ্রকান্তকে সুরমা কাকা বলিয়া ডাকেন।

একদিন সুরমা বলিলেন, বলে দিতে পারেন কাকা আমার মরণ কবে হবে?

মরণের কথা কেন মা?

—আমার মত লোকের বেঁচে থেকে লাভ কি কাকা?

তা ভাবলে যে আমারই আগে মরতে হয়।

—তা তো বুঝি কাকা; কিন্তু সহ্য যে কিছুতেই করা যায় না। আর যে ব্যারাম হয়েছে!

কুমুদিনীর মৃত্যুর পর হইতে সুরমাকে হাঁপানিতে আক্রমণ করিয়াছিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা তো বুঝি মা। কি যে কষ্ট তাও বুঝি। কিন্তু এ ব্যারাম সব সময়ে থাকে না। আর চিরদিনও থাকে না এ ব্যারাম।

—তাও তো শুনি। কিন্তু এ অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরাও ভাল।

—তোমার একটা মস্ত দোষ তুমি কারুর সঙ্গে কথা বল না।

—কার সঙ্গে বল্‌বো বলুন।

—আচ্ছা সুশীলা মা, ও শৈলকে পাঠিয়ে দেব আমি।

—সুরমা চুপ করিয়া রহিলেন। চন্দ্রকান্তও মৌন রহিলেন পরে ক্ষীণ কণ্ঠে সুরমা বলিলেন, তারা কি আসবে?

—কেন আসবে না?

—যে ব্যবহার আমরা করেছি!

—তোমরা তো খারাপ ব্যবহার কোন কিছু করনি।

পরে সুরমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর বিষাদে বলিলেন, করলেন তো উনিই সব কাকা। ওঁর খেয়ালেই তো সংসারটা ভেঙে গেল। উনি যদি বেঁকে না দাঁড়াতেন তবে কি এতটা হত! শেষের কথাটা বলিয়া সুরমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, কেঁদ না মা। এখনও শোধরাবার উপায় আছে মা?

—কি করে? বিমল কি করে আসবে কাকা?

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিমল ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরমা বলিলেন, তাই ভাবি কাকা, এবার কি আমার অবস্থা দেখে তার দয়া হবে না?

—হবে মা। নিশ্চয়ই হবে।

আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পর সুরমা বলিলেন, আচ্ছা দেবেন পাঠিয়ে সুশীলাকে। কর্তা সেদিন বল্লেনা, মোহিনীবাবুর মৃত্যুর জন্য উনিই দায়ী। না বলে কি উপায় আছে? জীবনটা আমার ছারখার হয়ে গেল শুধু ওঁর পাগলামীতে।

—পরেশ বাবুর দুঃখও ত কম নয় মা!

সুরমা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, দুঃখ! উনি মানুষ পণ্ডিত মশায়! সুখ দুঃখের জ্ঞান ওঁর আছে? ভূতের মত

চলেন, ভূতের মত খান, ভূতের মত ব্যবহার করেন। মোহিনীবাবু মরলেন ত ওর জন্মেই। মেয়েটাত মরল ওঁরই দোষে।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়ায় রহিলেন। তিনি জোরে এক দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আর কোন কথা হইল না।

চন্দ্রকান্ত যাইবার সময় সুরমা বলিলেন, দেবেন পাঠিয়ে সুশীলা ও শৈলকে কাকা।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু সময় সুশীলা ও শৈল আসিলেন সেই সময়ে নিজের আবছায়া অন্ধকার ঘরে সুরমা বালিশে মাথা রাখিয়া, কাত হইয়া, খালি চৌকির উপর, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া গুটিসুটি ভাবে শুইয়া ছিলেন। দুঃসহ নিঃসঙ্গতায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

পরেশবাবু বাসায় ছিলেন না।

সুশীলা সুরমার কাছে গিয়া বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সুরমা বলিলেন, কে ?

সুশীলা বলিলেন, আমি সুশীলা।

সুরমা চমকিতভাবে কাত ফিরিয়া বলিলেন, এসেছিস ভাই ?

—এসেছি।

—আমি তো ভাবলেম তোরা আসবিনে।

সুশীলা হাসিয়া উঠিয়া অভিমানের সুরে বলিলেন, তোমার যেমন কথা ভাই। না আসার কি আছে বলত ?

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না।

শৈল সুরমার মাথার দিকে দাঁড়াইয়াছিল। সুরমা তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

বলিলেন, শৈল এল না ?

—এসে-ছি।

—কোথায় ?

সুশীলা শৈলকে বলিলেন, প্রণাম কর শৈল।

শৈল বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া সুরমাকে প্রণাম করিল। সুরমা শৈলকে বলিলেন, সুইচটা টিপে দেত মা।

শৈল সুইচ টিপিয়া দিল, সুরমা উঠিয়া বসিলেন।

সুশীলা বলিলেন, একি ! চৌকি যে ! তাও খালি ! দেখি বিছানাটা পেতে দেই।

সুরমা বলিলেন, খাট তো দেশ থেকে আনা হয় নি। বিছানা পেতে কাজ নেই এখন। পরে পাতলেই হবে।

চেহারা যে একেবারেই শুকিয়ে গেছে, কিছুই যে নেই।

—আর কি সে চেহারা আছে ভাই। একেবারে মানুষের বার হয়ে গিয়েছি !

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে সুরমা বলিলেন, আমি তো ভাবছিলেম তোরা আসবিনে।

—কেন ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরমা স্থির হইয়া বলিলেন, যে ব্যবহার করেছি আমরা !

— তোমরা তো খারাপ কোন কিছু ব্যবহার করনি ভাই !

—করেছি বই কি। শৈলর মত মেয়েকে নেইনি। কর্তার মাথায় ভূত চেপেছিল। এবার ওর হার মানতেই হবে। এবার শৈলকে নেবই বিমল ফিরে এলেই। এখন থেকে ও কিন্তু আমার কাছেই থাকবে।

—দেব বই কি ভাই। মেয়ের ভাগ্য বলতে হবে যদি তোমার মত

শাশুড়ী পায় ও। আমি আজকাল ওর বিয়ের কথা বড় একটা ভাবিনে। বিমল বাঁচিয়েছে ওকে। ও-বোধ হয় বিমল ছাড়া আর কাউকেই চায় না। থাক্ ও এখানে। কিন্তু মাঝে মাঝে যেতে দিও ভাই। পণ্ডিত মশায় যে শৈল মা, শৈল মা করে পাগল।

(৫৩)

সুরবালাকে মানপত্র দিলেন পাবনাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে যেন জয় ঢাকের মত সর্ব্বত্র তাহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। গলায় মালা দেওয়া, জয়ধ্বনি আর্ট পেপারে সুসজ্জিতভাবে ছাপা ও লিখিত অভিনন্দন পত্র, পাঠ করিলেনও উহা মেম সাহেব মিনতি রায়, সাহেবী ঢঙের সৌন্দর্য্য মণ্ডিত উচ্চারণে, সর্ব্বোপরি ঘরের বৌকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ। ঘটনাগুলির উপর দিয়া এক উত্তেজক রোমাঞ্চকর আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইগুলি হঠাৎ সুরবালাকে স্বপ্নের রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কল্পনার উত্তেজনা যতদিন থাকে ততদিন স্বপ্নেরও অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। উত্তেজনা পড়িয়া বাস্তব দেখা দেয় নিজের কঠিন মূর্ত্তিতে। সুরবালার যতদিন উত্তেজনা ছিল ততদিন এই সব ঘটনার স্মৃতি তাহাকে আনন্দ দিত, দুঃখের মধ্যেও তাহাকে উৎসাহিত করিয়া রাখিত কিন্তু নিজের ও লোকের উৎসাহ বাড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানকভাবে পড়িয়া আসিল তাহার উৎসাহ ও আনন্দ।

এখানে রাজশেখর বাবুর বাসায় কাজকর্ম্ম নাই বলিলেই হয়। রাজশেখর বাবু পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট থাকিলেও ম্যোজিষ্ট্রেট হইবার

পর পরই ঢং একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। সেই পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছেন পরিপূর্ণভাবে মিনতি রায়। তাঁহার চেহারা পাতলা, অথচ মজবুত, তাঁহার চলনে ফেরনে মেমসাহেব সর্ব্বদা প্রকাশমান। তাঁহার সময় নিয়মিত। তিনি বিকালে নিয়মিত টেনিস খেলেন, অরগ্যান বাজাইয়া গান করেন, নিয়মিত সময়ে নাচেন, সময়ে সময়ে পাবনা সহরের ভিতর দিয়া মোটর সাইকেল চালাইয়া সহর বাসীকে চমৎকৃত করিয়া দেন। ইতিমধ্যে মিনতি রায় পাবনার অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন। ঐ সমাজের দৈনন্দিন জীবনে মিনতি যেন জড়াইয়া গিয়াছেন।

অবশ্য রাজশেখর বাবু সাহেবী খান খানা না। বাঙ্গালী খানাই তাঁহার বাড়ীতে পরিপাটিভাবে রান্না করা হয় নানা রকম সমারোহে। ঐ খানা পরিবেষণ করে উদ্দিপতা বাবুরচি একতকে পরিষ্কার খাবার ঘরের শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপরে। অবশ্য বাসায় সাহেবী খানারও ব্যবস্থা আছে। সাহেব পরিদর্শক আসিলে রাজশেখর বাবু তাঁহাকে বাসায় নিমন্ত্রন করেন ত সাহেবী খানা ও আপ্যায়নে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। অবশ্য সর্ব্বদাই শ্বশুড়কে সাহায্য করেন মিনতি।

প্রথমে সুরবালা এই আবহাওয়ায় জলের বাহিরে মাছের মত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মিনতি মেম সাহেব হইলেও স্নেহ ও মমতায় পুরাদমে বাঙ্গালী সুরবালাও ভীরু নহে, সব বিষয়ে সপ্রতিভ। মিনতি সুরবালাকে মাজিয়া ঘসিয়া লইয়াছেন, আরও মাজিতে ও ঘষিতে চাহিতেছেন, সুরবালাও সেই মাজা ঘষার ব্যাপারে পিছাইয়া যায় নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই সেও ওই বাড়ীর চাল চলন আয়ত্ব করিয়া লইয়া মানান সহ হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পুরামাত্রায় সাহেবি হওয়া সুরবালার পক্ষে

সম্ভব হইয়া ওঠে নাই কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহার যে খিঁচুরি পরিপক্ক হইয়াছে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য নহে।

সুতরাং রাজশেখর বাবুর বাসায় সুরবালার কোন কাজ কর্ম্ম নাই বলিলেই হয়। টুঁশব্দ করিলেই বেয়ারা আসিয়া হাজির হয় ও দ্রুত-গতিতে হুকুম তামিল করিয়া চলিয়া যায়।

রাজশাহীর নিজের বাসায় সুরবালাকে অক্লান্তভাবে শারিরিক খাটুনি খাটিতে হয়। তাহাতে তাহার শরীর ঠিক থাকিত, মনের ক্লেদ জমিবার অবসর পাইত না। এখানে তাহাকে সারাদিন বসিয়া থাকিতেই হয়। সামনে মিনতি তাহাকে ইংরেজী বাংলা পড়ান, দুপুরে সে মিনতির সঙ্গে কারম খেলে, বিকালে কোনও কোনও দিন সে মিনতির সঙ্গে নাচে ও গান গায় কোনও দিন বা টেনিস খেলে। রবিবার সকালে উভয়েই সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মিনতি সুরবালার সপ্রতিভ ব্যবহার দেখিয়া উহার উপর ভয়ানক ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। নাচ, গান, ও লেখাপড়ার মাষ্টারি করিতে গিয়া তিনি বুঝিয়াছেন মফঃস্বলের সহরের এক ঘরের বৌয়ের ভিতরে এমন এক আশ্চর্য্য পদার্থ লুক্কায়িত যাহা মোটেই স্ফুট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।

নাচ ও গান গাওয়াতে সুরবালা প্রথমে মোটেই রাজি হয় নাই, কেননা প্রথম কারণ সে নাচিতে একদম জানে না, দ্বিতীয় কারণ তাহার গলার আওয়াজ ভাল হইলেও সে এসরাজ, হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কোনও দিনও গান করে নাই। কিন্তু মিনতির পীড়াপীড়িতে সে নাচিতে ও গাহিতে আরম্ভ করিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে উভয় দিকেই তাহার স্বাভাবিক কৃতিত্ব আছে। বাঁধাধরা প্রণালী কাটাইয়া সে প্রায়ই নূতন নূতন ধরণের সৃষ্টি করিয়া মিনতিকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

সে-ও নিজে সৃষ্টির আনন্দে নিজকে নিক্ষেপ করিয়া কিছুকালের জন্য সব ভুলিয়া যায়।

কিন্তু এখানে কাজগুলি তাহার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অবশিষ্ট সময় তাহাকে বসিয়াই কাটাইতে হয়।

স্বামীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে ও দিনরাত লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে।

যখন দুঃখ আর সহ্য করা যায় না তখন সে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।

অনেক সময় অবসাদের অবস্থায় তাহার মনে হয়, ছি, ছি। সে না ঘরের বৌ! কেন তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় লইয়া যাওয়া হইল? কেন তাহার নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইল?

লজ্জায় সে মরিয়া যায়।

মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা। সে ভাবে কেন সে কাপ্তানি করিয়া সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিল। কেমন করিয়া ঘর-ভরা লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের জেরায় টিকিয়া ছিল? ভবনাথ শাস্তি পাইল বটে, কিন্তু তাহার নিজের কি লাভ হইল? স্বামী তো ভবনাথের শাস্তিতে ফিরিয়া আসিলেন না।

দিনের পর দিন ভাবিয়া ভাবিয়া সুরবালার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে সেই অবনতি স্পষ্টভাবে সকলের চোখে ধরা পড়িল।

রাজশেখরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে তিনি একদিন বলিলেন, ভেবোনা মা, সুরেশকে একদিন পাওয়া যাবেই।

সুরবালার ব্যবহারে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে রাজশেখরবাবু চমৎকৃত হইয়াছেন ও সুরবালাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। সরকারের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও পারিবারিক হিসাবে যাহাকে সুখী বলা চলে তাহা তিনি নন্। সুশীল একমাত্র ছেলে। তিনি সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন। তাঁহার মেয়ে নাই। স্ত্রীও বহুদিন আগে মারা গিয়াছেন। আফিসের বাঁধাধরা কাজের অবসরে তাহাকে স্নেহের কথা বলিবার কেহ নাই। মিনতি মাত্র কিছুদিন হইল আসিয়াছেন, আর রাজশেখরবাবুর একটানা জীবনে দিনগুলির তুলনায় তিনি কয়দিনই বা পাবনায় থাকিবেন। তাই তিনি স্নেহের স্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত হইতে চায়। সুরবালা সেই অভাব মিটাইয়াছে। রাজশেখরবাবু এখন ভাবেন সুরবালা চলিয়া গেলে হয়ত তাঁহার খুব কষ্ট হইবে।

স্নানের সময় সুরবালা রাজশেখরবাবুর মাথায় সুগন্ধি তৈল মাথাইয়া দেয়। খাওয়ার সময় বাবুর্চ্চি থাকিলেও সে খানা পরিপাটিভাবে সাজাইয়া সামনে ধরিয়া দেয় এমন সুচারুভাবে যে রাজশেখরবাবু কোন দিকেই খুঁত ধরিতে পারেন না। বিকালে জল খাবার সে নিত্য নূতনভাবে তৈয়ার করিয়া সে রাজশেখরবাবুকে চমৎকৃত করে।

স্নেহশীলা হইলেও মিনতি অন্যের আহার ব্যবহার সুশৃঙ্খল কাজের দ্বারা সেবা করিবার শিক্ষা পান নাই। তিনি ঘর সাজাইতে পারেন, গান গাহিয়া শ্বশুরকে আপ্যায়িত করিতে পারেন, শ্বশুরের বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে সমাদর করিতে জানে, কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি

পরিপাটিভাবে মনোযোগ দিতে পারেন না। সেদিকে বাবুর্চি, আরদালীর উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

এদিকে তিনি সুরবালার কাছে হার মানেন। তাই বলিয়া তিনি সুরবালাকে হিংসা করেন না। প্রথম কারণ তিনি হিংসা করিতে জানেন না, দ্বিতীয় তিনি সুরবালাকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন যে শিক্ষাগত বৈষম্য থাকিলেও সুরবালাকে ছোট বলিয়া মনে করেন না, বরং আশা রাখেন সুরবালার প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পাইলে সে ভবিষ্যতে তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া বহুদূরে চলিয়া যাইবে। তিনি সুরবালার প্রত্যেক কাজই আন্তরিক প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও ভুলক্রমেও, এমন কি একটা ইঙ্গিতের দ্বারাও, তাহার কোন কাজে সামান্য অস্বস্তি বা বাধার সৃষ্টি করে না।

দুশ্চিন্তার অসহ্য চাপে সুরবালার স্বাস্থ্য দিন দিনই খারাপ হইয়া চলিল। রাজশেখরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যও কিছুদিন হইল ভাল চলিতেছিল না।

অবশেষে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সুরবালাকে লইয়া তিনি কয়েক মাসের ছুটিতে দার্জ্জিলিং যাইবার সংকল্প করিলেন। মিনতিও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া রাজশেখরবাবু প্রত্যহ সকালে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিনতি ও সুরবালা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন আলাদা ভাবে।

দার্জ্জিলিংয়ে পাইন গাছের শ্যাম শোভা, মেঘমুক্ত নীল আকাশের কাপড়ে আঁকা নীল পাহাড়ের শ্রেণী, সূর্য্যের আলোকে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণাভ উজ্জ্বলতা, সব সুরবালা ও মিনতিকে বিস্ময়পুলকিত করিয়া রাখিত। তাঁহারা পাইন গাছের আড়ালে আড়ালে উঁচু উঁচু পাহাড়ের

উপর দিয়া স্বপ্নপুরীর কন্যার মত স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে, অবারিত গতিতে কৌতুহলদীপ্ত মুখে এক পাহাড় হইতে অপর পাহাড়ে উঠিতেন। পরে ইলা, রেখা ও স্থূলাঙ্গিনী ইলা রেখার মাতার সঙ্গে দেখা হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে অতি প্রত্যূষে ইলা, রেখার দলবল লইয়া হাসিমুখর গতিভঙ্গীতে পথ চলিতে চলিতে টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্ত তাঁহারা যাত্রা করিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সুরবালার স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গেল। রাজশেখরবাবুও পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। মিনতির গৌর মুখও স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

সুরেশও এই সময়ে অনেক দেশ ভ্রমণের পর দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বেশ অনেকদিনই হইল দার্জ্জিলিংয়ে আছে অথচ কোনও দিনই রাজশেখরবাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একদিন পথে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজশেখরবাবুও ইংরাজীর ফার্ষ্ট ক্লাশ এম-এ। কিন্তু রাজশেখরবাবুর দিকে এই সুবিধা ছিল যে বাঙ্গালী জীবনের আকাঙ্ক্ষিত এক উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি উক্ত পদের নিরঙ্কুশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটাইতে ও উপভোগ করিতে করিতে এমন একটা গম্ভীর আত্মমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন যাহার ছাপ তাঁহার চলনে, কথায়, অনুপম দীর্ঘ গৌর দেহের মুখে চোখে পড়িয়া গিয়াছিল। মন যে রাজশেখরবাবুর মাখনের মত দ্রব তাহা তাঁহার চোখের চাহনী ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া প্রথমে ধরা যাইত না। সেই কোমলতা ও ঔদার্য্য তাঁহার কথায় বেশী প্রকাশ না পাইয়া কাজেই বেশী প্রকাশ পাইত! সুরেশ এ পর্য্যন্তও জীবনে দাঁড়াইতে পারে নাই, সুতরাং রাজশেখরবাবুর সামনে

তাহার ব্যবহারের সহজ হীনতা ছিল। সেই হীনতা তাহার কথায় ও ব্যবহারের বিনয়ে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিত।

এহেন পুরুষপুঙ্গবের সাম্‌নে পড়িয়া দার্জ্জিলিংয়ের প্রভাতের কুয়াশায় সিক্ত হইতে হইতে সুরেশ প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না। পরে হতচকিতের ভাবে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

প্রণাম করিয়া উঠিবার পর রাজশেখরবাবু বলিলেন, শরীর ত ভাল নেই দেখছি।

সুরেশ বলিল, না নেই।

—যাক্ তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল রেস্তোরাঁটায় গিয়ে বসি।

উভয়ে গিয়া সাহেবী কায়দায় সুসজ্জিত এক রেস্তরাঁর একটা সুসজ্জিত শূন্য কামরায় বসিলেন। ঘরের জানালা বন্ধ ছিল। রাজশেখরবাবু শীতের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। তখনও কুয়াশা কাটে নাই, সূর্য্যের আলো কেবলই আসিয়া পড়িতেছিল। সেই জানালা দিয়া দেখা গেল দূরের ঘুম পাহাড়ের উপর দিয়া সেই পাতলা কুয়াশা ভেদ করিয়া একখানা গাড়ী সাপের মত বাঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসিতেছে।

কিভাবে কথাটা আরম্ভ করা হইবে বুঝিতে না পারায় উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কতকটা কড়া সুরে রাজশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার টেলিগ্রামটার উত্তর দিলে না কেন?

সুরেশ কোন উত্তর করিল না।

রাজশেখরবাবু বলিলেন, তাতে তোমার দোষ নেই। সেই সময়ে তোমায় দেওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল না।

ইহার পর জজ যেমন জুরিদের কাছে চার্জ্জ দাখিল করিয়া যান, ঘটনা বিবৃতির সঙ্গে উহার প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ করিয়া রাজশেখরবাবুও তেমনি ঘটনাটা সুরেশের নিকট আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেলেন।

সুরেশ অবাক্-বিস্ময়ে রাজশেখর বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

কাহিনীটা সমাপ্ত করিয়া রাজশেখরবাবু বলিলেন, কমিশনারের সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট আছে আমার। চল এখনই আমার বাসায় যাই। সুরবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ এখনই হবে।

সুরেশ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। পরে কতকটা থতমতের ভাবে বলিল, আচ্ছা ভেবে দেখি একবার।

রাজশেখরবাবু বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে। বিকালে তোমাকে এসে আমি নিয়ে যাব।

সুরেশ স্বীকার করিল। রাজশেখরবাবু সুরেশের ঠিকানা লইয়া গেলেন।

হোটেলে পৌছিয়া সুরেশ নিজের নির্জ্জন কামরায় গিয়া চেয়ারে বসিয়া মনের স্থির দৃষ্টিতে ব্যাপারগুলি আলোচনা করিয়া দেখিল। ভাবিল, এসব কি সত্য? না সে স্বপ্ন দেখিতেছে? সবই যে এক রোমাঞ্চকর উপন্যাসের কাহিনীর মত। দ্রুতগামী রেলগাড়ী হইতে মেয়ে মানুষ লাফাইয়া পদ্মার জলে পড়িল; মরিল না। ভবনাথ জাল চিঠি দিয়া তাহাকে প্রতারিত করিল। পরে চমক-দেওয়া বিচারে তাহার দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল! সুরবালা বড় ধরণের নাগরিক সম্মানে সম্মানিত হইল।

এতদিন ধরিয়া সুরেশের দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা সুরেশ নিজেই জানে। নিজের সমাজ হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিছিন্ন হইয়া দেশ বিদেশে সে নিঃসহায়ভাবে ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ঝাড়ের

সময় নৌকার রশি ছিঁড়িয়া গেলে ও নৌকা না ডুবিলে যেমন উহা দিশেহারা হইয়া চলে ঘুরিতে ঘুরিতে সে সেইরূপ এতদিন ঘুরিতে ঘুরিতে দিশেহারা হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার আঁধার জীবনের আকাশের কোন ছোট ফাঁক দিয়াই এতদিন আলো প্রবেশ করে নাই। ঝড় বহিয়া গিয়াছে কেবলই শন শন করিয়া।

সুরবালার পলায়নের চিঠি পাইবার দিন সে যেরূপ চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল আজও বাসায় ফিরিয়া সেইরূপ ভাবেই শুইল। কিন্তু আজকার চিন্তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন স্বস্তি ও গোপন আনন্দের হাওয়া বহিয়া তাহার মনটাকে তাহার অজ্ঞাতে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছিল। তাই আজ তাহার চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, সে শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

রান্নার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া খাইতে ডাকিল। সে কোন সাড়া দিল না। সে নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল কোন মায়ামন্ত্রে তাহার মনের ব্যাধি সারিয়া গিয়াছে, মন পূর্ব্বের ন্যায় সজীব ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে ঘটনাগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিল। সুরবালাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

(৫৫)

রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সুবিমল কাশীতে।

সে ভোরে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় বসে ও দীর্ঘ সময় উহাতে অতিবাহিত করিয়া দেয়। পরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রতীকের সামনে অপার ভক্তিতে চোখ বুঁজিয়া তাকাইয়া

থাকে। মনের নীরব আকুলিত প্রার্থনায় বলে, হে ভগবান, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও, পবিত্র কর আমাকে।

মাছ মাংস ত্যাগ করিয়াছে সে। মাঝে মাঝে সে মুগের ডাল রাঁধে। মসুরির ডালে মাংসের গুণ আছে ও উহা সাত্ত্বিক মানসিকতার পরিপন্থী এই ধারণা থাকায় উহা সে পরিহার করিয়া চলে।

সে প্রায়ই ঘি ভাত ও তরকারি সিদ্ধ করিয়া হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খায়, কাঠের উপর শোয়, বালিশের পরিবর্ত্তে কতকগুলি বই জড় করিয়া মাথায় দেয়।

দুপুরে সে গীতার মন্ত্র স্তব করিয়া পড়ে। সন্ধ্যায় সে নিবিষ্ট মনে স্তোত্র পাঠ করে।

অবসর সময়ে সে মনে মনে গায়ত্রী পাঠ করে হাজার দুই হাজার বার।

দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া সে তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

শুধু তাহাই নহে। যোগাসনে বসিয়া জিভ জড়াইয়া সেই জড়ানো জিভের মধ্য দিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া বসিয়া সে গভীরভাবে ধীরে ধীরে শ্বাস টানিয়া লয় অবশ্য সেই সিঁদুরের ফোঁটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া। কখনও কখনও পা দুখানি সে সমানভাবে মাটির উপর পাতিয়া সোজা হইয়া বসে ও ধীরে ধীরে অবনত হইয়া নাকটা দুই জানুর সন্ধির সঙ্গে ঠেকায়। এই কাজে তাহার শির-দাঁড়ার হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তথাপি সে পশ্চাৎপদ হয় না।

একবার মাসখানেক সে শুধু আলু ভাতে ভাত প্রচুর ঘি-এর সহযোগে বিনা লবণে উদরস্থ করিল।

কিন্তু এত চেষ্টার পরও মন কিন্তু তাহার বাগ মানিল না। কচিৎ কখনও যখন সে বিশ্রাম পায় ও অসতর্কভাবে বসিয়া থাকে তখন শৈলর ছবিটা জোর করিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দিশেহারা করিয়া দেয়।

রাত্রিতে সে স্বপ্নে দেখে শৈলকে বাঘে তাড়া করিয়াছে। আর সে অমিত বিক্রমে বাঘকে হত্যা করিয়া প্রবল আকর্ষণে শৈলকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। শৈলও মুক্তি পাইয়া তাহাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে কাঁপিতেছে।

স্বপ্নের পর হঠাৎ জাগ্রত হইয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসে ও ভয়ে তাহার শরীর ঘামিয়া যায়।

কিন্তু যখন সে নিজেকে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না, তখন একদিন সে ভাবিল, ব্রহ্মচর্য্য সাধনা তাহার মত কাপুরুষের সাজে না।

সেই দিনই সে চুল ছাঁটাইয়া দাড়ি কামাইল ও দীর্ঘকাল ধরিয়া সাবান দিয়া গা মাজিয়া শরীর ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করিল। পরে সে ভাল জামা কাপড় ও বুরুশ-করা জুতা পরিয়া আবার রীতিমত বাবু হইয়া উঠিল।

সে প্রতিজ্ঞা করিল আর সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে না, সে স্রোতের তৃণের মত জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইবে ও শীঘ্রই কাশী হইতে চলিয়া যাইবে।

এই অবস্থায় একদিন বিকালে রাস্তায় এক বৃদ্ধ খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই ধরেছি।

সুবিমল চমকিয়া উঠিয়া অবাক্ হইয়া বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হাঁ করে রইলি যে! চিন্‌তে পারিস্‌নি আমাকে? বোকা কোথাকার!

এতক্ষণে সুবিমলের মনে পড়িল। বলিল, ওঃ।

এই বলিয়া সে অবনত হইয়া চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বেশ! কোথায় আছিস্? আমার বাসায় চল।

—আপনার বাসা!

—সে কথা পরে হবে! তোর বাপ মা এখানেই আছেন!

—এখানেই আছেন?

—অবাক্ হয়ে রইলি যে?

সুবিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শান্ত স্বরে বলিল, না অবাক্ হইনি।

—তবে চল।

—না।

—তার মানে?

—বাবা মার সঙ্গে আমি এখনই দেখা করতে পারবো না।

—কারণটা আমি বেশী জানি। আমি চিনি তোর বাবা মাকে। তোদের সব কথাই আমি জানি! চল! আর দেরী করে কাজ নেই!

—আমায় কি একটু চিন্তা করবার সময় দেবেন না?

—যাচ্ছিস্ তো আমার বাসায়। চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবি সেখানে।

চন্দ্রকান্ত কথাগুলি এমন ভাবে উচ্চারণ করিলেন যাহার ভিতর স্নেহ ও শাসন মধুরভাবে জড়িত ছিল।

পরিশেষে কিছুক্ষণ চিন্তার পর সুবিমল বলিল, চলুন তবে।

পথে চন্দ্রকান্ত সব কথা বলিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, শৈল তাঁহার বাসায়ই আছে, সুশীলা পরেশ বাবুর বাসাতে আছেন।

চন্দ্রকান্তের বাসায় উপস্থিত হইয়া সুবিমল চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসিল। পরে সে চন্দ্রকান্তের কথামত বাড়ীর ভিতর কলতলায় হাত মুখ ধুইতে গেল।

চন্দ্রকান্ত বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন।

হাতমুখ ধোওয়া শেষ করিয়া যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল তখন সে দেখিল সাম্‌নের ঘরের খড়খড়ি আস্তে আস্তে উঠিতেছে ও পড়িতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে এক নারীমূর্ত্তির পরিপুষ্ট সুগঠিত আঙ্গুলগুলি খড়খড়ির পাল্লায় স্থাপিত হইয়া সেইরূপভাবেই উঠিতেছে ও পড়িতেছে। দেখিয়াই সে মুখ অবনত করিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার যখন সে চোখ ফিরাইল তখন সে দেখিল খড়খড়ি সম্পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে ও তাহার ফাঁকে এক গৌরী নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া লজ্জারষ্টভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

সুবিমল চাহিবামাত্রই খড়খড়ির ফাঁক দিয়া চোখে চোখ পড়িল। অকস্মাৎ শক্ত পাথর-চূর্ণ-করা আঘাতের ন্যায় আঘাতে বুকের ভিতর প্রবল জোরে ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রবল সংযমে মুখ অবনত করিল।

আবার কিছুক্ষণ পরে যখন সে দেখিল তখন দেখিল জানালার এক কবাট খুলিয়া গিয়াছে ও তাহার পিছনে শৈল জানালার কাঠের উপর ভর করিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পাগল-করা আত্মসমর্পণের ভাবে তাহার দিকে লজ্জারষ্ট অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

যে চিন্তাচক্রের বৃত্তরেখা কৃষকবধূকে কেন্দ্র করিয়া ইতিপূর্ব্বে অসম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল এই ঘটনায় উহা নিদারুণভাবে সম্পূর্ণ হইয়া আঁকা হইয়া গেল। সংযমের বাঁধন সুবিমলের একেবারে আল্‌গা হইয়া গেল। প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় উৎপাটিতমূল গাছের ন্যায় সে

নিজের ভারকেন্দ্র একদম হারাইয়া ফেলিলে ও মনের ভিতর সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বীর্য্যবান্ প্রাণের সমস্ত বলিষ্ঠ আবেগ নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিষ্টভাবে চোখে চোখে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

থর থর করিয়া তাহার বলিষ্ঠ দেহ কাঁপিতে লাগিল। উত্তেজনার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার বুকে পিঠে খিল ধরিল।

তাহার হৃৎপিণ্ডে জোরে ঘন ঘন ভারি লোহার হাতুরির ঘা পড়িতে লাগিল ও সেই আঘাতের স্পষ্ট বিশাল শব্দ আরও স্পষ্টভাবে তাহার কানে গিয়া পৌছতে লাগিল।

শৈলর উচ্ছ্বাসে চোখ ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

জগৎ তাহাদের নিকট লুপ্ত হইয়া গেল। লুপ্ত হইয়া গেল বাহিরের চেতনা তাহাদের গভীর প্রাণের উগ্র চেতনার মধ্যে।

সুবিমল বুঝিল তাহার হৃৎপিণ্ড বেশী জোরে জোরে ঘা দিতেছে; এইরূপ অবস্থায় চলিলে সে ফিট হইয়া পড়িয়া যাইবে। সে আশ্রয়ের জন্য কলতলার ছোট প্রাচীরের উপর বুক রাখিয়া দাঁড়াইল।

আবার সেই পাগল-করা আত্মসমর্পণ চলিল। প্রাণে প্রাণ মিলিয়া গেল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিয়াছে তাহা সুবিমল জানে না। হঠাৎ সে চন্দ্রকান্তের উচ্চ হাসিতে চমকিয়া উঠিল। দেখিল বৃদ্ধ কাঁধের উপর মৃদুস্পর্শে নিজের হাতখানি রাখিয়া উচ্চ হাসি হাসিতেছেন।

লজ্জায় সুবিমলের মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

শৈলও লজ্জায় চন্দ্রকান্তের চোখের সামনে হইতে ছায়ামূর্ত্তির মত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

সুবিমলের সমস্ত উন্মত্ততা নিমিষের মধ্যে উবিয়া গেল।

উচ্চবেগে হাসিতে হাসিতে নুইয়া পড়িতে পড়িতে চন্দ্রকান্ত শৈলর মার ঘরের দিকে রওনা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, নাঃ; থাক্ এখন। পরে ওকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে।

সুবিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, চল তোর বিশ্রামের ঘর দেখিয়ে দেই গে চল।

ঘরে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, বিশ্রাম কর এখন। মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা কর একটু। সন্ধ্যের পর কথা হবে।

এই বলিয়া আবার উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাকী দিনটা কাটিল সুবিমলের বড়ই দুঃখে।

সন্ধ্যায় উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। সুবিমল লজ্জায় প্রথমে কথা বলিল না। চন্দ্রকান্ত অপরাহ্নের ঘটনা ইঙ্গিতের দ্বারাও উল্লেখ করিলেন না। বরং এমন প্রাণখোলা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে পরিশেষে জীবনের সমস্ত কথা চন্দ্রকান্তের নিকটে সুবিমল বলিতে বাধ্য হইল।

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া চন্দ্রকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, আস্ত মূর্খ তুই বিমল, আস্ত একটা মূর্খ।

সুবিমল অপ্রতিভ হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন?

—কেন আবার কি? যে কামকে শিব পর্য্যন্ত প্রথমে দমন করতে না পেরে মদনকে ভস্ম করেছিলেন, তাই তুই সামান্ত মানুষ হয়ে গিয়েছিলি নিরোধের দ্বারা দমন করতে? বাহাদুর বটে!

সুবিমল তাকাইয়া রহিল, উত্তর করিল না।

—হাঁ করে রইলি যে বড়! বোকা কোথাকার! আমি বলছি কুমার-সম্ভব কাব্যের কথা। শিব তপস্যায় বসেছেন; পার্ব্বতী যাচ্ছেন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে। লাল কাপড় পড়েছেন তিনি। সে কাপড় ঈষৎ স্খলিত হয়ে পড়েছে বুক হতে। আবার ঐ জিনিষটাই আবার কি রকম জানিস্? মুখ নীচু করে রইলি যে?

এই বলিয়া চন্দ্রকান্ত উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, বুড়োর কাছ থেকে একটু কাব্যরস শুনে যা। ওর ভারে দেবী ঈষৎ নুয়ে পড়েছেন। কেশর ফুলের গুচ্ছের দ্বারা তৈরি করে নিয়েছেন মাজার চন্দ্রহার। তাও চলবার সময় ঠিক থাকেনি! নেমে পড়েছে ঐ আভরণ। দেবী কি করছেন? স্রস্তাং নিতম্বাৎ কেশরদামকাঞ্চিম্। তিনি চলতে চলতে উহা টেনে ওঠাচ্ছেন।

যাক্ আর কি হচ্ছে? ভ্রমর কি করছে? ভ্রমর? করছে কি ভ্রমর ব্যাটা? এ্যাঁ! সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণম্। দেবীর সুগন্ধ নিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরের তৃষ্ণা ভয়ানক ভাবে বেড়ে গিয়েছে।

এই জায়গায় উচ্চ হাসিতে তরলায়িত করিয়া কৌতুকহল-মিশ্রিত স্বরে চন্দ্রকান্ত বলিয়া উঠিলেন, বেটা লম্পট! লম্পট বেটা! এ্যাঁ! এ্যাঁ! তাই উড়ে বেড়াচ্ছে দেবীর বিম্বের মত লাল ওষ্ঠাধরের কাছাকাছি দিয়ে। বিম্বাধরাসন্নচরং। আর দেবী কি করছেন প্রতিক্ষণ সম্ভ্রমং লোল-দৃষ্টিং লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী। ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বেটাকে লীলা মাধুর্য্যে তাড়িয়ে দিচ্ছেন হাতের পদ্মফুল দিয়ে। কেমন হ'ল বল দেখি ছবিটা? অমন রূপ, তার ওপর হাতে পদ্ম, তার পর লীলা। এ ছবি কি কেউ আঁকতে পারে? তার ওপর দেবতার উচ্চ পবিত্র ভাবটা ফোটাতে হবে। যাক্। অবস্থাটা কি হ'ল? সব তৈরি, সব ঠিক ঠাক্। মদন বেটা কাছে কাছে দিয়েই ঘুরে

বেড়াচ্ছিল। এই অবস্থায় ও কি করলে? ধনুকে বান চাপালে। কিন্তু বান আর ছোড়া হলনা। শিব ব্যাটার তপস্যা ভেঙে গেল।

এই জায়গায় জোরে বলিলেন, গাঁজাখোরটার অবস্থা কি হল জানিস্? গাঁজাখোর শিবটার? এ্যাঁ! তিনি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ। কিরূপে চঞ্চল হলেন। চন্দোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশিঃ। যেমন চন্দ্রোদয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জলরাশি, কিন্তু শীঘ্রই তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন।

শিব ভয়ানক রেগে গেলেন তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায়। তপঃপরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোঃ। সর্ব্বনাশ! স্ফুরদুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াৎ। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল প্রলয়ের আগুন কপালের চোখ থেকে। দেবতারা ভীত হয়ে গেলেন। আকাশ থেকে কাতরভাবে ডেকে বল্লেন তাঁরা, ক্রোধ সম্বরণ করুন প্রভু, সম্বরণ করুন প্রভু ক্রোধ। কিন্তু তাঁহাদের কথা শেষ হতে না হতেই মদন ভস্ম হয়ে গেল।

পার্ব্বতীর কি হল? এ যাত্রায় তিনি নিষ্ফল হয়ে গেলেন। কিন্তু কতদিন গাঁজাখোরটা ঠিক থাকবেন? ঠিক থাক্‌বেন কতদিন? এ্যাঁ!

পার্ব্বতী ভয়ানক তপস্যা আরম্ভ করে দিলেন। পরে শিব বাধ্য হয়ে দেখা দিলেন। যখন তিনি পার্ব্বতীর হাত চেপে ধরলেন তখন পার্ব্বতীর অবস্থা কি হল জানিস্? কি অবস্থাটা হল? মানুষের মতই মুষড়ে পড়লেন তিনি! চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা। তিনি চলে যাচ্ছিলেন। বুক হতে তাঁর বল্কল খসে পড়ছিল। মুক্ত সৌন্দর্য্যে, পাহাড় পর্ব্বতের ভেতর। এই অবস্থায় তিনি ধরা পড়লেন। তাং বীক্ষ্য বেপথুমতী। শিবকে দেখে দেবী ভয়ানক কাঁপতে লাগলেন। সরসাঙ্গযষ্টিঃ। তার সমস্ত শরীরে রসসঞ্চার হয়ে গেল। চলবার জন্ত এক পা ওঠালেন, কিন্তু পা নিক্ষেপ করা হল না। পাটা শূন্তেই রয়ে গেল।

আখ্যান শেষ করিয়া চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ স্মিতমুখে সুবিমলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে পূর্ব্ব চিন্তার হারানো খেই ধরিয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ বলছিলেম যাতে ভগবান মহাদেবেরই চিত্তচাঞ্চল্য সম্ভব হয় তা তুই মানুষ হয়ে নিরোধ করতে গিয়ে বাতুলের কাজ করেছিস্।

—তবে কি জীবনে সংযমের স্থান নেই?

—আছে বই কি। নিশ্চয় আছে। তবে সাধারণ জীবনে কঠোর নিরোধের দ্বারা নয়।

—বিবাহিত জীবনে কি দেশের কাজ করা চলে?

চন্দ্রকান্ত জোরে বলিয়া উঠিলেন, বোকা কোথাকার! মেয়েমানুষ ছাড়া কি কেউ কোনও দিন বড় হতে পারে ব্যাটা? তবে মেয়েমানুষটা ভাল হওয়া চাই। শৈল ভাল মেয়ে। তোর ভাগ্য ভাল। জীবনে অনেক ভাল কাজ করতে পারবি তুই।

কিছুক্ষণ পরে যখন সে একাকী থাকিবার সুযোগ পাইল, তখন সে মনের ভিতর চাহিয়া দেখিল তাহার মনের সমস্ত বাঁধন টুটিয়া গিয়াছে। সে প্রবল উৎসাহে মনে মনে জোরে বলিয়া উঠিল মুক্ত, মুক্ত সে।

বিপুল উল্লাসে সে একটা গান ছোট সুরে গাহিতে গাহিতে ঘরের মেঝের উপর পাইচারি করিয়া বেড়াইল। সমস্ত জগৎটা তাহার সাম্‌নে পরিষ্কারভাবে খুলিয়া গেল। তাহার মনটা পাখীর মত হাল্কা হইয়া গেল।

শেষ রাত্রিতে সুবিমল হঠাৎ ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিল, শৈলকে পাইবার জন্য তাহার মন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সে আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। প্রবল অস্থিরতায় উঠিয়া সে পাইচারি করিবার উদ্দেশ্যে বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল।

বারান্দায় পৌছিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল শৈলও পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সুবিমলকে দেখিয়া শৈল চমৎকৃত হইয়া গেল। সে থমকিয়া গেল ও বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাঁড়াইল। সুবিমলও শৈলর প্রায় কাছাকাছি গিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

নিশীথ রাত্রিতে নিরালায় যুবতী নারীর কাছাকাছি দাঁড়ানো এই তাহার প্রথম।

উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

এই সময়ে দমকা হাওয়ায় সুবিমলের ঘরের ভেজান দরজাগুলি সব একসঙ্গে বিশাল শব্দে খুলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ দরজা জানালা লইয়া ছুটোপুটি করিবার পর দূরে আম-গাছের পাতায় পাতায় কি যেন চুপি চুপি বলিয়া হাওয়া আকাশে মিলাইয়া গেল।

শৈল পূর্ব্বের অবস্থায় দাঁড়াইয়াই এক হাতের নখ দিয়া অপর হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

কোন পক্ষেই কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে সুবিমল দুর্জ্জয় সাহসে শৈলকে ডাকিয়া বলিল।

এই ধরণের কথা এই তাহার নূতন। গলার স্বরটা কাঁপিয়া গেল। বলিল, শৈল ?

শৈল শান্তভাবে উত্তর দিল, বলুন।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কম্পিত স্বরে সুবিমল বলিল, চল আমার ঘরে গিয়া বসি একটু।

কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়া চলিল শেষরাত্রির গভীর নির্জ্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে। উচ্চারিত হইবার পর পরই কথাগুলি সুবিমলের কানে ভয়ানক বেসুরা ভাবে বাধিতে লাগিল।

শৈল কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আরও বেশী সাহস সংগ্রহ করিয়া সুবিমল আবার বলিল, চল, যাবে না ?

শৈল কোন উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুবিমলের মাথায় হঠাৎ পাগলামি চাপিয়া বসিল। সে লজ্জার মাথা খাইয়া খপ্ করিয়া শৈলর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় শৈল প্রবল বিরুদ্ধতার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায় ভয় ও অস্থির ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে করিতে মনের সমস্ত শক্তির দ্বারা চাপা স্বরে বলিয়া চলিল, ছাড়ুন, ছাড়ুন, আঃ, কি লজ্জা ! আঃ ! বল্‌বে কি লোকে দেখলে ! ছাড়ুন। আঃ, ছাড়ুন বলছি। কি যে বিপদ ! আমি চীৎকার করবো কিন্তু ! ছাড়ুন বলছি !

শৈল চীৎকার করিল না।

সুবিমল দমিল না। শৈলর এই প্রবল অসম্মতির ভাব প্রকাশ করার অবস্থায়ই সুবিমল সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ভুলিয়া গিয়া শৈলকে টানিয়া লইয়া ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বালা ছিল। ঘরে পৌঁছিয়াই সুবিমল টান দিয়া শৈলকে বিছানার উপর বসাইয়া দিল, ও পরে অবিচলিত পদবিক্ষেপে ঋজুভাবে অগ্রসর হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল ও পুনরায় ঐ ভাবেই অগ্রসর হইয়া শৈলর সামনে চেয়ার রাখিয়া তাহার উপর গিয়া বসিল।

কিন্তু বসিয়া থাকিতে কিছুতেই চাহিল না শৈল। সে ঘর ছাড়িয়া যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুবিমল আবার জোরে টান দিয়া তাহাকে পূর্ব্বের স্থানে বসাইয়া দিল।

টানাটানিতে শৈলর বাঁধা চুল খসিয়া গিয়াছিল। সে চুল বাঁধিতে লাগিল।

সুবিমল বসিয়া রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

পূর্ব্বেও অনেকবার দেখিয়াছে সে, কিন্তু আজ আরা মনের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার মধ্যে নূতন করিয়া এই নূতন অভাবনীয় অবস্থায় তাহাকে দেখিল।

দেখিল এরূপ অপরূপ রূপ নারীদেহে কোনও দিনও কোথায় সে দেখে নাই।

আজ পর্য্যন্ত নিভৃতে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সে কোনও দিনই কোন নারীর সম্পর্কে আসে নাই। পূর্ব্বে সে কোনও দিনই সুন্দরী পরিপুষ্টশ্রী সাহসী যুবতী নারীর দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে নাই। বিষম লজ্জায় চোখ অবনত করিয়াছে সে যখনই সেইরূপ নারী তাহার টানা চোখের দৃষ্টিতে তাহার দিকে স্থিরভাবে চাহিয়াছে। তাহার উন্নত বক্ষ ও বিশাল নিতম্বের পরিমণ্ডল বিদ্যুৎঝলকের মত ধাঁধাঁর অস্পষ্টতায় তাহার চোখে পড়িয়া তাহাকে সম্মোহে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে ও ধাক্কা দিয়া তাহাকে পিছাইয়া দিয়াছে। সহরের পাড়ার ভিতর অপরাহ্নের ভ্রমণের সময় কচিৎ কখনও সুবেশা সুন্দরী নারীর দল যখন পাতায় ঢাকা গাছের আবডাল হইতে

অগ্রসর হইয়া সরু রাস্তার বাঁকে তাহার সামনে হঠাৎ পড়িয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছে তখন সে 'একি ?' এই কথাটা অস্ফুটভাবে বলিয়া চমকিত হইয়া রাস্তার এক পাশ ঘেঁসিয়া চোরের মত কোথায় পলাইবে, কোথায় পলাইবে, এই ভাবে সেই দল এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়ের দল এই বলিষ্ঠ যুবকের মুখচোরা ব্যবহার দেখিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িয়াছে।

দূর হইতে পিছন ফিরিয়া সুবিমল সেই হাসি দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

আজ নিশীথ রাতের স্তব্ধতার মধ্যে এই রক্তে মাংসে গড়া যুবতী, আশ্চর্য্য সুন্দরী রমণীর সামনে বসিয়া সে স্থির অটল হইয়া রহিল। হৃৎপিণ্ডের গতি ও মস্তিষ্কের শক্তি তাহার অচল হইবার উপক্রম করিল।

চুল বাঁধা শেষ হইলে একটু সোজা হইয়া বসিল শৈল। পরে ক্ষণিকের জন্য সুবিমলের উপর বিদ্যুৎ হানিয়া অসীম লজ্জায় সে চোখ অবনত করিল।

এই কটাক্ষ নিমেষের ভিতর সুবিমলের হৃদয় ভেদ করিল। এই কটাক্ষই তাহাকে আশ্রমে বানচাল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। সেখানেও এইরূপ ভাবেই শৈল চাহিয়াছিল, এইরূপ ভাবেই সে চোখের আগুন হানিয়াছিল।

পলকহীন চাহনীতে চাহিয়া রহিল সুবিমল সুদীর্ঘকাল। পরে কম্পিত কণ্ঠে ছোট অস্পষ্টস্বরে বলিল, শৈল।

কথাটা এই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে অসাধারণভাবে স্পষ্ট হইয়া শুনা গেল।

শৈল কোন উত্তর করিল না।

সুবিমল কথার সুর আরও কোমল করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে বলিয়া বলিল, শৈল, আমার অবস্থা দেখে কি একটুকু দয়াও হয় না তোমার শৈল ? তোমার ভালবাসা না পেলে যে আমি পাগল হয়ে যাব শৈল ?

কথাগুলির ভিতর কোন বৈচিত্র্য ছিল না। হাজার হাজার প্রেমিক যুবক পাগলামির ঘোরে এইরূপ কথাই বলে। কিন্তু কথাগুলির ভাব-গৌরব বিচক্ষণের নিকট যত কমই থাকুক না কেন, ঐগুলি শৈলর হৃদয়ে জোরে ঘা দিল। সে আর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

অস্পষ্ট স্বরে সেও বলিল, বলুন।

আর কোন বাধা টিঁকিল না। সুবিমল চেয়ারখানি আবেগে আর একটু আগে সরাইয়া লইয়া শৈলর ডান হাতের পাতা ভাঁজ করিয়া নিজের ডান হাতের দ্বারা ধরিয়া চাপিয়া ধরিল।

শৈল আপত্তি করিল না। তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার বুক ঘন ঘন ওঠা নামা করিতে লাগিল। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন উঠিতে ও পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সুবিমল শ্বাসরুদ্ধভাবে বলিল, শৈল, আমার ব্যবহারে কি বিরক্ত হয়েছিস্ ?

শৈল কোন উত্তর করিল না। পলকের জন্ম অর্দ্ধনিমিলিত দৃষ্টি হানিয়া স্বপ্নের ঘোরে চোখ অবনত করিল।

এই দৃষ্টিতে সুবিমল শৈলর নিকটে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই সে যন্ত্রচালিতবৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া শৈলর বাম পাশে বসিল। পরে নিজের ডানহাতখানি শৈলর কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া বামহাত দিয়া শৈলর ডান হাত টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। পরে প্রলাপের স্বরে বলিল, শৈল।

শৈল কোন উত্তর করিল না।

সুবিমল দেখিল শৈলর চোখ দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে ও সে রুদ্ধ কণ্ঠে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

এই দৃশ্যে সুবিমলের আড়ষ্ট উত্তেজনা আড়ষ্ট সম্ভ্রমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিবার পর সে গভীর ভালবাসায় শৈলর মাথাটা টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল।

এইরূপভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর ভাবের এক সন্ধি সময়ে সুবিমলের মাথায় এক খেয়াল চাপিল। সে হঠাৎ শৈলর গলা বাহুবেষ্টিত করিয়া সেই বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত, চুরি-করা নিশীথের টুকরার বিশাল নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহার স্ফুট কোমল ওষ্ঠাধরে দৃঢ় চুম্বনে চুম্বন করিল।

এই চুম্বনে সুরাসুরমথিত ক্ষীর সমুদ্রের অমৃত ছিল।

এই চুম্বনে মোহিনীর উন্মত্ততা ও মায়া ছিল।

সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, তীব্র সৌন্দর্য্যের সারাংশ তরঙ্গায়িত হইয়া এই চুম্বনে অবস্থিত ছিল।

তারে তার মিলিয়া গেল। নীরব, নিথর এই সংযোগে তাহারা অসীমতার অতলতলে ডুবিয়া গেল।

কত গোপন কথা তাহাদের বলিবার ছিল, সব কথাই যেন বলা হইয়া গেল এই স্পর্শের বিরাটতায়। কোন কথাই বলা হইল না, সব কথাই সম্মোহের অতলতলে ডুবিয়া গেল।

এই নিবিড় আত্মসমর্পণের অবস্থায় অকস্মাৎ শব্দ হইল, তারা, তারা।

এই শব্দে উভয়েই জাগ্রত হইল প্রথমে অসম্পূর্ণভাবে। পরে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া চমকিত বিস্ময়ে উভয়েই বুঝিতে পারিল চন্দ্রকান্ত জাগ্রত হইয়াছেন, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

পরে উভয়েই ছাড়াছাড়ি হইয়া মেঝের উপর গিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই সুবিমল গিয়া জানালা খুলিয়া দেখিল তখনও পূর্ব্বের পরিষ্কার আকাশে দূরের অস্পষ্ট বিস্তৃত গাছের মাথার উপর শুকতারা সেই রাত্রির নিদ্রাহীন প্রহরীর ন্যায় উজ্জ্বল পবিত্রতার প্রতীক স্বরূপ অসাধারণ শুভ্রদীপ্তিতে দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিল প্রভাতের আঁধারে পরিলুপ্ত শিশির-ভেজা গৃহ-সংলগ্ন বাগান হইতে হাস্‌না হানার, সুবাস ভাসিয়া আসিয়া ঘর ভরিয়া দিয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া সুবিমল বলিল, দেরী আছে সূর্য্য উঠতে।

এতক্ষণে শৈলর মুখ দিয়া কতকটা কথা ফুটিল। সে সুবিমলের মুখের দিকে চকিতা হরিণীর চাহনীতে চাহিয়া বলিল, যাই তবে আমি?

সুবিমল শান্ত স্থিরদৃষ্টিতে দুই হাত দিয়া শৈলর মাথা চাপিয়া ধরিয়া গভীর সোহাগে তাহার চোখে চোখে চাহিয়া রহিল। পরে তাহার ওষ্ঠাধর পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল, যাও।

সুবিমল শৈলকে ছাড়িয়া দিল। যখন পরক্ষণেই শৈল চলিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল তখন সুবিমল বলিল, দাঁড়াও শৈল।

শৈল দাঁড়াইল।

সুবিমল নিজের দুই হাত দিয়া শৈলর দুই হাত ধরিয়া তুলিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, একটা কথা শৈল।

শৈল ভীরু চাহনীর শান্তদৃষ্টিতে সুবিমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবিমল বলিল, কথা এই, বিয়ে আজ আমাদের এখানেই শেষ হয়ে গেল।

শৈল কোন উত্তর করিল না।

সুবিমল বলিয়া চলিল, জান্‌বে এই বিয়ের সাক্ষী রইলেন স্বয়ং ভগবান, সাক্ষী রইলেন আকাশের পবিত্র তারা।

এই কথা বলিবার পর সুবিমল হঠাৎ শৈলর দুই হাত জোরা লাগাইয়া নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিল ও সেই ধরা-অবস্থায়ই সে মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। পরে উন্মত্ত একান্ত নির্ভরতার দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া ঘরের আবহাওয়াকে বিকম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিল, শৈল ?

এই দৃশ্যে এখনও অপরিণত শৈল নির্ব্বাক হইয়া গেল। পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, বলুন।

সুবিমল বলিল, শৈল, তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ আমার অবস্থা দেখে। আমি পাগলের মত প্রলাপ বকছি। পাগলই হয়েছি আমি। জেনো শৈল, তুমি আমার কল্পনায় সাধারণ নারী নও। তুমি আমার ভাবের রাণী। আজ থেকে সমর্পণ করলেম তোমার হাতে আমি আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্ত্বা। পারবে এই ভার বইতে ?

শৈল কোন উত্তর করিল না।

শৈলর নীরবতায় সুবিমল একপ্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, জোরে বলিল, পারবো না ?

শৈল চরম অবস্থায় পৌছিয়া শান্তস্বরে বলিল, পারবো।

—পারবে আমার আদর্শ নিজের বলে গ্রহণ করতে ?

—পারবো।

সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া শৈলর হাত ছাড়িয়া দিল।

শৈল কিছুক্ষণ হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইল। পরে গভীর শ্রদ্ধায় মাটিতে অবনত হইয়া সুবিমলকে প্রণাম করিল।

প্রণাম শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে সে বলিল, যাই তবে আমি ?

সুবিমল বলিল, যাও।

শৈল আর কোন কথা না বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

কথা ছিল পরের দিন সকালে সুবিমল চন্দ্রকান্তকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

চন্দ্রকান্ত নিয়মিতভাবে ভোরে উঠিতেন। শৌচের কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি শরীরে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া ফুল তুলিতেন, পরে গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গার ঘাটে পূজা শেষ করিয়া তিনি দেবতা দর্শনে বাহির হইতেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতে তাঁহার নয়টা বাজিয়া যাইত।

আজ সুবিমলের সঙ্গে যাইতে হইবে। তবুও বাসায় ফিরিতে তাঁহার আটটা বাজিয়া গেল। তাঁহার পরিধানে রক্ত কৌষেয় বস্ত্র, গলায় নামাবলী, তিনি শিখায় একটি ফুল বাঁধিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত সুবিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বিমল বেলা হয়ে গেল। এর আগে সারতে পারলেম না। আর দেরী করা চলে না কিছুতেই।

সুবিমল বলিল, জুতো নেবেন না আপনি ?

—না; এ পবিত্র অবস্থায় ম্লেচ্ছাচার ভাল লাগে না।

যখন তাঁহারা বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল সেই সময়ে একজন পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিলেন, সুবিমল চৌধুরী থাকেন এই বাড়ীতে ?

চন্দ্রকান্ত একটু উদ্বেগের ভাবে বলিলেন, হাঁ।

সুবিমল চন্দ্রকান্তের পিছনে ছিল। একটু অগ্রসর হইয়া সে কহিল, আমিই সুবিমল চৌধুরী।

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিলেন, আপনি সুবিমল চৌধুরী ?

—হাঁ।

—রংপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন আপনি ?

—হাঁ।

—আপনার পিতার নাম পরেশ চৌধুরী ?

—হাঁ।

—বাড়ী আপনার ?

—রাজসাহী।

পরে অফিসার মহোদয় পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া ফটোর ছবির চেহারার সঙ্গে সুবিমলের চেহারা মিলাইয়া লইয়া দেখিয়া বলিলেন, হাঁ আপনিই বটে।

—ওকে দিয়ে কি দরকার আপনাদের ?

—বল্‌ছি, চলুন। বসি গিয়ে একটু বৈঠকখানায়।

ভদ্রলোক একজন বাঙ্গালী পুলিশ ইনেস্পেক্টর। বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানা ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওকে এখনই গ্রেপ্তার করবার হুকুম হয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে উনি একজন ভয়ানক দরের অপরাধী।

গ্রেপ্তারের কথায় চন্দ্রকান্ত যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য তিনি ইহার অনেক আগেই ভাবিয়াছিলেন এইরূপ একটা কিছু ঘটিবে, তথাপি তাঁহার ধারণা ছিল না ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটিয়া যাইবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দারোগা বলিলেন, একটা কথা বলি ইনেস্পেক্টর বাবু।

ইনেস্পেক্টর বলিলেন, বলুন।

—ও কালই মাত্র এখানে এসেছে। ওর বাপ মায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। যদি আর দেখা না হয় তবে ওঁরা পাগল হয়ে যাবেন।

ইনেস্পেক্টর বলিলেন, তাঁদের আসতে কত সময় লাগবে ?

—এই সংবাদ দিতে ও তাঁদের আসতে যতটুকু সময় লাগে ।

—দিন, দিন, সংবাদ দিন, আসুন তাঁরা ।

সংবাদ পাইয়া পরেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন । পিতাকে প্রণাম করিয়া সুবিমল হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। পরে পরেশ পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পরে সুবিমল যখন মাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল তখন তিনি তাহাকে বুকে টানিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোকে না দেখে মরে যাব বাবা, মরে যাব। কেউ বাঁচাতে পারবে না এবার।

সুবিমল কোন উত্তর করিল না। তাহার কপাল ঘামিয়া গেল। যখন সে মাতার বাহুমুক্ত হইল তখন সে হাতের দুই আঙুল দিয়া সেই ঘাম কপাল হইতে নিংড়াইয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল।

পরিশেষে বাহিরের উঠানে যখন সুবিমলকে লইয়া পুলিশ হাতে হাতকড়ি লাগাইতেছিল তখন শৈল আসিয়া বাহিরের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়াছিল। যখন সুবিমলকে লইয়া পুলিশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল তখন সুবিমল করুণাসিক্ত চকিতের দৃষ্টিতে শৈলর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল। এই চকিতের দৃষ্টিতে চোখে চোখ মিলিয়া গেল। শৈলর চোখ অসাধারণ দুঃখ ও হতাশায় তীব্র হইয়া উঠিল।

যখন পরিশেষে সুবিমলকে লইয়া পুলিশ চলিয়া যাইতে লাগিল তখন এই নিদারুণ দৃশ্য শৈলর বুকে এমন এক ঘা হানিল যাহার আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না। লোকলজ্জার কথা ভুলিয়া গিয়া সে মেঝেতে ফিট হইয়া পড়িয়া গেল।

পরেশ বৈঠকখানার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন

পুলিশ সুবিমলকে লইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল তখন জনতা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিল। পরেশ পুত্রের হাতকড়ি লাগানো চোরের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিলেন না। ভীষণ প্রতিহিংসায় রক্ত-চোখের জলন্ত দৃষ্টি জনতার মাথার উপর দিয়া নিক্ষেপ করিয়া দারোগার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরমা ঘরের এক খাটের উপর বসিয়া জোরে দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বিষম হতাশায় বলিয়া চলিলেন, ওঃ, কোথায় যাব গো? জল! কে আছ তোমরা? আমি যে মলেম!

সুশীলা শৈলকে অজ্ঞান অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া সুরমার ঘরে গেলেন ও পরে আবার ছুটিয়া গিয়া গ্লাসে করিয়া জল লইয়া আসিলেন।

সুরমা এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের সব জল পান করিয়া ফেলিয়া গ্লাস সুশীলার হাতে দিলেন। পরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, সুশীলা ভাই, আমার বুক যে গেল ভাই। ধর আমাকে। মলেম যে!

গ্লাস রাখিয়া দিয়া সুশীলা তাড়াতাড়ি সুরমাকে ধরিয়া বলিলেন, শো ভাই, আমার কোলের উপর শো।

এই বলিয়া তিনি সুরমাকে ধরিয়া নিজের কোলের উপর তাঁহার মাথা রাখিয়া তাঁহাকে শোওয়াইলেন। শৈলর দিকে নজর দেওয়ার তাঁহার অবসর রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে সুশীলার কোলের উপরই তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার নাক ডাকিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার একটু পরে রাজশেখর বাবু নিজে সুরেশের হোটেলে উপস্থিত হইয়া সুরেশকে তাঁহার নিজের বাসায় লইয়া গেলেন।

বিমলবাবু কয়েকদিন আগে দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি রাজশেখর বাবুর বাসায় আছেন।

সুরেশের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরই তিনি সুরেশের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন। আলাপও চলিল মুক্তভাবে। বিমলবাবু একবারও সুরেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিলেন না। বকিয়া যাওয়াই তাঁহার অভ্যাস, তিনি বকিয়াই চলিলেন।

বিমল বলিলেন, দেখুন সুরেশবাবু, বড় অপরাধ করেছি আমি আপনার কাছে।

সুরেশ বলিল, কেন?

আবার বলছেন কেন? আমি আগেই বদমাইসটাকে মাদ্রাজের গাড়ীতে ধরতে পারতেম!

সুরেশ না বুঝিয়া তাকাইয়া রহিল।

বিমল বলিলেন, ওহো, ভুলেই গিয়েছি। আপনি তো কিছুই জানেন না। জানবার কথাও তো নয়।

পরে মাদ্রাজের গাড়ীর ঘটনার কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়া তিনি বলিলেন, ইস্! একখানা ফটো মশাই, একখানা ফটো! তা হলে কি পালাতে পারে বেটা। তথ্খুনি না ধরে ফেলি। ওখানেই না পাহারা-ওয়ালা ছেল পুলিশের! তথ্খুনি না হাতকড়ি লাগিয়ে হিঁচড়ে টেনে ওকে গাড়ী থেকে নামাই! ইস্, একখানা ফটো মশাই, একখানা

ফটো! আমার দোষ নেই মশাই। বউকে বলেছিলেম, ফটোখানা দিও সুটকেশে। মাগী শেষে বলে কি-না মনে ছিল না ওর! জানবেন মশাই, কোন মাগীকে বিশ্বাস করতে নেই। মাগীকে বিশ্বাস করলেন কি মরলেন।

—কি যে বলছেন আপনি!

—হাঃ হাঃ, মাগী বলছি। কথাটা বড্ড বেফাঁস হয়ে গেল মশাই। তা আমাদের বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরোয় প্রায়ই। চোর ডাকাত নিয়ে থাকি কিনা মশাই। সোজা কথায় তো ব্যাটারা জব্দ হয় না কোনও দিন। তা ছাড়া আমি সেকেলে পুলিশের লোক। আমাদের কথায় পরদা নেই জানবেন। তবুও আপনাদের মত highly educated ভদ্রলোকের সাম্‌নে বেফাঁস কথা বের হওয়া উচিত নয়। আর বেরুবে না। না'ক খত দিচ্ছি মশাই। এটা ঠিকই যে মাগীকে বিশ্বাস করতে নেই।

সুরেশ দুঃখের মধ্যেই কৌতূহলী হইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, আবার বেরুল যে বিমলবাবু?

—হাঃ, হাঃ, অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে মশাই। Habit মশাই, habit। ছাড়া বড় শক্ত। আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি মেয়েদের ওপর অন্যায় করছি। আপনারা থাকেন ওপরে ওপরে নিজেদের ভাব নিয়ে। ভাবেন আপনার বৌয়ের মত ভাল আর নেই। আমরা পুলিশের লোক মশাই। এমন ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটে যায় যার ধারণাই আপনারা করতে পারেন না। মেয়ে জাতটাই শক্ত জাত মশাই। ওদের দুটো জীবন আছে মশাই। একটা আপনারা ওপরে ওপরে দেখতে পান, ভারি সুন্দর রঙ-ধরা প্রজাপতির মত, high colour মশাই। অন্যটা ওদের একেবারে নিজের। বড় গোপ-

মশাই, very secret। ডুবুরিও ডুব দিয়ে খোঁজ পাবে না জানবেন। শুনুন একটা ঘটনার কথা বলি। তখন মফঃস্বলে এক থানার চার্জ্জে আছি। সেই সময়ে একটা কেস হাতে এল। সোজা কেস্ নয় মশাই! মার্ডার কেস্! বেমালুম খুন! Cold blood murder. মাগী ছোট জাতের। মাপ করবেন মশাই। এখানে ওরূপ কথা ব্যবহার না করলে রস ভঙ্গ হবে। মাগী চেহারামন্ত, ভারি চেহারামন্ত মশাই। Very beautiful! চোখ দুটী কি টানা! গাল দুটো কি ভরা ভরা! রং কাঁচা সোনার মত। টানা চোখের কি চোখা চাউনি! শুধু চাউনীতেই প্রাণ কেড়ে নেবে। বেটি পাজি। Very wicked মশাই! লাজুকের ভাব, কিন্তু মোটেই লাজুক নয়। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। গম্ভীর অথচ আড়-চোখের চোরা চাহনী সাংঘাতিক। চেহরায় উন্নত ভাব, ঠিক রাজা রাজরার মেয়েদের মত। এখনও মনে করতে বুকের ভেতর রি রি করে ওঠে। দেখলে বুঝতে পারতেন মশাই, বুঝতে পারতেন দেখলে! ত্রিশ বত্রিশ বয়স হবে ওর। লম্বা চেহারা। ঠিক যেন নুরজাহান বেগম। ওর যদিও দ্বীপান্তর হয়েছিল অনেক আগে, transportation for life, কিন্তু ওর চেহারার কথা এখনও আমার মনে আছে। ওর স্বামীটা একটু বেশী বয়সের, খুব জোয়ান যদিও, very strong. তবুও ওর সঙ্গে তার মানাবে কেন? বয়স তো বেশী বটেই! লোকে কিন্তু জানতো ওদের ভেতর ভাব খুব বেশী। যা শুনলেম তদন্তে বেটা বৌ বৌ করে পাগল। ও কোনও দিন সন্দেহ করে নি, no doubt, করবার কারণও হয় নি। কি ভয়ানক! দুপুর রাতে মশাই, দুপুর রাতে। মেরে দিলে বেটী স্বামী ব্যাটাকে। উঃ, গলা টিপে একেবারে সাবাড় করে, একটা ডাকাতের সাহায্যে। সে বুঝতেই পারেন উপপতি। উঃ, ঘুমন্ত অবস্থায় মশাই, ঘুমন্ত অবস্থায়! জ্যোৎস্না রাত। গরমের

দিনে ঘরের দাওয়ায় শুয়েছিল মশাই, হাওয়ার লোভে। ওর দোষ নেই। আর ডাকাত বলছি। ছয় ফুট লম্বা। Six foot high. ভারি জোয়ান মশাই, ভারি জোয়ান। ওর মত একটি লোকও দেখিনি। শেষে করলে কি? ঝুলিয়ে দিলে মরা মানুষটা উঠোনের গাছের ডালে। কে ঝুলিয়ে দিলে শুনবেন? ওই মেয়েটা। That wicked woman! ডাকাত বেটা অস্বীকার করে বললে পারবো না। ওই গিয়ে উঠল দুপুর রাতে গাছের ডালে। ডালে দড়ি গলিয়ে দিলে। আগেই দড়ি বেঁধে দিয়েছিল মরার গলায়। শেষে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লে ও নিজেই। কি ভয়ানক বুঝতে পারেন! মরাটা সট্ করে উঠে গিয়ে ঝুলতে লাগলো। কি ভয়ানক হাতের জোর মশাই? হাতটা ওর ছিল পরিপুষ্ট ও সবল, ভয়ানক বলশালী স্ত্রীলোকের হাতের মত, বলিষ্ট শরীরের সঙ্গে মজবুতভাবে আঁটা। পরে কি করলে ও? নীচের ডালে দড়ি বেঁধে নেমে এল ও। নীচে একখানা টুল উল্‌টিয়ে রেখে দিলে। ঝুলিয়ে দেওয়ার অর্থ কি জানেন মশাই! পুলিশকে ফাঁকি দেবে আত্মহত্যা করে মরেছে। যাক্, ভেবে দেখুন দেখি। এর পর কি মেয়ে জাতকে বিশ্বাস করা চলে? ছোট জাত বল্‌বেন! ও ছোট জাত বড় জাত সব এক মশাই, সব এক। রক্তের টান সব এক দিকে। বিশ্বেস করলেন কি মরলেন। বড় নিষ্ঠুর ওরা মশাই! Very cruel মশাই। বড়ই নিষ্ঠুর! সাংঘাতিক! ওরা যা করতে পারে, তা পুরুষে পারে না। কোমল ওরা কিছুতেই নয়, never soft, যদিও দেখতে ওরা কোমল, আর লোকে বলে কোমল। নিজের ঘরের গিন্নিকে দেখলেই পারেন। Look at your own wife। ওঃ আপনি এখনও নূতন। সে অবস্থায় পৌঁছাননি। পৌঁছবেন একদিন মশাই, পৌঁছবেন। সে দিন দেখবেন রূপসী বাঘিনী হয়ে

উঠেছেন। একেবারে tiger মশাই। একটুও কম নয়। জানবেন মশাই, এটা ঠিকই যে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই।

রাজশেখর বাবু সুরেশকে বাইরের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন ফিরিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া জোরে ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ কর বিমল। দিন রাত কেবল বকর বকর। সুরেশ খাবে না? বিশ্রাম করবে না?

এই কথা বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। এই ধমকে বিমলের কথার সুর নরম হইয়া গেল। কিন্তু তিনি দমিলেন না। ছোট সুরে বলিলেন, বড় অন্যায় করেছি। ওদিকটার কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। তবে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি মশাই! Take care থাকবেন। অনেক দিন পরে দেখা। বেশী আনন্দে heart ফেল না করেন মশাই!

এই সময়ে মিনতি দরজায় আসিয়া বলিলেন, ওকে ছেড়ে দিন কাকা বাবু। যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছেন।

মিনতি চলিয়া গেলে বিমল যুগপৎ চোখ বড় বড় করিলেন ও ঠোঁট দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে বাঁকাইয়া হাঁ করিলেন। ভাবটা, ভয়ানক মেম সাহেব মিনতি। পরে বলিলেন, যাক সুরেশ বাবু, আপনাকে আর আটকাবোনা।

রাত্রিতে সাক্ষাৎটা নাটকীয়ভাবে রোমাঞ্চকর করিবার উদ্দেশ্যে মিনতি আহারের পূর্ব্বে সুরবালা ও সুরেশের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেন নাই, যদিও এরূপ সাক্ষাতে ঐ বাড়ীতে কোন প্রকার বাধাই ছিল না।

আহারের পর শোওয়ার ঘরে গিয়া সুরেশ দেখিল ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালা আছে, আর সেখানে বাসরশয্যার মত শয্যা রচনা করা হইয়াছে, আর সুরবালা শোওয়ার খাটের এক কোণে অপরাধীর ন্যায় বসিয়া আছে।

সুরবালার দিকে চাহিয়া সুরেশ বুঝিল বড় লোকের বাড়ীতে শরীরের মাজা ঘষা চলিয়াছে যথেষ্ট, শরীরও রোগা হয় নাই, তবে মুখের উপর দিয়া একটা স্পষ্ট দুঃখের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে।

সুরবালা দেখিল স্বামী ভয়ানকভাবে শুকাইয়া গিয়াছেন।

সুরেশ খাটের উপর ব্যবধান রাখিয়া অপরাধীর মত নীরবে বসিয়া রহিল। সে উচ্ছ্বাসিত আবেগে সুরবালাকে জড়াইয়া ধরিল না। সুরবালাও ছুটিয়া আসিয়া সুরেশের বক্ষসংলগ্ন হইল না।

কিছুকাল পরে সেই দুঃসহ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুরবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল। চোখের জলে স্বামীর পা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সুরেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পত্নীকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। এই অবস্থায় সুরেশের স্কন্ধের উপর সুরবালা মাথা রাখিল, সুরবালার স্কন্ধের উপরও

সুরেশ মাথা রাখিল উভয়ের চোখের জলে উভয়ের পিঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

নিরুদ্ধভাবের বাঁধ একদম খসিয়া গেল। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়েই ঝাঁকি দিয়া দিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাঁদিল। কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। পরে উভয়েই গিয়া খাটের ধারে পাশাপাশিভাবে বসিল ও উভয়ে উভয়ের চোখের জল মুছাইয়া দিল।

পরে সুরবালা উন্মুখ দৃষ্টিতে সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, ক্ষমা করলে আমায়? ক্ষমা করলে?

সুরেশ কাঁদিয়া ফেলিল। পরে উচ্চ কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, আমি তোমায় ক্ষমা করবো সুরবালা? তুমিই বল, আমায় ক্ষমা করলে কি না? ক্ষমা করলে?

সুরবালা স্বামীর মাথা টানিয়া আনিয়া নিজের বুকে উহা স্থাপন করিয়া স্বামীর চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে গভীর আদরে বলিল, কেঁদো না।

এই অবস্থায় সুরেশ পত্নীর বুকে সুদীর্ঘকাল স্থির হইয়া রহিল।

দুপুর রাত্রিতে উভয়েই জাগ্রত হইয়া দেখিল তাহাদের উভয়ের মনই শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।

সুরেশ বলিল, ওর সঙ্গে কথা বলা কিছুতেই তোমার উচিত হয় নি সুরবালা।

—তুমিই তো বলেছিলে বলতে।

—ভাবি নি তো কোনও দিন যে এই রকম হতে পারে।

—আমি তো ভাবিনি এ হতে পারে।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না।

পরে সুরেশ বলিল, হতভাগা শেষে জেলে গেল?

—তাই তো গেল!

—কি রকম চেহারা দেখেছিলে ওর?

—ভয়ানক! ভয়ানক! ছাড়া পেলে ও আমাকে খুন করে ফেলতো।

—এত!

—এতই! তুমি ধারণা করতে পারবে না।

—পেরেছিলে তুমি এত লোকের মধ্যে সাক্ষী দিতে?

—পাগলামি এসেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, এত বড় সুন্দর কোম্পানীটা ও শেষে ফেল করিয়ে দিলে।

—বেশ হয়েছে।

—কেন?

—ব্যবসা লেখাপড়া জানা লোকে করে না। কেবল টাকা! টাকা! অত টাকা দিয়ে কি হবে?

—আগে তো এ কথা বলনি কোনও দিন?

—আগে তো ভাবিনি, বুঝিনি।

—কি করতে বল তবে?

—ভাল একটা কলেজে প্রফেসর হও। পরে বিলেত চলে যাবো দু'জনে। আমিও লেখপড়া শিখবো ভালভাবে। তোমার লেখা পড়াও স্বার্থক হবে।

—ব্যবসা আর করতে বল না।

—না, না, ও দোকানদারী লেখাপড়া-জানা লোকের সাজে না।

—এ কি সব তোমার কথা?

—না, মিনতিও এইভাবে বলেছে।

—তুমি কি মিনতির মত মেম সাহেব হতে চাও

—কে বল্‌লে মিনতি মেম সাহেব ? বড় লেখাপড়া জানা মেয়ে মানুষ। খুব ভাল মানুষ ও। তুমি ধারণা করতে পার না।

—খুব ভাল ?

—খুবই ভাল।

রাজশেখর বাবু কি রকম ?

—দেবচরিত্রের লোক তিনি।

—ভগবান রক্ষে করেছেন ঐ পরিবারে পড়েছিলে তুমি। তাই ভাবি কেন শুধু চিঠির কথায় বিশ্বাস করতে গেলেক ?

—সব আমার অদৃষ্ট।

—আমারও অদৃষ্ট বল্‌তে হবে। এক্ষেত্রে অদৃষ্ট উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না।

—যাক্ যা হবার তা হয়েছে। এখন আর কোনও দিন ছেড়ে থাক্‌বে না আমাকে ?

—নিশ্চয়ই না।

—বিলেতে আমায় নিয়ে যাবে ?

—প্রফেসরী আগে পাই ত !

—প্রফেসরী পাবে। মিনতি তাঁর দাদাকে লিখে দিয়েছে। দাদা ব্যারিষ্টার।

—কোথায় ?

—মিনতি জায়গার কথা বলে নি। ইউ, পি তে। বল নিয়ে যাবে আমাকে বিলেতে, যদি প্রফেসরী পাও ?

—নিশ্চয়ই নেব।

সুরেশ বুঝিল সুরবালা আর এখন আগের সুরবালা নয়। সে রীতিমত

ভাবিতে শিখিয়াছে। মিনতির স্পর্শে তাহার জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে।

(৬০)

সুবিমলের বিচার হইল রাজসাহীর সেসন আদালতে। পুলিশ সুবিমল ও আরও চারিজনের বিরুদ্ধে চার্জ্জ উপস্থিত করিল, ডাকাতি, নরহত্যা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা।

বিচারের দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সুবিমল একজন অপরিচিত লোককে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দেখিল। ভদ্রলোক নিতান্ত গোবেচারীর মত আরদালীর দ্রুত-উচ্চারিত হলপের কথাগুলি অস্পষ্ট ভাবে কতকটা তোতা পাখীর মত বলিয়া গেল। সে সাদা পাঞ্জাবীর উপর মটকার চাদর গলায় দুইধার দিয়া ঝুলাইয়া পরিয়াছিল। তাহার চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া যে কোন লোক বুঝিতে পারিত যে সে গ্রামবাসী, সহরবাসী নহে।

সুবিমল ভাবিল ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না, ভড়কাইয়া যাইবেন।

সাক্ষী আর কেহই নয়, সে হরিপুরের বিখ্যাত জগদীশ। গ্রামে তাহার মোড়লী থাকিলেও ও মামলা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভ্যাস পাকা পোক্ত ভাবে থাকিলেও সে ঠিকটা শহরে মামলাবাজ হইয়া উঠিতে এ পর্য্যন্তও পারে নাই। মুন্সেফী আদালত ও ফৌজদারী কোর্টে সে এ পর্য্যন্ত গতায়াত করিয়াছে। সেসন কোর্টে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। বিশেষতঃ আজ আদালত ঘর লোকে

লোকারণ্য হইয়াছিল। এরূপ সমারোহের ব্যাপার তাহার প্রত্যক্ষে এ পর্য্যন্তও আসে নাই।

আজ যেন তিনি একদম ভড়কাইয়া গেলেন।

হলপের কথাগুলি পড়ানো শেষ হইলে ভয়ত সাক্ষীর ভীত ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরকারী উকিল বলিলেন, আপনার নাম?

—জগদীশ সান্যাল।

—বাড়ী?

—হরিপুরে।

—কি করেন আপনি?

—আজ্ঞে আমার জমি জিরেত, লগ্নীও কিছু আছে?

—বেশ, আপনি সুবিমলকে চেনেন?

—চিনি।

—তাকে সনাক্ত করতে পারেন?

—হাঁ।

এই কথা বলিয়া সে সুবিমলকে কাঠগড়ায় আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

সরকারী উকিল বলিলেন, আপনি অন্যান্য আসামীকে চেনেন?

এবারও চিনি বলিয়া নখ দিয়া সে অন্যান্য আসামীকে সনাক্ত করিল।

সুবিমল ভাবিল সে সাক্ষীকে একেবারেই চেনে না, অথচ সাক্ষী তাহার নাম বলিল ও সনাক্ত করিল। মনে পড়িল এইরূপ একজন লোককে সে যেন একদিন জেলে ঘুরিতে দেখিয়াছিল।

সরকারী উকিল বলিলেন, আচ্ছা বলতে পারেন ১৩শে মার্চ্চ কি হয়েছিল?

—সেই দিন আমার দাদা মারা যান্।

—তার পর ?

—সেই দিন সকালে আসামীরা আমার কাছে এসেছিল।

—তার পর ?

—গহনা বিক্রি করবার জন্ত তারা এসেছিল।

—কার কাছে ?

—আমার কাছে।

এই বলিয়া জগদীশ ঢোক গিলিয়া পোষাক-পরা উকিলদের দিকে ভীতভাবে চাহিল ও পরে আরও ভীতভাবে সে উঁচু আসনে বসা উচ্চ মর্য্যাদার অবতার স্বরূপ জজ ও জুরিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সরকারী উকিল বলিলেন, তার পর ?

—আমি ও গহনা কিনি নাই।

—কেন ?

—খুব স্বদেশী ডাকাতি হচ্ছিল সে সময়।

—তার পর ?

—আমার সন্দেহ হয়।

—তার পর ?

—আমার সন্দেহ হয় ও ডাকাতির মাল।

—তার পর ?

—ভেবেছিলাম ওরা নিশ্চয়ই ডাকাত।

—তার পর ?

—আমি পুলিশে সংবাদ দিয়েছিলাম।

—সেই দিনই ?

—না পরের দিন।

—কেন ?

সেই দিনই আমার দাদা মারা যান, আমার নিশ্বাস ফেলবার অবসর ছিল না।

—আপনি আপনার দাদার মৃতদেহ পোড়ানোর সময় শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন ?

—ছিলেম। আমিই সব করেছিলেম।

চন্দ্রকান্ত ও পরেশবাবু মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য রাজসাহীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন।

জগদীশের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্ত চাপা সুরে আতঙ্কিতভাবে বলিতে লাগিলেন, ঘোর পাপী হতভাগা, ঘোর পাপী !

সরকারী উকিল বলিলেন, আপনি সে দিন দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন ?

—চন্দর ঠাকুরের বাড়ীতে।

—কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন ?

—ঠাকুরের বৈঠকখানার পাশে।

—কি দেখেছিলেন ?

—দেখেছিলেম আসামীদের প্রত্যেকেরই হাতে রিভলভার।

—কি করে দেখলেন ?

—বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

এই সময়ে পরেশ ধৈর্য্য না রাখিতে পারিয়া জোরে বলিয়া উঠিলেন, ঘণ্টা দেখেছিলে তুমি ! সব মিছে কথা !

এই কথায় আদালতের জনসাধারণের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনের সৃষ্টি হইল।

সরকারী উকিল পরেশবাবুর দিকে চাহিলেন। জজও চাহিলেন।

সরকারী উকিলের কাজ শেষ হইলে সুবিমলের উকিল উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জেরায় তিনি জগদীশকে বলিলেন, দেখুন আপনি বল্লেন সে দিন আপনার অবসর ছিল না। এই বল্লেন না?

—হাঁ, দাদার মৃত্যুর জন্য।

—হাঁ, আপনার দাদার মৃত্যুর জন্য। বেশ! আচ্ছা তাই যদি হল তবে কি করে আপনি ঠাকুর মশায়ের বাড়ী যেতে পারলেন?

প্রশ্নটার চমৎকারিত্বে জনতায় আবার গুঞ্জন উঠিল। গুঞ্জন থামিলে উকিল আবার প্রশ্নটা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন।

সাক্ষী প্রশ্নটা কঠিন বুঝিয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উকিল জোরে কথাটা আবার বলিলেন। সাক্ষী এবারও কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উকিল জোরে ধমক দিয়া বলিলেন, উত্তর দিন না কেন মশাই? আপনি ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন, না গিয়েছিলেন না?

জগদীশ নিজের ব্যবহারের স্বপক্ষে কি যেন বলিতে যাইতেছিল। উকিল বাধা দিয়া পূর্ব্বের ধমকের সুর বজায় রাখিয়া কড়া সুরে বলিলেন, ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন মশাই। হাঁ কি না বলুন। গিয়েছিলেন আপনি?

—আমার স্মরণ নেই।

পরেশ নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, গেলে তো স্মরণ থাকবে। মিথ্যা কথা কি স্মরণ থাকে?

জজ এবার রীতিমত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আঃ।

সুবিমলের উকিল ফিরিয়া চাহিয়া পরেশবাবুকে ছোট সুরে ধমক দিলেন।

উকিল সাক্ষীকে আবার জোরে ধমক দিয়া বলিলেন, আপনার মত বোকা দেখিনি মশাই! এই কথাটা আপনার স্মরণ হচ্ছে না। যাননি আপনি নিশ্চয়ই?

উকিলের ধমকে বিশেষ করিয়া তাহাকে নির্বোধ বলাতে জগদীশ রীতিমত হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিচারবুদ্ধি একরম হারাইয়া ফেলিয়া বলিল, না যাইনি।

এই উত্তরে জনতার মধ্যে উত্তেজনা এত বেশী হইল যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা দায় হইল। পুলিশ প্রহরী তৎপর হইয়া উঠিল, আরদালী জনতার মধ্যে ঢুকিয়া গেল, এমন কি পেশ্‌কার বাবুও কানে কলম গুঁজিয়া অগ্রসর হইলেন। উকিল মোক্তার সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উত্তেজিত জনতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। জজও কলম টেবিলের উপর রাখিয়া চোখের চশমা হাতে লইয়া মুছিতে লাগিলেন।

শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে ও জনতা শান্ত হইলে উকিল বলিলেন, আচ্ছা আপনি বল্লেন, আসামীরা চারজনই আপনার কাছে গহনা বিক্রি করতে গিয়েছিল। চারজনই কি গিয়েছিল?

—না, সুবিমলবাবু একলাই গিয়েছিলেন।

—সুবিমলবাবু ত সেদিন বিকেলে এসে পৌঁছেন। কি করে সকালে তিনি গেলেন আপনার কাছে?

—না, যাননি।

—আচ্ছা আপনার বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা আছে?

—আছে, লক্ষ্মী নারায়ণ শিলা।

—বেশ! লক্ষ্মী নারায়ণ! আচ্ছা আপনি মাঝে মাঝে কালীপূজা করেন?

—করি।

—তাতে পুলিশ অফিসারদের নিমন্ত্রণ করেন ?

—করি।

—আচ্ছা আপনি এত ধার্ম্মিক হয়েও পুলিশের কথায় এই জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বলে ফেললেন যে আপনি আপনার দাদার শবদাহের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। আপনার বলতে মুখে বাধলো না ? বলুন দেখি স্মরণ করে ? আপনার ত স্মরণ থাকে না! বলুন দেখি আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না ?

—না, উপস্থিত ছিলেম না।

—সুবিমল বাবুকে দেখেছিলেন কি ?

—দেখেছিলেম।

—কি করে দেখলেন ?

—বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

উকিল আর জেরা করিলেন না। সফলতার গর্ব্বে ভরপুর মনে উজ্জ্বল চোখে দীপ্ত জয়োল্লাস ঘোষিত করিয়া, মহিমান্বিত একটা ভাব লইয়া, চাপকানের প্রান্তদেশ চক্রাকারে চারিদিকে উড়াইয়া দিয়া এদিকে ওদিকে একবার চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জজ বলিলেন, হয়েছে, যেতে পারে।

জগদীশ আড়ষ্টভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে জজের কথা শুনিতে পাইল না।

সরকারী উকিল হাসিয়া বলিলেন, আপনি যেতে পারেন।

জগদীশের কানে সরকারী উকিলের কথাও প্রবেশ করিল না।

পরিশেষে আরদালী ধমকের সুরে বলিল, যাচ্ছেন না যে আপনি মশাই ? যান্, নেমে যান্!

আরদালীর ধমকে জগদীশের জ্ঞান হইল সে কাঠগড়া হইতে চোরের মত নামিয়া গেল।

ঘরের দরজায় পুলিশ ইনেস্পেকটর গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি চশমা ফুঁড়িয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে জগদীশের দিকে চাহিলেন।

আজকার ঘটনায় জগদীশের সরকারী খেতাবের ভবিষ্যৎ একদম ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

ভয়ানক দুঃখে জগদীশের বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

সুবিমলের বয়স বেশী নয়। এই হেতুতে জজ জগদীশ ছাড়া অন্যান্য সাক্ষীদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার প্রতি তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। রায়ে তিনি পুলিশের কাজের তীব্র সমালোচনা করিলেন।

সুবিমল ভীত হইল না। জজ সাহেবের প্রতি অসামান্য ভদ্রতা প্রকাশের ভাবে যুক্তকরে নীরব নমস্কারে সেই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল।

আদালতের যাহারা সুবিমলের এই ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল তাহাদের মন সুবিমলের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরেশের মনও পুত্রগৌরবে গৌরবান্বিত হইল। সুবিমলকে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিলেন, ভেব না বাবা। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবে। কাজই তো করছ তোমরা। আমরা কেবল ভূতের ব্যাগারই খেটে গেলাম।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ভয় পেয় না বাবা। সব মহামায়ার ইচ্ছা। নিশ্চয়ই তিনি তোমার মঙ্গল করবেন।

নূতন উৎসাহে আদালত হইতে পথে আসিতে আসিতে পরেশ ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীর চেহারায় ও মনের উপর দিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম ঘটিয়া সব শোচনীয়ভাবে ভাজিয়া চুরিয়া গিয়াছে। তিনি আগে কোনও দিনও এদিকে দৃষ্টি করেন নাই। তিনি সঙ্কল্প করিলেন এবার ফিরিয়া

গিয়া তিনি স্ত্রীকে মাথায় করিয়া রাখিবেন ও স্ত্রীর পরিপূর্ণ সহযোগে জীবনকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া পরিপূর্ণ আদরে তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করিলেন ও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

সুরমা স্বামীর সহৃদয়তায় যোগ দিতে মোটেই পারিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর প্রবল বিরুদ্ধতায় তিনি ঝাঁকি দিয়া জোরে ধমকের সুরে বলিলেন, কি বলেছ তুমি?

পরেশ বলিলেন, বলেছি তিন বছর বেশী সময় নয়।

—বলেছ তুমি এই কথা! এক ফোঁটা চোখের জলও পড়লো না তোমার সে সময়? কি পাষাণ দিয়েই ভগবান তোমাকে গড়েছিলেন! উঃ সহ্য হয় না! পাগল হয়ে যাব তোমার ব্যবহারে!

—কেন হয়েছে কি?

সুরমা তিক্তভাবে মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, হয়েছে কি? নিষ্ঠুর কোথাকার! হয়েছে কি? তুমি বুঝবে কি আমার হচ্ছে! হতভাগা কোথাকার! স্বামী নও তুমি আমার! তোমাকে ভূতে পেয়েছে। সরে যাও! সরে যাও আমার সামনে থেকে। তোমাকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাব।

—শোন আমার কথা আগে।

—যথেষ্ট শুনেছি তোমার কথা জীবনে। যাও, সরে যাও সামনে থেকে। যাও বলছি। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

স্ত্রীর কথার এই ভয়ানক আঘাতে পরেশের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় টলিতে টলিতে তিনি গিয়া ঘরের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। অসীম দুঃখে তাঁহার নিঃশব্দে অবিরল ধারে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

যে ঘরটায় কথা হইতেছিল সে ঘরটা সুচিভেদ্য নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গেল।

(৬১)

প্রায় তিন বৎসর পরে সুবিমল জেল হইতে মুক্তি পাইল। কয়েক মাস আগেই সে মুক্তি পাইয়াছিল।

সুবিমলকে লইয়া আসিবার জন্য চন্দ্রকান্ত ষ্টেশনে গিয়াছিলেন।

সুরমার হাঁপানি সেদিন খুব বাড়িয়াছিল। পরেশ ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই।

যখন চন্দ্রকান্তের সঙ্গে সুবিমল বাসায় গিয়া পৌঁছিলেন তখন সুরমা একদম বিছানায় পড়িয়া গিয়াছিলেন।

উভয়ে সুরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সুরমা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন, সুশীলা বাতাস করিতেছেন।

মায়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সুবিমল নির্ব্বাক অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া এক টুলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

সুবিমল দেখিল মা শোচনীয়ভাবে শুকাইয়া হাড়ে গিয়া ঠেকিয়াছেন।

সুবিমলের চোখে জল আসিল। সে কাপড় দিয়া চোখের জল মুছিল।

মুখ নীচু করিয়া থাকায় সুরমা চন্দ্রকান্ত বা সুবিমল কাহাকেও দেখিতে পান নাই।

সুশীলার সুবিমলের সঙ্গে এক গভীর স্মৃতি জড়িত ছিল। সেই পুরাতন স্মৃতি মনে হইয়া তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে উপুড় অবস্থা হইতেই কষ্টে সুরমা অস্পষ্টভাবে বলিলেন সুশীলা ভাই ?

সুশীলা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, কি ভাই ?

সুরমা থক্ থক্ করিয়া শুষ্ক কাশি কাশিতে কাশিতে উচ্চারণ করিয়া গেলেন, আর যে সহ্য হয় না ভাই। আর সহ্য হয় না। পোড়াকপালীর মনে এতও ছিল! পোড়াকপালী শেষে আমার এই করে গেল। উঃ! বিমল যে এখনও একলা ভাই ?

সুশীলা রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, বিমল এসেছে ভাই। ত্থাখ।

সুরমা বলিলেন, কে এসেছে বল্‌লি ?

সুশীলা পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে একটু জোরে বলিলেন, বিমল।

সুরমা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, এঁ্যা, বিমল! কোথায় ?

উঠা আর হইল না। অসহ্য যন্ত্রণায় হুমরি খাইয়া বালিশের উপর তিনি পড়িয়া গেলেন।

সুবিমল এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। এই নিদারুণ দৃশ্যে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মায়ের পাশে গিয়া বসিয়া মায়ের পিঠের উপর আস্তে আস্তে হাতখানি রাখিয়া সে গভীর স্নেহ ও ভক্তিতে মায়ের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বলিল, মা, ক্ষমা করলি মা ?

দৃশ্যটা বড়ই করুণ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্তের আঁখি সজল হইল।

হাতের ইসারা করিয়া সুরমা সুবিমলকে চুপ করিতে বলিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চেষ্টায় গলার কাশি উঠাইতে চেষ্টা পাইলেন।

সুদীর্ঘকাল তাঁহার এই অবস্থায় কাটিল। পরে কাশি উঠিলে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শুইলেন ও শুইয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া হাঁপাইয়া

চলিলেন। পরে একটু শান্ত হইলে সুবিমলকে নিজের শীর্ণ হাত দিয়া টানিয়া লইয়া সুবিমলের মাথাটা নিজের বুকের উপর রাখিয়া তিনি চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন।

সুবিমলও নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সেও জোরে জোরে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরিশেষে কান্না থামিলে সুরমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, বিমল, বাপ রে, আর যেন আমাদের ছেড়ে যাস্‌নে বাপ। প্রাণটা ধরে রেখেছি শুধু তোর কথা মনে করে বাপ, আজ যদি কুমু থাকৃতো বাবা!

শেষের কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শোকে ও দুঃখে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

মাতার শোকের বেগ কমিয়া গিয়া যখন তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন তখন সুবিমল স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ স্থিরতা আসিলে সুরমা বলিলেন, আমার শৈল কোথায়? আমার শৈল?

তারপর অস্থির আকুল দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জোরে ডাকিয়া বলিলেন, ওমা, শৈল, শৈল।

ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া শৈল সোজাসুজি সুবিমলের সামনে পড়িয়া গেল। গভীর লজ্জায় পশ্চাৎপদ হইয়া সে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুরমা শৈলকে দেখিলেন। বলিলেন, আয় মা, আয়, লজ্জা কিসের?

দ্বিধা দূর হইল। শৈল অবনত মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সুরমার পাশে বসিল।

সুবিমল চকিতে শৈলর দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল। বুঝিল ফুল একেবারে ফুটিয়া খুলিয়া গিয়াছে। সেই একবার

দেখিয়াই বুঝিতে পারিল শৈলর মনের উপর দিয়া এই তিন বৎসর ধরিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শ্রী ম্লান হইয়া গিয়াছে যথেষ্ট ও ঐ ম্লানিমা মুখে চোখে দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া শৈলর ফোটা যৌবনকে ঢাকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু যৌবন ঢাকা পড়ে নাই, উহা ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ সুরমা শৈলর হাতখানি লইয়া সুবিমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, বিয়ে তোর আজকে এইখানেই শেষ করে দিলেম।

শৈল ভয়ানকভাবে কাঁপিতে লাগিল। বলিষ্ঠদেহ সুবিমলের হাত জোর কাঁপুনিতে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া এক আগুনের ঝলক ছুটিয়া গেল।

শৈল উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া লোকলজ্জার কথা ভুলিয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

সুরমা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না। গভীর আদরে শৈলকে কাছে বসাইয়া সে রুগ্ন অবস্থায়ই শৈলর চোখ নিজের কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, আহা, ষাট, বড় কষ্ট পেয়েছিস্ মা? এ কষ্ট যে কি তা পোড়ারমুখীই দাগা দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এই কথা বলিয়া তিনিও একটু কাঁদিলেন। পরে উভয়ের কান্না থামিলে সুরমা নিজের চোখ কাপড় দিয়া মুছিয়া ভাঙা ভাঙা সুরে বলিলেন, দুঃখ করিস্নে মা। দুঃখের তো শেষ হয়েছে মা। মহাগুরু বিমল তোর মা। বিমলকে প্রণাম কর।

হাতের উপর হাত রাখার ব্যাপারটা যদিও সুবিমলের অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না তথাপি সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে তাল সামলাইতে পারিল না। কম্পমান স্বরে বলিয়া উঠিল, মা কি করলেন? করলেন কি মা?

সুরমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, যা করেছি বেশ করেছি। তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস? ও যে তোর জন্যে জীবন দিতে বসেছে। এ কয়টা বছর যে ওর কি ভাবে কেটেছে তা আমি ছাড়া বুঝতে পারিনি। থাক্ আর আপত্তি করিস্ নে। মায়ের দান হাত পেতে গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করছি তোরা দুইজনে সুখী হ। শৈল, বিমলকে প্রণাম কর।

শৈল একটু ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া সুরমা বলিলেন, রাক্ষসী মেয়ে! আমার কথা শুনবি নে? প্রণাম কর বল্‌ছি শীগগির।

সুশীলাও শৈলকে প্রণাম করিতে বলিলেন।

শৈলর দ্বিধা দূর হইল। প্রথম বারের চুরি-করা প্রণাম এই দ্বিতীয় বারের খোলাখুলি প্রণামে সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিলে পর সুরমা বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন কাকা।

চন্দ্রকান্ত আশীর্ব্বাদ করিলে পর তিনি সুশীলাকে বলিলেন, সুশীলা ভাই, যে অপরাধটা করেছিলেম তা আজ শেষ করে দিলেম। প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ কর ভাই। প্রাণ ভরে ভাখ।

সুশীলার কতদিনের আশা! সেই আশা আজ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে চোখ আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে তিনি সুবিমলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করছি বাবা তোমরা দুইজনে সুখী হও।

সুবিমল শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া উঠিলে সুশীলা বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যেই অসীম স্নেহে সুবিমলের মাথায় হাত রাখিয়া আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ডাক্তারের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বাড়ীর গেটে

পৌঁছিয়াই যখন পরেশ চাকরের কাছে শুনিলেন যে দাদা বাবু অর্থাৎ সুবিমল আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন তিনি নিজকে সংযত করিতে পারিলেন না। 'এ্যাঁ, এসে পড়েছে! বলিস্ কি!' এই বলিয়া তিনি চাকরের হাতে ঔষধের শিশিগুলি সাঁপিয়া দিয়া প্রবল আবেগে এক দৌড় দিলেন।

তাঁহার মিহি ধোলাই কাপড় শ্লথ হইয়া গেল। সেই কাপড় আঁটিবার অবস্থায় তিনি স্ত্রীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুবিমলকে দেখিয়া 'বাবা এসেছিস!' বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও দৌড়াইয়া গিয়া সুবিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পিতা প্রকৃতিস্থ হইলে সুবিমল দূরে গিয়া বসিল।

গোলমালে সুবিমলের পরেশকে প্রণাম করা হইল না। সুরমা ধীরে ধীরে ছোট সুরে বলিলেন, শুাখো?

পরেশ সুরমার শিয়রের দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভাবে তিনি এতই বিভোর ছিলেন যে তিনি সুরমার ছোট কথা শুনিতে পারিলেন না।

সুরমা ঘাড় ফিরাইয়া স্বামীর দিকে উল্টা দৃষ্টিতে চাহিয়া এখন পূর্ব্বের চেয়ে জোরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, শুাখো? শুাখো? কোথায়?

পরেশ বলিলেন, বল।

—শুাখো, আমি বিমলের হাতের ওপর শৈলর হাত রেখে ওদের বিয়ে আজকেই পাকাপাকি করে দিয়েছি। ওঁরা সব শৈল বিমলকে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

পরেশ চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলেন না।

সুরমা ধৈর্য্য হারাইলেন। রীতিমত কথায় বিষ মিশাইয়া ধমকের

সুরে বলিলেন, ছাখো, তুমি আমায় বড্ড কষ্ট দিয়েছ। ভয়ানক কষ্ট দিয়েছ। আর যেন দিও না। বুঝেছ? আপত্তি যেন করো না।

পত্নীর মুখ হইতে উচ্চারিত ভৎর্সনার কথায় পরেশ মুষড়িয়া গেলেন। তাহার কপাল ঘামিয়া গেল। সেই ঘাম মুছিতে মুছতে তিনি বলিলেন, আপত্তি কেন করবো?

সুরমা শৈলকে বলিলেন, শ্বশুরকে গিয়ে প্রণাম কর মা। স্বামীকে বললেন, ছাখো, অমন মন-মরা হয়ে থেকো না। অমন বৌ কখনও পাবে না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার তো ছাই মোটেই জান না। ভয়ানক নিষ্ঠুর তুমি। ভাল কাউকে বাসতে তুমি পারবে না। সে ধাতে ভগবান তোমায় গড়েন নি। তবুও বলছি ওকে ভালবেসো। ভালবাসতে শিখো একটু।

স্ত্রীর কথায় আঘাতের ফলে পরেশকে তাঁহার অপস্মার রোগে আংশিকভাবে আক্রমণ করিল। তিনি ফিট হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ অচল হইবার উপক্রম করিল। কতকটা উপুড় হইয়া বুকটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কতকটা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তিনি আস্তে আস্তে খাটের এক কোণে বসিয়া নিজকে সামলাইয়া লইলেন।

ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ও শেষ হইয়া গেল নিমেষের মধ্যে। পরেশের দেহের উপর যে কত বড় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা শুধু চন্দ্রকান্তই বুঝিলেন, আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

শৈল যখন প্রণাম করিল তখন পরেশ বসা অবস্থায়ই দুই হাত দিয়া শৈলর মাথা টানিয়া আনিয়া তাহার কপাল নিজের বুকের সঙ্গে স্পর্শ করাইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন বটে ও বলিলেনও, আশীর্বাদ করি

মা তোমরা সুখী হও, কিন্তু মনের প্রায় অচল অবস্থায় ও সব করিয়া গেলেন নিতান্তই যন্ত্রচালিতের মত।

চন্দ্রকান্ত অবস্থাটা বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন পরেশ কিছুকালের জন্য পৃথিবীর স্নেহ মমতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

দুপুরে আহারের জন্য চন্দ্রকান্ত সে দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের সময় আগাগোড়া পরেশ গুম হইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। শেষে উঠিবার সময় হঠাৎ জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, পুতুল আমরা পণ্ডিত মশায় অদৃষ্টের হাতে। ভুল, ভুল, পণ্ডিত মশায়। সমস্ত জীবনটা ভুল করেই কাটিয়ে দিলেম।

(৬২)

পরেশ সুবিমলের বিবাহ রাজসাহীর বাসায় দিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। চন্দ্রকান্তও শঙ্করের বিবাহ স্থির করিয়া রাজসাহীতে দেওয়াই মনস্থ করিলেন।

সুরবালা রাজসাহীতেই আছে। সুরেশ ইউ, পিতে সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ পাইয়াছে।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে শঙ্কর কলিকাতা হইতে আসিল।

শঙ্কর এখন বাবু বনিয়া গিয়াছে। সে ভাল জামা ও মিহি কাপড় পরে, মাথায় সিঁথি করে।

সুবিমল বলিল, কি রে খুব যে বাবু হয়ে পড়েছিস্ দেখ্ছি। শঙ্কর বলিল, চিরদিন কি একভাবে কাটে ভাই? তুইও ত বিয়ে করবিনে বল্‌ছিলি।

সুবিমল বলিল, আমারও জীবন একভাবে কাটলো না দেখছি।

বিবাহের দিন সকালে সুরবালা পরেশের বাড়ীতে আসিল।

পরেশের সঙ্গে দেখা হইলে সুরবালা তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণামের পর সুরবালা উঠিয়া দাঁড়াইলে পরেশ সুরবালার বাম হাতখানি নিজের ডান হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ও নিজের বাম হাতখানি সুরবালার মাথার উপর স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

বলিলেন, মা, তুমি তো যে সে মেয়ে নও মা! কত নিন্দে করেছি প্রথমে তোমাকে। আমার জিভটা কেটে ফেলতো মা। তবেই আমার উপযুক্ত সাজা হবে।

সুরমা কাছেই ছিলেন। তিনি ঘরের বারান্দায় বসিয়া একখানা পরিষ্কার চওড়া লাল-পেড়ে কাপড় পরিয়া ভগ্নদেহ লইয়াই তরকারী কুটিতেছিলেন।

স্বামীর এই অসাধারণ ব্যবহার দেখিয়া তিনি ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। নিজকে সংযত করিতে না পারিয়া, অন্তে শুনিতে পারে একথা একবারও না ভাবিয়া তিনি জোরে ধমকের সুরে বলিয়া উঠিলেন, সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। সবই অদ্ভুত তোমার! পাগল কোথাকার! যাও, বাইরে অনেক কাজ আছে। সেখানে যাও। যাও সেখানে!

পরেশ চলিয়া গেলে সুরমা সুরবালাকে বলিলেন, ঐ রকমেরই মানুষ মা। রাগ যেন করিসনে ওর উপর!

সুরবালা বলিল, রাগ কেন কোরবো মা! উনি আমার গুরুজন, আমার জন্ত করেছেনও উনি যথেষ্ট। আজ থেকে ওঁকে আমি মেসো-মশায় বলে ডাকবো।

সুরমার হাঁপানির কথা সুরবালা জানে। বলিল, মা, আজকাল কেমন আছেন?

সুরবালার মা ডাকে সুরমার চোখে জল আসিল। ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে তিনি বলিলেন, এ মা ডাক ডাকবার যে ছিল সে তো নেই মা!

—কাঁদবেন না মা। ওর কথা ভাববেনই না। জানবেন ও আপনার আর জন্মের শত্রু ছিল। এখন তো সুখী হয়েছেন। বৌ ত পেয়েছেন ভাল।

পূর্ব্ববৎ ভাঙা ভাঙা স্বরেই সুরমা বলিলেন, সুখী ত হয়েছি। খুব ভাল। নিজের মেয়ে, বলা উচিত নয়। ভয়ানক বদ্‌রাগী ছিল সে মা। বৌয়ের রাগ বলে কিছুই নেই। তবুও মা পেটের সন্তান তাই ভাবি কি জন্য মরলো ও। ওর কোন বিষয়েই অভাব বলে কিছুই ছিল না।

—যা হবার হয়েছে মা। শুভদিনে কাঁদবেন না মা।

সুরমা সুরবালার কথায় চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

সুরবালা সুরমার সঙ্গে আরও গল্প করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সুশীলা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে জোরে ডাকিয়া বলিলেন, ও সুরবালা, এই কি তোর গল্প করবার সময় মা? কাজ যে তোর আমারই সব করতে হবে। না মা, আর দেরী করিসনে। তরকারীগুলো কুটে দে। বসে থাকলে চলবে কেন? আমি একা কোন দিকে যাই বলতো?

সুরমা বলিলেন, আর গল্প করে কাজ নেই মা। যাও কাজ কর গিয়ে।

সুরবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সেই বারান্দায়ই বসিয়া এক খানা বঁটি লইয়া খস্ খস্ খস্ খস্ শব্দ করিয়া লাউ কুমরা বেগুণ কুটিয়া বারকোষের পর বারকোষ বোঝাই করিয়া ফেলিল।

তরকারী কোটা শেষ হইলে সে স্নান করিতে গেল। স্নান শেষে সে একখানা লাল চেলী পরিয়া আলপনা দিল।

বিবাহের দিন বিবাহের বাড়ীতে ছোট খাটো পূজার আয়োজন হয়।

আলপনা দেওয়া শেষ হইলে সুরবালা পূজার ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে ক্ষিপ্রহস্তে চন্দন ঘসিয়া পুষ্পপাত্র সাজাইল। যথা স্থানে সে শঙ্খ ধূপদান, দীপদান, মঙ্গলঘট সাজাইল। ফুল, বেলের পাতা, তুলসীর পাতা, নৈবেদ্য, মধুপর্ক পুষ্পপাত্রের উপর নিপুন হস্তে সাজাইল।

পূজার আয়োজনে কোন ত্রুটি না দেখিতে পাইয়া পুরোহিত বলিলেন, সুরবালা মা যে কাজে হাত দেন সে কাজে কি ভুল ধরার উপায় আছে?

পুরোহিতকে পূজায় বসাইয়া দিয়া সুরবালা রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রি দশটায় রান্না শেষ হইল।

পরদিন সুরবালা নিজে রান্না করিল না, কিন্তু সব কাজেই তাহার ডাক পাড়তে লাগিল। বাসি বিবাহের পূজার যোগাড়ে ত্রুটি ছিল। পুরোহিত ডাক দিলেন, সুরবালা মা কোথায় গেলেন?

সুশীলা ডাকিলেন ও সুরবালা কোথায় গেলি মা?

সুরমা ডাকিতে লাগিলেন, ও সুরবালা আয় তো একবার মা।

যাঁহারা রান্না করিতেছিলেন তাঁহারা ডাকিয়া বলিলেন, ও সুরবালা দি, আসুন না একটু।

বাসি বিবাহের দিন পরেশবাবু আয়োদের দক্ষিণা কম দিতে চাহিলে সুরবালা আয়োদের পক্ষ লইয়া পরেশ বাবুর সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল অবশ্য পরেশ বাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া।

পরেশবাবু এ ঝগড়ায় অসন্তুষ্ট ত হইলেনই না, বরং সুরবালার এই স্বচ্ছন্দ খোলা ব্যবহারে তাঁহার দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ের উপর দিয়া একটা শান্তির প্রলেপ পড়িয়া গেল ও কিছুকালের জন্য তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর জীবন

সমস্যার কথা ভুলিতে পারিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুরবালার এ, ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নিমন্ত্রিত সরকারী অফিসারের দল আহারে বসিবার পূর্ব্বে পরেশ ছুটিয়া আসিয়া সুরবালাকে বলিলেন, বসিয়ে দেব মা?

—দিন গে মেশো মশাই।

—পোলাও ভাল হয়েছে তো? তুমি ত রাঁধলে না মা?

—খারাপ কোন কিছু ত দেখিনে।

—জিনিষে তো কম পড়বে না?

—পড়বে না। সে বিষয়ে ভাবনা কোরবেন না মেশো মশাই।

পরেশ চলিয়া গেলেন। আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, পরিবেষণে লোক ত কম পড়বে না মা?

—না, না, পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পরেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন দুপুর পার হইয়া যাইতেছিল। সুরবালা বলিল, যাবেন না মেশোমশাই।

পরেশ বলিল, কেন?

—স্নান করেছেন তো?

—স্নানটা সকালেই সেরেছি। কেন?

—এখন পর্য্যন্তও খান্‌নি কিছু। কখন খাবেন আবার? একটু জল খেয়ে নিন্।

—না, না, জল খাওয়া এখন আমার হতে পারে না। বাইরে ভদ্রলোকেরা বসে আছেন যে!

এই কথা বলিয়া পরেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

সুরবালা সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যেতে পারবেন না আপনি। খেয়ে যেতেই হবে আপনাকে কিছু। মেয়ের কথা শুন্‌তেই হবে।

পরেশ বলিলেন, তোমার কথা এড়াবার উপায় নেই। আর তো কেউ নেই আমায় খাওয়াবার। কেবল ভূতের ব্যাগারই খেটে গেলেম। দাও, যা দেবে তাড়াতাড়ি দাও। ঘর-ভরা লোক রেখে এসেছি।

সুরবালা রান্নাঘরের এক কোণে আসনে পরেশকে বসাইয়া কলার পাতার উপর চারটি পানতুয়া ও দুই চামচ ক্ষীর দিয়া বলিল, আর দেব ?

—সর্ব্বনাশ! এই আমার বেশী হয়ে গেল। আমি তো বেশী খেতে পারি নে মা!

তিনি তাড়াতাড়ি পানতুয়া কয়েকটা গিলিলেন, ক্ষীরটুকু চাটিয়া খাইলেন ও পরে এক গ্লাস জল খাইলেন। পরে হাত মুখ ধোওয়া শেষ করিয়া আঁচল দিয়া হাত ও মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, যাই। আমার কি থাকবার উপায় আছে ?

এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন ধরিয়া দেখা গেল প্রবল উৎসাহে, মুখে চোখে আত্মসম্মান-বোধের স্থির দীপ্তি ফুটাইয়া সমস্ত বাড়ী লইয়া ছুটিতেছে সুরবালা।

সন্ধ্যার পর বৌ-পরিচয়ের সময় শাশুড়ী বৌকে কোলে করিয়া বসেন। এক্ষেত্রে বৌ একপ্রকার ঘরের মেয়ে হইলেও নিয়ম রক্ষা করিয়াই সুরমা ছালনাতলাতে বসিলেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অপটু বলিয়া ও বৌ রীতিমত বয়স্কা মেয়ে বলিয়া বৌ শাশুড়ীর কোলের উপর বসিল না, সামনে বসিল। শাশুড়ী বৌয়ের মাথা টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর স্থাপন করিলেন। দেহের শুকনো কাঠামোর উপর তিনি মূল্যবান এক শাড়ী পরিয়াছিলেন। কপালের সিঁদুরের ফোঁটা এয়োস্ত্রীর উজ্জ্বল চিহ্নস্বরূপ তিনি বড় করিয়া পরিয়াছিলেন। স্মিত হাসিতে তাঁহার বসিয়া-যাওয়া গাল ও কপাল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি জীবনের হারানো মাণিক খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

বৌ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিল। বৌ নানা ঘটনার নায়িকা হইলেও এক্ষেত্রে মুখ ভাসাইয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে ও পুরুষেরা চলিয়া গেলে সুরবালা কনে বৌ শৈলকে কোলে উঠাইয়া নাচিতে চাহিল।

শৈল এতক্ষণ শাশুড়ীর বুকে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল। এই প্রস্তাবে সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া শাশুড়ীর সাম্‌নে একটু অবনত হইয়া বসিল।

শাশুড়ী মৃদু হাসিয়া মুখে চোখে পরিপূর্ণ সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া বৌকে বলিলেন, নাচতে চায় যে সুরবালা তোমাকে নিয়ে বৌমা ?

বৌ হৃষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। ঘোমটার ভিতরে তাহার উচ্ছ্বসিত চাপা হাসি শুনা গেল।

উঠান-ভরা মেয়েরা এই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

সুরবালা কাপড়ের আঁচল জড়াইয়া বাঁধিল। পরে ঠোঁটে ঠোঁট দৃঢ় ভাবে চাপিয়া দুর্জ্জয় সংকল্পে, রুদ্ধশ্বাসে শৈলকে কাঁকালে তুলিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দুঃসাহস থাকিলেও অতবড় মেয়েকে লইয়া নাচা চলিবে না বুঝিতে পারিয়া উচ্চ খল খল হাসি হাসিয়া বৌকে নীচে নামাইয়া দিল।

দর্শকের ভিতর হাসি ঠাট্টার রোল উঠিল। বৌও হাসিয়া উঠিল। এক মেয়ে বলিয়া উঠিলেন, এই বাজারে বাজা।

ঢুলিরা ভিতরের আঙ্গিনায় দরজার ঠিক বাহিরেই চাটাই পাতিয়া বসিয়া ছিল। তাহারা চাক্ষুষ কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলেও কান দিয়া সবই বুঝিতেছিল ও শুনিতেছিল। 'বাজারে বাজা' এই কথা শুনিয়া এক সঙ্গে সকলেই ঢোল বাজাইয়া উঠিল। বেশীক্ষণ সে বাজনা চলিল না। প্রায় আরম্ভ হইয়াই হাসি ঠাট্টার রোলের মধ্যে উহা শেষ হইয়া গেল।

সুশীলা শুনিয়াছিলেন সুরবালা নাচিতে জানে। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, ও সুরবালা!

কলরবের ভিতর সুশীলার ডাকটা ডুবিয়া গেল। এবার তিনি কোলাহলের ঊর্দ্ধে গলা তুলিয়া ডাকিলেন, এই সুরবালা, এই!

কথাটা এবার সুরবালার কানে পৌঁছিল; বলিল, কি মা?

—তুই ত নাচতে জানিস্। নেচে গেয়ে একবার দেখা না না।

কোলাহল থামিয়া গিয়াছিল এই সময়ের জন্য। আবার উহা প্রবল হইয়া উঠিল। সুশীলার কথা শেষ হইতে না হইতেই, পিছন হইতে একজন চটপটে মেয়ে লাফ দিয়া অগ্রসর হইয়া সুরবালার সামনে উপস্থিত হইয়া জোরে ডাকিয়া বলিল, ও সুরবালাদি, সুরবালাদি, নাচতেই হবে আপনাকে কিন্তু।

সুরবালা পরিশেষে হাসিয়া রাজি হইল। বলিল, ঢুলি বাজাতে পারবে তো?

তখন কয়েকজন সাহসী মেয়ে 'এই ঢুলি', 'এই ঢুলি' বলিয়া সমস্বরে ডাকিতে ডাকিতে দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, এই নাচের সঙ্গে বাজাতে পারবি? পারবি বাজাতে নাচের সঙ্গে?

এক বৃদ্ধ ঢুলি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মেয়েদের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কে নাচবে দিদি?

একজন বলিল, আমি নাচবো।

অপর জন বলিল, না রে, আমি নাচবো।

তৃতীয় রূপসী হাসিয়া গলিয়া পড়িয়া পড়িয়া বলিল, নারে আমি নাচবো।

প্রথম জন বলিল, না রে তুই নাচবি।

ঢুলি মৃদু হাসিয়া ব্যাপারটা উপভোগ করিতে লাগিল।

পরে যখন সে অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল তখন সে বলিল, কেন সে বাজাতে পারবে না। সে জীবনে কত বড় বড় লোকের বাড়ীতে ঢোল বাজাইয়া ভাল ভাল শাল পুরস্কার পাইয়াছে।

এতক্ষণ সুরবালা নিতান্ত ঘরোয়া ভাবেই চলিতেছিল। নাচ আরম্ভ করিতেই সে সেই ভাব একদম পরিবর্তিত করিয়া ফেলিল। বুঝা গেল যে কিছুদিন আগে সে এক সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার ভিতরে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে সে খোলস বদলাইয়া রূপান্তরিত হইয়া গেল।

নাচ আরম্ভ হইবামাত্রই চুলি বুঝিল সুরবালা নূতন আশ্চর্য্য ধরণের শিল্পী। সুরবালাও বুঝিতে পারিল চুলি একজন উঁচু দরের শিল্পী, সে নূতন নূতন অবস্থায় নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ সোজাভাবে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে।

চুলিও নাচিতে লাগিল সুরবালার সঙ্গে সঙ্গে। যখন সুরবালা বক্ষ প্রসারিত করিয়া, হাত চারু সৌন্দর্য্যে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল তখন চুলিও তাল দিয়া যাইতে লাগিল অবিকল সেইরূপভাবে হেলিয়া পড়িয়া পড়িয়া ও প্রবল সহানুভূতির আবেগে ঢোল উৎক্ষিপ্ত করিয়া করিয়া। আবার সুরবালা যখন নানারকম ভঙ্গী একত্র করিয়া ক্ষিপ্রভাবে হাত চালাইতে লাগিল তখন চুলিও ক্ষিপ্রভাবে ঢোলে চটাপট্ ঘা দিয়া চলিতে লাগিল।

কোলাহল নাচের সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গিয়াছিল। এখন বিস্ময়স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে ঢোলের শব্দ উঠিতে ও পড়িতে লাগিল আশ্চর্য্য তালে ও ছন্দে। সেই উৎসবের রাত্রির বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে এক অসাধারণ সুর-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হইতে লাগিল।

সুরবালা একবার থামিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু মেয়েরা জোরে জোরে

এনকোর দিয়া উঠিল। আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল, আবার সুরবালা নাচিতে লাগিল।

নাচ শেষে মেয়েরা যাইবার সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সুরবালার প্রশংসা করিতে লাগিল।

সুরবালা বলিল, দুই দিন সময় পেলে প্রস্তুত ভাল ভাবেই হতে পারতেম। তা হলে হয়ত আরও ভাল কিছু করতে পারতেম।

কুমুদিনীর বিবাহে পরেশ যেরূপ প্রাণ-খোলা আনন্দে ও উৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন এ বিবাহে চেষ্টা সত্বেও তিনি সেরূপভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কি যেন তাঁহার মনের ভিতর ঘটিয়া গিয়াছে। উৎসবের চরম আনন্দের সময়েও তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে নিরাশার এক তীব্র দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সমস্ত সত্বাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার উপর এমন এক ভয়ানক মানসিক আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে যে তিনি কোনও দিনও পৃথিবীর সহজের সঙ্গে মিশিতে পারিবেন না। হৃদয়ে এমন এক বিষাক্ত দূষিত ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা শুকাইবে ত না-ই, পক্ষান্তরে মারাত্মক স্ফুঁড়ির সৃষ্টি করিয়া অবশেষে তাঁহার জীবনটা শেষ করিয়া দিবে। উৎসবের আগাগোড়া ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজের নির্জন ঘরে গিয়া চোখ বুঁজিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পতনোন্মুখ হৃৎপিণ্ডকে সামলাইয়াছেন। বৌ-পরিচয়ের সময় যখন মেয়েরা কলরব ও হাসিতে বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন ও সুরমাও সেই আনন্দে যোগ দান করিয়া নিজকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পরেশ সেই সময়ে নিজের আঁধার ঘরে একাকী শুইয়াছিলেন। সেই সময় মনের অসাধারণ দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল ও তাঁহার চোখ দিয়া অবিরলধারে অশ্রু বাহির হইয়া তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল।

এক সপ্তাহ পরে শঙ্করের বিবাহে সুরবালা এইরূপ ভাবেই খাটিয়াছিল।

শঙ্করের বাণী বিবাহের অপরাহ্ণে. এখনও রান্না সম্পূর্ণ হইয়া না উঠায় সকলেই বাহিরের বিস্তৃত ফরাসের উপর গিয়া বসিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তও এক কোণে বসিয়াছিলেন।

এই সময়ে শঙ্কর সকলকে খবরের কাগজের দুইটি সংবাদ পড়িয়া শুনাইল।

একটী এই—

রংপুরের হরিপুরের জগদীশ সান্যাল আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হইয়াছেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহারা সকলেই জগদীশের সুদের আসামী। প্রকাশ যে জগদীশ অত্যাচারী মহাজন ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডে হরিপুরের হিন্দু-সমাজ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

সংবাদটি পড়া শেষ হইলে চন্দ্রকান্ত জোরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা, তারা!

অপর সংবাদটি ছিল—

অমল বোস বাংলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ডাকাত ছিলেন। তিনি বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন্ দীপান্তরবাসের হুকুম হইয়াছে। আসামী কয়েক বৎসর ফেরার ছিলেন।

সংবাদ পড়া শেষ হইলে সুবিমল জোরে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই দীর্ঘশ্বাসে সকলেই হঠাৎ বিষন্ন হইয়া গেল।

সুবিমলের বিবাহের কয়েক বৎসর পরের কথা। সুরেশ অক্সফোর্ড হইতে এম, এ উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে ও যে কলেজের সে এতদিন অধ্যাপক ছিল সেই কলেজের সে অধ্যক্ষ হইয়াছে। সে এখন ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে তাহার বেতন আটশত টাকা। উহা বাড়িয়া দেড় হাজারে দাঁড়াইবে।

অক্সফোর্ডের শিক্ষায় সে রীতিমত সাহেব বনিয়া গিয়াছে, অবশ্য ততটা যতটা বাঙ্গালী জীবনে সম্ভব। সাহেবী পোষাকে সে কলেজে আসে, সাহেবী কায়দায় চলে, সাহেবী উচ্চারণে ইংরেজী বলে। সকলে তাহাকে প্রিন্সিপ্যাল রায় সাহেব বলে।

বাড়ীতে সে সাদা পায়জামা পড়ে ও কামিজ পড়ে ও স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়। সে এখন ঘন ঘন বর্ম্মা সিগারেট টানে।

একখানি মোটর সে ইতিমধ্যেই কিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে সে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হয়, নিমন্ত্রণে যোগদান করে।

ইংরেজী সাহিত্যে তাহার প্রবেশ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে ও ভাল ভাল লেখকের ভাল ভাল কথা তাহার এত রপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে সামান্য কথাবার্ত্তায়ও সে সেই সব উক্তি আওড়াইয়া নিজের মতকে বিশেষিত করে। সাধারণ লোকে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। যাঁহারা পারেন তাঁহারা তাঁহার দ্রুত উচ্চারিত বিশ্লেষণগুলি দ্বারা চমৎকৃত হইয়া যান ও তিনি যে জাহাজ জাহাজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহারা স্থিরনিশ্চয় হন।

অবশ্য বাড়ীতে তিনি ডাল ভাত মাছই খান, কিন্তু ঐ গুলি পরিবেশিত

হয় রাজশেখর বাবুর বাসার মত বাবুর্চ্চির দ্বারা। সুরবালা মাঝে মাঝে রাঁধিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করে।

সুরেশ গঙ্গার ধারে সুসজ্জিত এক বাংলোয় বাস করে। বাংলোর চারিদিকে ফুলের বাগান। সেই ফুলের বাগানের ভিতর টেনিসের ছোট মাঠ। উহার ঘাস পরিষ্কার করিয়া ছাঁটা। সেখানে মাঝে মাঝে সাহেব মেম আসিয়া সুরবালা ও সুরেশের সঙ্গে টেনিস খেলে ও বেলা শেষে সুরেশের বাংলোতে চা কেক ভোজন করিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।

টেনিস খেলার সময় সুরেশ চিৎকার করিয়া করিয়া পয়েন্টগুলি বলিয়া যায় ও মাঝে মাঝে 'right ho' বলিয়া ধ্বনি করিয়া ওঠে। রাস্তার লোক সকলেই বুঝিতে পারে রায় সাহেব টেনিস খেলিতেছেন।

সুরবালা এদেশে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া আই, এ পাশ করে, পরে স্বামীর সঙ্গে বিলাতে গিয়া সেখানে অক্সফোর্ড হইতে বি, এ উপাধি লাভ করে। পরে শিক্ষা বিজ্ঞানে এক ডিপ্লোমা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। সুতরাং সুরবালা বর্ত্তমানে আর সেকালের কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ পড়া সুরবালা নয়। সেকালের ঠাকুরপো ছবনাথের সঙ্গে রঙ্গরসিকা সুরবালা বর্ত্তমানের সুরবালা মোটেই নহে।

সুরেশও সেকালের গোবেচারী ব্যবসাদার নহে। এখন সে রীতিমত স্থূলকায় ও চেহারায় উচ্চপদের সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি। সেকালের মত এখনও সে কুচক্রের ধার ধারে না। তবে সেকালের সঙ্গে এখনকার পার্থক্য এই যে সে একালে কথায় এমন ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ হাসি ছড়াইয়া দেয় যাহাতে বাছা বাছা লোক মুগ্ধ হইয়া পড়ে ও তাহাকে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া মনে করে।

সুরবালা সুরেশের চাকরীর স্থানে মহিলা সমিতির যশস্বিনী সম্পাদিকা। সভায় দাঁড়াইয়া সে বিশুদ্ধ ইংরাজী ও বাংলায় বক্তৃতা করিতে পারে। ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধ ও ফটো মাঝে মাঝে ছাপিয়া বাহির হয়।

বিলাতী শিক্ষার ফলে সুরবালা সব জিনিষকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহার নেতৃত্বে মহিলা সমিতি পোষাকী সমিতি নহে। সহরের মেয়ে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সেইজন্য সহরের সর্ব্বপ্রকারের মেয়েদের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক বিবেচনায় সুরবালা সব শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছে। বড় লোকের চেয়ারে যেমন সে বসিয়াছে, ছোটলোকের মাদুরে সেইরূপ দ্বিধাহীন ভাবেই বসিয়াছে। ফলে সুরবালা বিলাতী শিক্ষায় মেম সাহেব হইয়াও পুরাপুরিভাবে দেশী রহিয়া গিয়াছে। সেইজন্য সে কোন সময়েই পুঁথির বুলি আওড়ায় না। সর্ব্বপ্রকার বিচারেই সে নিজের মৌলিক চিন্তার প্রয়োগ করে ও সমাধানে পৌঁছিতে চেষ্টা পায়। এই হেতুতে তাহার কথায় কোন ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যাঁহারা জানেন না তাঁহারা বুঝিতে পারেন না সুরবালা কোনও দিন বিলাতে গিয়াছিলেন কিনা।

সুরেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ না ঘটায় পুঁথির ভাবের রাজ্যেই তাহাকে অহরহ চলিতে হয়। সেইজন্য তাহার কথায় পুঁথির বুলিই বেশী থাকে, বড় ধরণের মৌলিক চিন্তা উহাতে কমই থাকে।

সুরবালা স্বামীর সঙ্গে মোটরে ভ্রমণ করে, স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যোগ দেয়, নিমন্ত্রিত হইয়া বড় ফুটবল ম্যাচের দিন সে খেলার মাঠে গিয়া সগৌরবে স্বামীর পাশে বসে।

স্কুলের প্রাইজ সভায় সে প্রেসিডেন্ট স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া পুরস্কার বিতরণ করে। স্বামী যখন সাহেবী কায়দায় দাঁড়াইয়া কথায় সাহেবী রং চালিয়া বক্তৃতা করে তখন সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

সুরবালা যেদিন রাঁধে সেদিন সে রান্নায় ক্লান্তি অনুভব করে না। রান্নার সময় সে পুরাতন রাজসাহীর বৌয়ে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

রান্নার পর সে কলের ঝরণায় গিয়া স্নান করে। দাসী তাহার গায়ে সাবান মাখাইয়া দেয়, গা মোছাইয়া দেয়।

কার্পেট-মোড়া ঘরে গদি-আঁটা চেয়ারে সে বসে, সেড-দেওয়া বিজলার বাতিতে সে পড়ে।

সে রীতিমত ব্যায়াম করে। পূর্ব্বে শরীর তাও একটু স্থূলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এখন উহা অনাকাঙ্ক্ষিত মেদের বোঝা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া সম্পূর্ণভাবে কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতী শিক্ষার ফলে সুরবালার পূর্ব্বের গৃহস্থালীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি কাজ ছোট হইলেও উহা এখন একটা আশ্চর্য্য রঙে রঞ্জিত হইয়া ওঠে। উহাতে অহঙ্কার নাই, ঔদ্ধত্যের লেশ মাত্র নাই, লোক দেখানোর ভাব নাই।

সুরবালার এক ছেলে হইয়াছে। তাহার বয়স চারি বৎসর। উপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া সে প্রত্যহ সকালে চাকরদের সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে যায়। জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করেন। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি শিষ দিয়া থামিয়া তাহার পথ আগলাইয়া ধরেন ও তাহার সঙ্গে খেলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

সুরবালা স্বামীকে কোট পরাইয়া দেয়। স্বামী কলেজ হইতে ফিরিলে নিজেই তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া লয়। স্বামী স্ত্রীর কার্য্য-

ক্ষমতা বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া স্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারেই চলেন। লোকে বলে, রায় সাহেবের তাঁহার স্ত্রীর কথার বাহিরে এক পাও নড়িবার সাধ্য নাই।

মাঝে মাঝে রাজশেখরবাবু মিনতিকে সঙ্গে করিয়া সুরবালার বাসায় থাকেন। সেই সময়ে বাংলো নূতন করিয়া সাজানো হয়। চাপরাশিরা নূতন পোষাক পায় ও ভাল ভাবে কাজ করিবার নির্দ্দেশ পায়।

যে কয়েকদিন উঁহারা থাকেন সে কয়েকদিন সুরবালা মিনতির সঙ্গে সকাল বেলা মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ক্লান্তি বোধ করিলে বাংলোর ফুলের বাগানের বেঞ্চিতে গিয়া বসে।

বিদায়ের দিন সুরেশ ও সুরবালা রাজশেখরবাবু ও মিনতির সঙ্গে রেল ষ্টেশনে আসে ও সেই বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়কে গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

(৬৪)

সুবিমল কয়েকটি কারখানায় হাতে কলমে কাজ করিয়া ফলিত রসায়ন ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিখিয়া ফেলিয়াছে। শৈলও বাড়াতে গৃহ শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছে। তাহাদের একটি ছেলে হইয়াছে।

সে রাজশেখরবাবু, পরেশ, মিনতি ও সুরবালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

রাজশেখরবাবু সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুবিমল গঙ্গার ধারে এক বিলের ধারে এক বড়

জঙ্গল কাটাইয়া রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করিবার জন্ত এক কারখানা স্থাপন করে।

এ কাজে পরেশবাবু তাহাকে ত্রিশ হাজার টাকা দেন। বাকী টাকা সে রাজশেখরবাবু ও সুরেশের নিকট হইতে ধারে সংগ্রহ করে।

পরেশ সস্ত্রীক রাজসাহীর বাসায় থাকেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে বড় একটা মেশেন না।

আজ কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কারখানার কলেবর অসাধারণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

তা ছাড়া সুবিমল বিলের ধারে পাঁচশত বিঘা জমি লইয়া সেখানে কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়াছে।

দুধ হইতে ঘি ও ছানা হইতে কেজিন তৈরি করিয়া সে দেশবিদেশে রপ্তানি করে।

ক্ষেতে সে গোবরের সার ব্যবহার করে, চাষে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে।

সেই বিলের চারিধারে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সে বারো মাস জল রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। উহাতে সে মাছের চাষ করে।

প্রথমে তাহাকে বিদেশ হইতে শ্রমিক আনিতে হইয়াছিল। এখন আর সে সমস্যা নাই। এখানেই এখন সে শিক্ষিত শ্রমিকের সঙ্ঘ গঠন করিয়া উঠাইতে পারিয়াছে। এখানে সকলেই ভাল লেখাপড়া জানে। কেহই কঠোর শারীরিক পরিশ্রমকে ছোট বলিয়া ঘৃণা করে না।

সে কলিকাতার একটি বড় ব্যাঙ্কের শাখা আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছে।

সে উঁচু জমির উপরে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছে। তাহার চারিদিকে

সে উঁচু বাঁধ বাঁধাইয়া বৈদ্যুতিক পাম্প বসাইয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা দ্বারা সে বীজ নির্ব্বাচন করে ও সেই পরীক্ষিত বীজ সে ক্ষেতে ব্যবহার করে।

বিলের মাছের ও ক্ষেতের গরুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ও চিকিৎসায় জন্য সে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছে।

ফলে সেই জনশূন্য স্থানে একটি পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকে ছোট সহর বলা চলে।

এখানে বাড়ীতে বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো ও বিদ্যুতের পাখার বন্দোবস্ত আছে।

কারখানার সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে এক বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বড় বড় ডিগ্রিধারী লোক এখানে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ সবাই কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে কলের লাঙ্গল চালায়।

লাভের অধিকাংশই শ্রমিকেরা পায়। তাহারা টাকা জমাইবার চেষ্টা করে না। দুর্ঘটনা ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য কারখানাই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তাহারা যাহা পায় তাহাই মুক্তহস্তে খরচ করে।

প্রত্যহ সাড়ে চারিটার সময় শ্রমিকেরা ছুটি পায়। তাহাদের কাজের সঙ্গে প্রচুর অবসরের বন্দোবস্ত আছে। সেই অবসর সময়ে সকলেই লেখাপড়া করিবার সুযোগ পায়।

পল্লীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই খেলার মাঠ ও পার্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ স্ত্রীপুরুষ মাঠে খেলে, কেউ বা ভ্রমণ করে।

সুবিমল পল্লীতে আধুনিক ধরণের হাঁসপাতাল, স্কুল ও লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছে।

হাঁসপাতালের পরিচালনার ভার শৈলর উপর দেওয়া আছে। সে ঐ কাজটা ভালভাবেই সম্পাদন করে। শিক্ষিত মহিলার সুমার্জ্জিত কথায় ও সুষ্ঠু ব্যবহারে অনুযোগের সুরে সে শাসন করে। সকলেই সেই শাসন মানিয়া লয় ও শাসনকর্ত্রীকে ভালবাসে।

স্ত্রীপুরুষের অকুণ্ঠ মেলামেশার ফলে স্ত্রীপুরুষের মন হইতে পরস্পরের দিকে অস্বাভাবিক কৌতুহলের ভাব উঠিয়া গিয়াছে। নারীর সাহচর্য্যের প্রেরণায় পুরুষের প্রাণশক্তি দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

গরমের দিনে জ্যোৎস্না রাতে স্ত্রীপুরুষ পার্কের মাঠে ঘাসের উপর দলে দলে গিয়া বসে। দখিনা বাতাস সেই সময় বহিয়া যায় ও পার্কের পাইন গাছগুলি সেই বাতাসে শন্ শন্ করে।

এখানে জাতিভেদ নাই, বিবাহ স্বাধীন, স্ত্রীপুরুষের নিজেদের নির্ব্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এখানে পণ-প্রথা নাই। বিবাহে বাজে ব্যয় ও অতিরিক্ত আড়ম্বর নাই। বিধবা এখানে বিবাহ করিতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বিধিগুলি সকলেই বিনা ওজরে মানিয়া চলে।

বিবাহ এখানে স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় স্ত্রীপুরুষ স্বর্গীয় ভালবাসার প্রেরণায় মাতিয়া উঠিবার সুযোগ পায়, সবাই জীবনটা রসে ভরপুর করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিতে পারে। জীবনের লক্ষ্য কাজের উৎকর্ষের উপর স্থাপিত হওয়ায় ও কাহারও হাতে সঞ্চয় বেশী না হওয়ায় সুযোগ না থাকায় কেহ কাহাকেও হিংসা করে না। পল্লীকে সকলেই ভালবাসে ও উহার ভবিষ্যতের উন্নতির স্বপ্ন দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া ওঠে।

রাজশেখরবাবু এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী বাসের ব্যবস্থা সুবিমল করিয়া রাখিয়াছে।

সুরেশও এখানে ছুটির সময় আসে।

মাঝে মাঝে মিনতি ও সুরবালা এখানে আসিয়া শৈলর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া শেখেন। এই সময়ে প্রতিদিন তাঁহারা তিন জন দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া যান ও গ্রাম হইতে দূরে পদ্মার তীরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা ঘোড়া ছুটাইয়া দেন ধূ-ধূ করা মাঠের দিকে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সাম্‌নে রাখিয়া। কচি সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি তাঁহাদের মুখে ও চোখে ঠিকরাইয়া পড়ে। প্রভাতের মৃদু বাতাস চুমিয়া যায় কোমল স্পর্শে তাহাদের মুখ, তাহাদের চূর্ণ-কুন্তল উড়াইয়া উড়াইয়া। কচি ধান গাছ মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া মাথা অবনত করিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করে। পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ ঠেলাঠেলি করিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সেখানে আছাড় খাইয়া হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। যখন তাঁহারা ঘোড়া ছুটাইয়া দেন তখন নূতন চামড়ার কালো বার্ণিশ-করা ঘোড়ার জিন তাঁহাদের চাপে মচ্ মচ্ করে, তাঁহাদের পোষাক খস্ খস্ করে, রেকাবীতে তাঁহাদের মাজাঘষা জুতা ঠক্ ঠক্ করে, শিক্ষিত ঘোড়ার দুলকী দোলনে ও উঁহাদের গর্ব্বিত পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দেহ ওঠানামা করে ক্ষিপ্র সুশৃঙ্খলায়।

ফিরিবার পথে যখন তাঁহারা সমারোহে গ্রামের রাস্তা দিয়া চলিতে থাকে। তখন গ্রামের লোক তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকে ও তাঁহাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে।

সুরেশের বাংলোটি নব্যরুচি অনুসারে নির্ম্মিত। মেঝে মার্ব্বেলের। বৈঠকখানায় ঘরের মেঝে রঙিন কার্পেটে ঢাকা ও তাহার উপর কুশন চেয়ার ও আরাম কেদারা। দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রকরদের অঙ্কিত ছবি। ঘরের বড় বড় জানালা খুলিয়া দিলে বাড়ীর বাগানের উপর দিয়া নদীর বহুবিস্তৃত বালির চর দেখা যায়।

সুরেশের মাথায় টাক পড়িয়াছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ টাকের উপর দিয়া তাহার পদগৌরব ও বিলাতী উচ্চ শিক্ষার মর্য্যাদা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একদিন সে সকালে বাংলোতে আরাম কেদারায় পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল।

সুরবালা অপর একখানি আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িয়াছিল ও একখানা মাসিক পড়িতেছিল।

এমন সময়ে হঠাৎ সুরেশ বলিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ! উঃ!

সুরবালা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

—ভবনাথ মারা গিয়েছে।

—বল কি?

—হাঁ।

—কি করে মরল?

—মরেছে আত্মহত্যা করে।

—বল কি?

—হাঁ, অতি শোচনীয় ভাবে।

—রেখি।

এই সময়ে চাকর খাবারের দুই প্লেট ও চায়ের কাপ প্লেট লইয়া আসিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ ও সুরবালা সে দিকে চাহিয়াও দেখিল না। চায়ের কাপ হইতে ধূম উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

সুরবালা কাগজে পড়িয়া দেখিল ভবনাথ বিষ খাইয়া জেলে আত্মহত্যা করিয়াছে।

তাহারা সুদীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল। পরে সুরবালা বলিল, উঃ, কি ভয়ানক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ও আমায়। মনে করতেও বুক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

উভয়েই ইহার পর কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না।

পরে সুরেশ বলিল, হতভাগাটা নিজের মরণ নিজেই টেনে আন্‌লে।

—তাই তো আন্‌লে।

—বাস্তবিকই আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই টেনে আনি। সেক্সপীয়রও তাই দেখিয়েছেন। অতবড় এ্যাণ্টনি! কি পাগলামী তাঁর ঘাড়ে চেপেছিল! মারা তো গেলেন ওই পাগলামীতেই। কথাটা ঠিক যে আমরা নিজের ধ্বংস নিজেরা টেনে আনি।

—তাই তো আনি।

—হতভাগাকে আমি খুব স্নেহ করতেম সুরবালা।

—আমিও তো খুব স্নেহ করতেম। চাইবাসার কটেজখানি পর্য্যন্ত আমি ওকে দিয়েছিলেম।

—দুষ্ট গ্রহ চেপেছিল ওর ঘাড়ে। কি ভয়ানক কাজ করেছিল ও! কি ভয়ানক কাজটাই তুমি করে বসেছিলে!

—ভয়ানক! ভয়ানক! কি করে বেঁচেছিলেম আমি তাই ভাবি!

সুদীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর সুরেশ বলিল, মরে গেছে ও। আমাদের এখন বোধ হয় ওকে ক্ষমা করা উচিত।

—ক্ষমা অক্ষমার কথা ওঠে না এখানে। আমাদের জীবনপরিধি থেকে ও আগেই বাইরে চলে গিয়েছে। তবে একথা ঠিক ও যে কাজ করেছিল তার উপযুক্ত সাজা ও পেয়েছে। উঃ!

কথার উপর কালো পরদা পড়িয়া গেল। আর উহা আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সে সকালে তাহাদের চা খাওয়া হইল না।

(৬৬)

পল্লীর নূতন বাসায়।

সুবিমল বলিল, যাই বল না শৈল, কাজটা কিন্তু নিতান্তই গর্হিত হয়েছিল আমার।

—কেন?

—ভয়ানক পাগলের কাজ করে ফেলেছিলেম। বানচাল হয়ে যে যাই নি তাই যথেষ্ট।

—কি করে বানচাল হতে?

—বাবা মা যদি অস্বীকার করে বসতেন?

—তুমি কি অস্বীকার করে বলতে পারতে সে রাতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল না?

—পারতেম না যদিও। তবে বাবা মা অস্বীকার করলে একটু বিপদে পড়তে হত বই কি।

—পড়নি তো।. ভাখো আমার ভাগ্য কত বড়!

—ভাগ্য তোমার যে.বড় তা স্বীকার করতেই হবে।

—তা তুমি যাই বলো এই ভাবে আমাদের মিলনটা না ঘটলে কিন্তু আমাদের জীবনটা এত সুখের হত না। আর তো জীবনে সে রাত ফিরে আসবে না।

—আসবে না ঠিকই। তবে আমাকে বলতেই হবে কাজটা গর্হিত হয়েছিল। আর গর্হিতই বা বলি কি করে? জীবনটা তো আমাদের স্বপ্ন ও জাগরণ দিয়ে তৈরি। স্বপ্নের জীবনে কাজটা করে বসেছিলেম। তবে এটাও ঠিক আমাদের সুখের এই ঘটনাটাই একমাত্র কারণ নয়!

—কেন?

—বিয়েতে বর-কণের পছন্দই একমাত্র জিনিষ নয়। সেইজন্ত আমাদের সমাজে বিয়েতে বর কনের মত নেওয়া হয় না।

—ও সমাজের ভুল।

—যদি বর কনে ভুল করে?

—যদি পিতামাতা ভুল করেন?

—কিন্তু প্রেমের বিয়ে তো অনেক জায়গায় দুঃখের হয়।

—সুখেরই তো হবার কথা। নইলে কোন বিয়েই সুখের হবে না।

—কেন?

—যাকে আমি পছন্দ করি, যাকে দেখলে পাগল হয়ে যাই, যার সঙ্গে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সুখ হবে না তো হবে অন্যের সঙ্গে বিয়ে হলে?

—তবে বিবাহিত জীবনকে সুখী করতে হলে আরও কিছু চাই।

—কি সে?

—বিবাহিত জীবনের সাধনা।

—সাধনা মানে ?

—প্রথম স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের জন্ত উপযোগী হবার জন্ত চেষ্টা করা।

—তার মানে ?

—উভয়কে শরীর দৃঢ় করতে হবে। উভয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উভয়কে বুঝতে হবে। উভয়ের জন্ত জীবনের একটা লক্ষ্য গড়ে তুলতে হবে।

—বুঝলেম এই এক সাধনা পণ্ডিত মশায়।

—পণ্ডিত মশায় আমি না তুমি ?

—আচ্ছা বেশ আমিই হলেম। তারপর ?

—তারপর প্রেম নিরবচ্ছিন্ন নয়। ওরও জোয়ার ভাঁটা আছে।

—আমাদের ভালবাসায় তো ভাঁটা পড়েনি। বিয়ের পর তো কত বছর হয়ে গেল।

—আমাদের জীবনও তো শেষ হয়নি।

—তুমি আমার হারানো ধন। তোমাকে সাগর ছেঁচে পেয়েছি। ভাঁটা কিছুতেই আস্তে দেব না।

—বাঃ, বেশ তো কবি তুমি! ভাঁটা আস্তে দেবে না কি করে ?

—জগৎটা তোমার কাছে করে রাখবো চির নূতন।

—কি করে ?

—রূপকথার রাজকন্তাদের মত নিত্য নূতন রোমান্স রচনা করে।

—তার মানে ?

—তোমাকে আদর করব, তোমার গায়ে ঢলে পড়ব, কখনও গাল ফুলিয়ে বসে থাকবো মানিনীর মত, আমি মান করবো, তুমি মান ভাঙাবে।

—বাঃ, তোমার রাখা প্রেমের বই পড়া সার্থক হয়েছে।

—সার্থক অসার্থক বুঝিনে। জীবন জমে উঠেছে বলে, আরও জমে

উঠবে যেন। এমন ভাবে থাক্‌বো আমরা, এমন ব্যবহার করবো যাতে জীবনটা আশ্চর্য্যভাবে রঙিন হয়ে উঠবে। রাঙিয়ে উঠবে গাছপালা, রাঙিয়ে উঠবে সমস্ত কাজ চিরনূতন বসন্তের রক্ত রাগে।

'বসন্তের রক্তরাগে' কথাটা উচ্চারণ করিয়াই শৈল কিছু করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

—বাঃ, মস্ত কবি একটা তুমি।

—কবি বই কি। জান্‌বে তোমার ছায়া হয়ে থাক্‌বো আমি সব সময়েই। যখন মরবো তখন তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ব।

—এই ত বিবাহিত জীবনের সাধনা, যার কথা বলেছিলেম। পারবে?

—নিশ্চয়, নিশ্চয় পারবো।

কিছুক্ষণ কোন কিছু কথা হইল না। পরে শৈল বলিল, ভাখো?

—বল।

—তোমার সাহিত্যের বই পড়া সার্থক হয়েছে।

—কেন?

—তোমার কথা বলবার ভাবটা চমৎকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি আমায় ভালবাস বলেই কথাটা বলেছ।

—কি করে জান্‌লে তোমায় আমি ভালবাসি বিয়ের এতদিন পরেও। জান্‌বে আমরা মেয়েমানুষ মনের আসল ভাব বেশ গোপন করে রাখতে জানি।

—কিছু রেখেছ নাকি?

শৈল ভয়ানক কৌতুক অনুভব করিল। সে হাসিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল ও হাসিতে তাহার দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পরে হাসি থামিলে বলিল, না গো না। সেদিকে তোমার কোন

ভাবনা নেই। বাস্তবিকই তোমার ভাষা এত ভাল হয়ে উঠেছে যাতে তুমি এখন অনায়াসে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতে করতে পার।

—তোমার ভাষাও ত দেখছি চমৎকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমিও ত সভায় দাঁড়িয়ে এখন বেশ বক্তৃতে করতে পার।

শৈল আবার কৌতুহল অনুভব করিল, গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিল, আমি যে মেয়েমানুষ গো! অবলা, অচলা, গোদেবতা।

সুবিমল বলিল, অবলা, অচলা, গোদেবতারা কি কোন জায়গায় বক্তৃতে দেয় না?

—মাপ করো। আমার দ্বারা ও কোনও দিনও হবে না। আমার মোটেই রুচি নেই ওদিকে।

—আমার দ্বারাও হবে না। আমার ক্ষমতা নেই। রুচি তো নেইই।

—না থাকলো রুচি। ওর জন্য আমার তোমার ওপর অরুচি ধরবে না জেন।

মন ও হৃদয়ের এই নিবিড় সংযোগের অবস্থায় তাহারা চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

পূজার মন্দিরে সুবিমল ষোড়শীর পাষাণ প্রতিমা স্থাপন করিয়াছে।

রাত্রির ঘোর অন্ধকারে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে তখন তাহারা গিয়া পূজার মন্দিরে উপস্থিত হয় ও দেবীর পাষাণ প্রতিমার সামনে ধ্যানে নিমগ্ন হয়।

শৈল রক্ত বস্ত্র পরিয়া স্বামীর পাশে বসে রক্ত উষার স্মিতা বিকীর্ণ করিয়া।

তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় সে যেন রক্তাম্বরা গায়ত্রী দেবী, বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি প্রকরণের আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

সময়ের পর সময় চলিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ধ্যান ভাঙ্গে না।

নানা রঙের ফুল, সবুজ ঠাণ্ডা বেলের পাতা ও নৈবেদ্যের শান্ত শুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে পূজার হাতের কাজের ফলে তাহাদের মন মনোধর্ম খুঁজিয়া পায় ও ফলে তাহাদের মন শান্ত ও স্থির হইয়া যায়।

তখন তাহাদের মন সংসার চিন্তা হইতে বিযুক্ত হইয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় রূপায়িত ও উদ্বেলিত হইয়া ওঠে ধারণার বিশালতায়।

চেতনা ফিরিয়া আসিলে বাইরের ঘন আঁধারের অসীমতা রূপ নেয় অবাস্তব সৌন্দর্যে।

কোনও কোনও দিন চন্দ্রকান্ত পূজায় বসেন। তিনি জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করিয়া যান।

পাড়ার লোকে জাগ্রত হইয়া বুঝে যে চন্দ্রকান্ত পূজায় বসিয়াছেন।

হোমের পর যখন চন্দ্রকান্ত আমের পল্লবের দ্বারা শান্তির জল ছিটাইতে থাকেন, তখন শৈল ঘন ঘন চোখ বুঁজে।

হোমের পর চন্দ্রকান্ত শৈল ও সুবিমলের কপালে তিলক পরাইয়া দেন। শৈলর কচিৎ কখনও চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করিতে বিলম্ব হইলে চন্দ্রকান্ত বলেন, পার্ব্বতীর মত তপস্যা করে বর পেয়েছিস্। অহঙ্কার হয়েছে বুঝি! প্রণাম কর বেটি, প্রণাম কর।

শৈল ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মাথা অবনত করিয়া চারুছন্দে চন্দ্রকান্তকে প্রণাম করে।

চন্দ্রকান্ত বলেন, ঋষির বংশধর তোরা। ঋষিদের মেয়ে তুই। মনে রাখিস ঋষির মেয়ের মত পবিত্র হবে হতে হবে তোকে।

সুবিমল শুধু ষোড়শীর পূজাই করে না। দুর্গাপূজার রাত্রিতে দেবীর আরতির সময়ে সে পূজার প্রাঙ্গনে দেবীর মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাইয়া থাকে। ধূপের ধোঁয়া, লোকের ভিড় ঢাকের বাজনার মধ্যে তাহার মনে এমন এক ভাব হয় যাহাতে তাহার মরিতে ইচ্ছা হয়।

সুবিমল ও শৈল কঠোরতার ভিতর জীবন অতিবাহিত করে।

মাঘ মাসের প্রভাতে মোরগ ডাকিবার পূর্ব্বে তাহারা ওঠে ও পদ্মায় স্নান করিবার জন্য যাত্রা করে। শীতে শৈলর পা আড়ষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম করে তথাপি সে ভ্রুক্ষেপ করে না।

পদ্মায় তাহারা পলাশ গাছের ঘাটে গিয়া স্নান করে। তখন গলানো লোহার পিণ্ডের মত লাল হইয়া সূর্য্য ওঠে। সূর্য্যের লাল কচি আলো তাহাদের মুখে চোখে ঠিকরাইয়া পড়ে। সেই আলোতে পলাশ ফুলগুলি দীপ্ত হইয়া চক্ চক করে।

ফিরিবার পথে সুবিমল নিজের সুঠাম দেহ লইয়া স্থির ভাবে- হাঁটিয়া যায়।

শৈল কাঁপে আর হাঁটে। বলে, বরফ ভেঙে পড়ছে যেন। ভারি শীত। উঃ!

কোন কোনও দিন দুরন্ত ষাঁড় তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসে। তাহারা বড় গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়ায়। শৈল স্বামীর বুকে আশ্রয় লইয়া থর থর করিয়া কাঁপে।

পূর্ব্বজীবনে কঠোরতা সে অবলম্বন করিতে পারে নাই। মন বাধা দিয়াছে। এখন মন আপনা আপনিই চরম পরিণিতির জন্য কঠোর জীবন গ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব্বে কষ্টকর ভ্রমণে তাহার চেতনায় কোন দাগ পড়ে নাই। তাহার হৃদয়ে ফুল আপনা আপনি ফোটে নাই। কিন্তু এখন অলস মনের সমস্ত দরজা খুলিয়া রাখিয়া যখন সে বিছানায় পড়িয়া থাকে, যখন কাছে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে ফোটা ফুলের মধ্যে বসিয়া চোখ গেল পাখী ডাকিয়া ওঠে, টি-টি, টি-টি, চোখ গেল, চোখ গেল, তখন খোলা মাঠ, ঘাট, সমুদ্রের কল্লোল, সমুদ্রের বুক হইতে লাফিয়ে-ওঠা

প্রভাত সূর্য্য, জ্যোৎস্নায় আলোকিত উপবনের বিখ্যাত অট্টালিকার ছবি তাহার স্মৃতিতে ভর করিয়া বিপুল সম্ভার লইয়া তাহার মনে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহার মনের পরিষ্কার কাপড়ে নিখুঁত ভাবে আঁকা হইয়া যায়।

এইরূপ মনের অবস্থায় যদি তাহার গত জীবনের সেই কৃষক রমণীর ছবির কথা মনে হয় তখন সে এই ছবির ভাবের অতল তলে ডুবিয়া যায়। প্রায়ই কৃষকবধূ শৈলতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তাহার মনের চোখের সাম্‌নে শৈল অপরূপ সৌন্দর্য্যে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কাঁচা বয়সের কাঁচাদৃষ্টি ঘোমটার তল দিয়া আড়চোখে হানিয়া হানিয়া কলসীতে জল ভরে। বিজন সন্ধ্যার পরিবেশের মধ্যে নিজের দীপ্ত রঙের সঙ্গে গোধূলির রঙ মিশাইয়া সেইরূপ ভাবেই সে কলসী কাঁখে করিয়া শরীরে ঝাঁকি দিয়া দিয়া সেইরূপ হেলিয়া-পড়া, গলিয়া-পড়া ভাবে চকিতে চকিতে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া চলিতে থাকে ও পরিশেষে সেইরূপ শেষ বারের জন্ত হৃদয়-ভেদ-করা দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করিয়া সেইরূপ চমকিয়া-ওঠা ভাবের হাসি হাসিয়া মাঠের সীমারেখায় ঘন সবুজে মিলাইয়া যায়।

(৬৭)

গঙ্গা হইতে একটু দূরে বাড়ী করিয়াছে সুবিমল।

বাড়ীর দক্ষিণে ফুলের বাগান ও পরে মাঠ। পূর্ব্বে বড় একটা পুকুর। উত্তরে ও পশ্চিমে ফলের বাগান।

এবার পূর্ব্ব হইতেই গ্রামের লোকেরা সঙ্কল্প করিয়াছে যে এবার

তাহারা গ্রামের বাৎসরিক উৎসবে রাজশেখর বাবু, সুরেশ, সুরবালা, মিনতি, পরেশ বাবু ও চন্দ্রকান্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকাণ্ড ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিবে।

উৎসবের কয়েকদিন আগেই মিনতি, রাজশেখর বাবু ও চন্দ্রকান্ত আসিয়াছেন। রাজশেখর বাবুর সঙ্গে বিমল বাবুও আসিয়া পৌছিয়াছেন। উভয়েই সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পরেশ বাবু ও সুরমাও আসিয়াছেন। সুশীলা চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আসিয়াছেন।

সুবিমল ও শঙ্করের বিবাহের পর হইতেই চন্দ্রকান্ত রাজসাহীতেই রহিয়া গিয়াছেন, কাশীতে ফিরিয়া যান নাই।

সুরবালা ও সুরেশ কোন দিন কোন সময়ে আসিয়া পড়িবে না জানায় শৈলরা ষ্টিমার ঘাটে লোক পাঠাইতে পারে নাই!

একদিন সুরেশ ও সুরবালা ষ্টিমার ঘাটে পৌছিয়া সোজাসুজি হাঁটিয়া গিয়া সুবিমলের বাড়ীতে পৌছিল।

স্বামীকে সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে পৌছিতে বলিয়া সুরবালা নিজে ফুলের বাগানের পূর্ব্বে পূজার মন্দির বামে রাখিয়া পুকুরের ধার দিয়া নিজে ও ছেলে হাঁটিয়া গিয়া বাড়ীর খিড়কি দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

মিনতি ও শৈল জানালা দিয়া আগেই দেখিতেছিলেন। তাঁহারা খিড়কি দরজায় গেলেন, সুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলর তিন বছরের ছেলেও শৈলর অনুসরণ করিল।

মিনতি এই পরিবারের সঙ্গে মিশিতে মিশিতে অনেকটা ঘরোয়া ভাবের হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুরবালা প্রথমে শৈল ও পরে মিনতিকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, ভাল আছিস তো ভাই? পরে সে শৈলর ছেলেকে

উঠাইয়া লইল ও উচ্ছ্বসিত কলস্বরে হৃদয়ের অসীম আনন্দ ব্যক্ত করিয়া ছেলেকে সুচারু ক্ষিপ্রতায় চুম্বনের পর চুম্বন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

শৈল ও মিনতি পর পর সুরবালার ছেলেকে কোলে উঠাইয়া লইলেন।

আন্তরিকতার প্রথম পর্য্যায় মিটিয়া গেলে সুরবালা গভীর ভক্তিতে সুরমাকে প্রণাম করিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সুরবালার সঙ্গে শৈল ভাল ভাবেই পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সুরমা ও সুশীলা সুবিমলের বিবাহের পর আর সুরবালাকে দেখেন নাই। সুরবালার নাম শুনিয়াছেন যথেষ্ট। সুতরাং সুরবালা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল এই ভাবিয়া সুরবালা আসিয়া খোলাখুলি ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিবে কিনা। শৈল আশ্বাস দিয়াছিল যথেষ্ট কিন্তু মন তাঁহাদের শৈলর আশ্বাসে স্থির হইতে পারে নাই। আজ সুরবালাকে দেখিয়া সুরমা বুঝিতে পারিলেন পরিবর্ত্তন অনেক ঘটিলেও সুরবালা আগের সুরবালাই রহিয়া গিয়াছে।

সুরবালা সুরমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মা ভাল আছেন তো মা? অনেক দিন আপনাকে দেখিনি।

—আছি তো আজকাল ভালই মা।

সুরবালা আনন্দিত হইল। বলিল, মেসোমশায় ভাল আছেন তো মা? এসেছেন তো তিনি?

—হাঁ এসেছেন। কয়েকদিন আগেই আমরা এসেছি।

—মা এসেছেন? শৈল, তোর মা?

এইবার প্রথম সুরবালা সুশীলাকে মা বলিয়া ডাকিল।

সুরমা বলিলেন, এসেছে।

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুশীলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, ও সুরবালা, এসেছিস্ মা? মেম সাহেব এখন তুই মা। কথা বলতেও যে তোর সঙ্গে ভয় করে। যাক্ কয়েকদিন আনন্দে কাটবে। থাক্‌বি তো মা কিছুদিন?

সকলেই নিবিড় ভালবাসায় সুরবালাকে গ্রহণ করিল। সুরবালাও সকলের সঙ্গে মিশিয়া আলাপ করিয়া হাসিয়া বাড়ীর আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

শৈল কমনীয় কণ্ঠে বলিল, মিনতি দি? আমি তো আগেই বলেছি সুরবালা দি না এলে কোন কিছুই হবে না।

সুরবালা সেইদিন সকালে আসিয়াছিল। সে সংকল্প করিল সে সেই দিনই সকলকে রান্না করিয়া খাওয়াইবে।

প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্রই সকলেই তীব্র প্রতিবাদ উঠাইল। শৈল জোরে আপত্তি করিয়া উঠিল। বলিল, তা পারবেন না সুরবালা দি।

সুরবালা বলিল, কেন?

—আপনি অতিথি।

—তাতে কি হ'ল? আমি কি নূতন করে এলেম এখানে?

—তা ছাড়া আপনি একজন প্রকাণ্ড লোক।

—প্রকাণ্ড লোক মানে?

—আচ্ছা হার মান্‌লেম। রাঁধুন গিয়ে। আমরা মজা করে খাব। আপনিই বেরুবেন রান্নাঘর থেকে রাক্ষসী সেজে তেলকালি মেখে।

সুষমা বলিলেন, একি কখনও হয় মা? তা ছাড়া তুমি রাত জেগে এসেছ।

—রাত ত জাগিনি। গাড়ীতে ও ষ্টীমারে বেশ ঘুমিয়েছি।

—বুঝেছি ফার্ষ্ট ক্লাসে এসেছ। সে দিকে তোমার অসুবিধে হয় নি। তবুও তুমি এত বড় লোক। রান্না তো সাজে না তোমার।

—একি আপনি বলছেন মা? কত বড় লোক আমি? আমি কি বিলেত গিয়ে আলাদা মানুষ হয়ে এসেছি মা?

সুরমা বলিলেন, আমি কি বল্‌ছি হয়ে এসেছ।

—তবে?

—তবে বল্‌ছি রান্না এমন কি একটা জিনিষ যা তোমার মত মেয়েকে করতে হবে?

—রান্না কি তুচ্ছ করবার জিনিষ মা মেয়েদের? রান্না দিয়ে মেয়েরা যে সেবা করবার সুযোগ পায়। আজ আমি সবাইকে এক সঙ্গে পেয়েছি। যদিও আগেকার মত রাঁধতে এখন আমি পারিনে, তবুও এ সুযোগ ছাড়তে চাইনে মা।

ইহার পর আর কোন আপত্তি চলিল না।

সুরবালা আসিয়া পৌঁছিবার কথা শুনিয়া পরেশ বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। সুরবালা পরেশকে প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন তো মেশো মশাই?

পরেশ বলিলেন, ভালই আছি। কিন্তু এখন যে কথা বলতে ভয় করে মা! মেম সাহেব যে মা তুমি। লাট সাহেবের মেয়ের লেখাপড়ার মত যে লেখাপড়া তোমার মা, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সিফ্ট্রেট তো কোন ছার!

সুরবালা লজ্জিতের ভাবে উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, কি যে বলেন মেসো মশায়!

সে দিন সুরবালা রাজশেখর বাবু ও সুরেশকে মেঝেতে আসনে বসিয়া খাইতে রাজি করিয়াছিল।

রান্নাশেষে রাজশেখর বাবু, চন্দ্রকান্ত, বিমল বাবু ও পরেশ বাবু একসঙ্গে আহারে বসিলেন।

সুরবালা পরিবেশনের ভার নিজেই গ্রহণ করিয়া থালা লইয়া উপস্থিত হইল।

এই সময়ে সুরবালার মাথার কাপড় শ্লথ হইয়া ঘাড়ের উপর নামিয়া পড়িল।

সুরবালা লজ্জাশীলা বধূর ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইল না। সে সুরুচি ও ভদ্রতার কণ্ঠে মিনাৎকে ডাকিয়া বলিল, আয় না মিনতি! কাপড়টা এঁটে দিয়ে যা না।

মিনতি আসিয়া কাপড় সেফ্‌টিপিন দিয়া চুলের সঙ্গে আঁটিয়া দিতে দিতে বলিলেন, তুই কি একটা বলতো! কাপড়টাও এঁটে আস্‌তে পারিস্‌ নি!

সুরবালা উচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, জানই ত ভাই কেমন অগোছাল মেয়ে সুরবালা। আসি নি। আস্‌তে পারিনি। তা বলে কি করবো ভাই বল!

পরেশ বাবু চিরকালই স্বল্পাহারী। আহারের শেষের অবস্থায় সুরবালা তাঁহার পাতে কয়েকটা ক্ষীরের রস বড়া দিতে যাইল। পরেশ আপত্তি করিলেন।

সুরবালা আপত্তিটা গ্রহণ না করিয়া একটু জবরদস্তীর ভাবে পরেশের পাতে বড়া কয়েকটা চাপাইতে চাহিল। এইখানে রাজসাহীর বধূজীবনের ভাব সুরবালাকে পাইয়া বসিল।

পরেশ কি যেন ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়াই ছিল। সুরবালা যে কত বড় লোকের পত্নী, লাট সাহেবের মেমের মত তাহার বিদ্যা, কত সুখে ও উচ্চ মর্য্যাদায় সে থাকে, ঐ অবস্থায় অত

মেয়ের সঙ্গে যে তাঁহার মত লোকে কথা বলিতেও সাহস করে না, পরিশেষে সে যে তাঁহার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত, এ সব কথা তিনি ক্ষণিকের জন্ত ভুলিলেন। সুরবালার জবরদস্তীতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া মেজাজের সমতা হারাইয়া ফেলিলেন ও কতকটা ধমকের সুরে বলিয়া উঠিলেন, না, দিওনা বলছি। ও সব আমার মোটেই ভাল লাগে না। দিওনা বলছি, দিও না।

সুরবালা একটুকও ক্ষুব্ধ হইল না। মধুর হাসি হাসিয়া অসীম সম্ভ্রমে রাজশেখর বাবু ও চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখুন ত বাবা, দেখুন তো পণ্ডিত মশাই, কয়েকটা মাত্র বড়া দিচ্ছি. তা মেশোমশায় খাবেন না ? খেতেই হবে আপনাকে মেশো মশায়। মেয়ের অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

সুরবালার সশ্রদ্ধ ব্যবহারে পরেশ অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, দেবে দাও, তোমার কথা তো না মেনে উপায় নেই।

সুরবালা বলিল, রাগলেন মেশো মশায় ?

—না, না, রাগ করবো কেন তোমার মত মেয়ের ওপর ?

সুরবালা মধুর হাসি হাসিয়া মার্জ্জিত স্নেহ-কোমল গরবিনীর ঢঙ্গে মধুর ছন্দে অবনত হইয়া পরেশের পাতে বড়া দিতে দিতে বলিল, যে কয়দিন থাকি এখানে সে কয়দিন আপনার খাওয়ার ভার আমিই নেব মেশোমশায়। তাতে আপত্তি যেন করবেন না।

পরে সুরবালা বাড়ীর অন্তান্ত সকলকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইল। ঝি চাকরও বাদ গেল না। সকলেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, এবার থাকবেন তো কিছুদিন দিদি ?

একদিন শৈল ও মিনতিকে লইয়া ঘোড়ায় ছুটিতে ছুটিতে সুরবালার উৎসাহ অপরিমেয় ভাবে বাড়িয়া গেল। একটা বড় ধরণের কিছু করিবার জন্য তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

বাসায় পৌঁছিয়া ক্ষিপ্রভাবে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়ার লাগাম সহিসের হাতে দিয়া অশ্বারোহণের পোষাকে খট্ খট্ বুটের শব্দ করিতে করিতে সে নিজের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পরে পোষাক ও জুতা বদলাইয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল।

নূতন প্রেরণা তাহার হৃদয়ে কাজ করিয়া যাইতেছিল অজস্র ভাবে, কিন্তু এখনও উহা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই।

সে সুদীর্ঘকাল চুপ করিয়া রহিল। এই অবস্থায় সে কিছুকালের জন্য নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

নিদ্রাশেষে সে জাগ্রত হইয়া দেখিল নিদ্রার মধ্যে তাহার মনে এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। সে স্থির করিল সে এক নারীর দল গঠন করিয়া পদ্মায় সাঁতার দিবে।

সংকল্প স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এমন এক প্রেরণা অনুভব করিল যে সে স্থির হইয়া বসিতে থাকিতে পারিল না। তখনই সে উঠিয়া গিয়া শৈল ও মিনতির নিকট তাহার প্রস্তাব উপস্থিত করিল।

শৈল বলিল, বেশ ত হয় তা হলে সুরবালা দি!

মিনতি নিজে সাঁতার জানেন না, তথাপি তাঁহার উৎসাহ কম দেখা গেল না। বলিলেন, ধন্যবাদ তোকে সুরবালা। একটা খুব নূতন ধরণের কাজ হবে এটা।

সুরবালা নিজের প্রস্তাবটা বাড়াইয়া বলিলেন, আমরা সকলেই কলসী নিয়ে ঘাটে যাব, আর কলসীর উপর ভর করে ভেসে চল্‌বো।

কলসী কাঁখে করিয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাবটা মিনতির কাছে বড়ই বেসুরা বোধ হইল।

বলিলেন, বলিস্‌ কি তুই সুরবালা!

—কেন, বেশ একটু রোম্যান্স হবে।

মিনতি নিজে কলসী কাঁখে করেন নাই। সাধারণতঃ যাহারা কলসী কাঁখে করিয়া ঘাটে যায় তাহাদের সঙ্গে কোনও দিনও তিনি মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। বরং ঐ শ্রেণীর মেয়েদের ছোট বলিয়া, জ্ঞাতসারে না হউক, অবজ্ঞাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সুরবালার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি বলিলেন, বাবাকে গিয়ে বলব এখন। তিনি যা বল্‌বেন তাই হবে।

বিমল বাবু আসিয়াই সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজকে বাড়ীতে ভাল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার 'মশাই' মুদ্রা দোষটা সকলেই ধরিয়া বসিয়াছিল। চাকর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিত, রান্না হয় নি মশাই? এক ঝি অপর ঝিকে বলিত, নাইতে যাবি নে মশাই?

এ সব অবশ্য ঘটিত বিমল বাবুর অগোচরে।

সেই দিন অপরাহ্নে ফুলের বাগানের ধারে বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া মিনতি ও সুরবালা ক্যারম খেলিতেছিলেন। রাজশেখর বাবু ঘরের ভিতর ছিলেন।

রাজশেখর বাবু গম্ভীরভাবে ডাকিয়া বলিলেন, সুরবালা!

মিনতি আগেই শ্বশুড়কে সুরবালার প্রস্তাবটা জানাইয়াছিলেন ও কলসী কাঁখে করিয়া যাওয়ার প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা শ্বশুড়ের নিকট

প্রমাণিত করিয়া আসিয়াছিলেন ; শৈলকেও গোপনে বলিয়াছিলেন সুরবালার জয় হইবে না।

রাজশেখর বাবুর ডাক শুনিয়াই সুরবালা এই বাবা ডাকছেন বলিয়া উঠিল। তাহার কাছে কয়েকটা গুঁটি ছিল। সেই গুঁটি কয়টা বোর্ডের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া 'পারলিনে তুই মশাই' এই কথাটা বলিয়া ত্বরিত-পদে গিয়া সে রাজশেখর বাবুর ঘরে উপস্থিত হইল ও ভাল মানুষের মত শান্তভাবে বলিল, বাবা ডাকলেন ?

সুরবালার পর পরই মিনতি শৈলকে সঙ্গে করিয়া ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্ত প্রবল কৌতুহলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কার্পেট-মোড়া ঘরে গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়াছিলেন, রাজশেখর বাবু, পরেশ ও চন্দ্রকান্ত।

মিনতি শৈল, সুরবালা কেহই বসিলেন না, দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

রাজশেখর বাবু সকলকেই বসিতে বলিলেন।

তিন জন চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে রাজশেখর বাবু সুরবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ আবার কি করতে যাচ্ছ সুরবালা? পদ্মায় সাঁতার দেবে শুনছি ?

বাহিরে ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেও, সুরবালা রীতিমত ভাবে জানে যে রাজশেখর বাবু তাঁহার বড়া ব্যক্তিত্ব নিজের সামনে বেশীক্ষণ বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবেন না। তথাপি আইনের কূটতর্কে অভ্যস্ত বিচার-পতির সামনে যুক্তির দ্বারা নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্তই সহজ হইবে না ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল। গলার সুরটা নরম করিয়া ও সমস্ত মস্তিষ্কের উপর দিয়া এক স্নিগ্ধতার হাওয়া বহাইয়া দিয়া সে ধীর অবিচলিতভাবে বলিল, হ্যাঁ বাবা।

রাজশেখর বাবু বলিলেন, কি দরকার ?

—একটা নূতন ধরণের আনন্দ বাবা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজশেখর বাবু বলিলেন, কলসী নেবে শুনছি?

—হ্যাঁ বাবা।

—বৌমা কি পারবে?

সুরবালা চাপা হাসির সঙ্গে স্নেহসিক্তস্বরে বলিলেন, মিনতি যে কিছুই পারবে না বাবা। ও যে সাঁতারটাও জানে না।

রাজশেখর বাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন মিনতি সাঁতার জানে না। তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন। বেশী করিয়া অপ্রতিভ হইলেন মিনতি নিজে। সেই অপ্রতিভের ভাবটা তাহার মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

চন্দ্রকান্ত এতক্ষণ অক্লান্তভাবে নীরবে মালা জপিয়া যাইতেছিলেন। এই ঘটনাটায় তিনি মালা জপা স্থগিত রাখিয়া স্মিতমুখে মিনতির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজশেখর বাবু বলিলেন, কলসী নেওয়াটা ত একেবারেই সাধারণ।

—হ্যাঁ বাবা। অসাধারণ আমরা সাধারণের দলে নেমে যেতে চাই, সাধারণের সঙ্গে এক মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই।

—কলসীর দ্বারা কি করে এ যোগসূত্র স্থাপিত হবে?

—কলসী লক্ষ লক্ষ মেয়ের সহচর। ঐটাকেই আমরা ধরতে চাই ওই যোগসূত্রস্থাপনের প্রতীকভাবে।

রাজশেখর বাবু 'হুঁ' বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। পরে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, একটা নূতন কিছু হবে একটা। আচ্ছা যাও, করগে। যেও কলসী নিয়ে।

সুরবালার কথার গূঢ় ইঙ্গিত পরেশ সবটা বুঝিতে পারেন নাই। তবে মোটামুটি ভাবটা তিনি ধরিয়াছেন। সুরবালার উত্তরের মত

উত্তরও তিনি এ পর্যন্ত কোন নারীর মুখ হইতে শুনেন নাই। তা ছাড়া তাঁহার সুরবালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এত পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছে যে সুরবালা যাহা বলে তাহা তিনি অপার বিশ্বাসে হাঁ করিয়া শুনেন ও মনে মনে সুরবালার উচ্চ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট রাজশেখর বাবুর সাম্নে সেরেস্তাদার পরেশ এতক্ষণ কথা বলিবার সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু সুরবালার কথায় উৎসাহের চরমে উঠিয়া তিনি মনের ভারকেন্দ্র হারাইয়া ফেলিলেন। মনের ভাব আর তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

নিজকে ভুলিয়া গিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি জোরে বলিয়া উঠিলেন, তা কলসী নিয়ে যাবে বই কি মা, ঠিকই যাবে।

পরেশের এই আচমকা উৎসাহ দেখিয়া রাজশেখর বাবু কিছু বলিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে চশমা ফুঁড়িয়া এক দৃষ্টে পরেশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সুরবালা বলেন, মেশোমশায়, শৈল যাবে তো?

পরেশ বলিলেন, কেন যাবে না?

খুব যাবে! এ ত খুবই ভাল কাজ!

সুবিমলকে জানানো হইলে সে সম্মতি দিয়া জানাইল পুরুষের একদল মেয়েদের দলের আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিবে, অবশ্য মেয়েদের সম্ভ্রম সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া।

সুরেশকে সংবাদ দেওয়া হইলে সুরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, It will be a capital joke.

আলাপের পর শৈল যখন সুরবালাকে নিরালায় পাইল তখন সে বলিল, সুরবালা দি?

—কি?

—কি করলেন আপনি বলুন তো!

—কেন?

—বুঝলেম ত সবই, কিন্তু আমার যে সাঁতার দিতে ভারি লজ্জা করে।

—কেন পারবিনে সাঁতার দিতে?

—না, না, সে কথা বলছিনে। সাঁতার দেওয়াটা এমন কঠিন কাজ নয়। তবে কিনা আমার ভারি, ভারি লজ্জা করে।

—কেন, তুই তো সাধারণের সঙ্গে মিশে অনেক কাজ করিস্। হাঁসপাতালেও তো তোকে অনেকের সঙ্গে মিশতে হয়।

—হয় ত। মিশিও বটে, কিন্তু লজ্জা যায় না। ঐ জিনিষটা আমাকে অহরহঃ ঘিরে থাকে। কিছুতেই ছাড়তে পারিনে।

—ও সেরে যাবে। ভাবিস্‌নে।

কয়েক দিন পরে পুরাদস্তুর রোম্যান্সের আবহাওয়ায় মধ্যে ঘাটের দুই মাইল উজান হইতে বেলা দশটার সময় সাঁতার আরম্ভ হইল। মেয়েরা সকলেই ভাল কাপড় পরিয়া কলসী কাঁখে করিয়া নদীর ঘাটে যাত্রা করিল।

রাজশেখর বাবু ও পরেশ বাবু কস্মিনকালেও নদীতে স্নান করেন নাই। চন্দ্রকান্তও প্রাতঃস্নান ছাড়া করেন না। যদি কচিৎ কখনও করেন তাহা বাড়ীতে। সুরেশও কলের জলে স্নান করে।

আজ কিন্তু সকলেই নূতন উৎসাহে তৈল মাখিয়া গামছা হাতে করিয়া ঠিক সময়ে নদীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ ভুঁড়ির উপর পাতলা সরু পারের কাপড় পরিয়া নাগরাই চটি পায়ে দিয়া চোখে নীল চশমা আঁটিয়া খালি পায়ে গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

সাঁতার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য রাজশেখর বাবু, মিনতি ও সুরেশ প্রত্যেকেই একটি ছোট দুরবীণ হাতে লইয়া গিয়াছিলেন।

সাঁতারের সময় সুরবালা ও শৈল আস্তে আস্তে যাইতেছিল বলিয়া অপর মেয়েরা তাহাদিগকে অনেক পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

সুরবালা ও শৈল উভয়েই মাথায় কাপড় দিয়া ঐ কাপড় চিবুকের নীচে সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটিয়া দিয়াছিল।

আজ এই অবস্থায় তাহারা অতীতের বৌ মানুষের ভাবে গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

রাগিনীর শেষ সুর যেমন বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া চলে সেইরূপ ধীরে ধীরে তাহারা তরুণ সূর্য্যালোকে ছোট্ট ছোট ঢেউয়ের উপর দিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে নদীর মাঝা-মাঝি দিয়া ভাসিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রিয়া থাকিবার পর শৈল সুরবালার দিকে কৌতুহল-দীপ্ত আঁখিতে ভীত ভাবে চাহিয়া বলিল, সুরবালা দি?

—বল ভাই।

—আচ্ছা জীবনটা যদি এইরূপ ভেসে চলাই হ'ত?

—সে হলে তো ভালই হত।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে শৈল বলিল, সুরবালা দি?

—বল।

—এই নদীতেই তো একদিন পড়েছিলেন দিদি! কি রকম লেগেছিল বলুন দেখি?

—ওকথা আগে মনে করতে ভয় পেতাম। এখন পাইনে। চমৎকার রাত যে ভাই সে, ভারি চমৎকার রাত! কি সুন্দর ভেসে চলা একলা ঢেউয়ের উপর দিয়ে আঁধার রাতে বিদ্যুৎচমকের মধ্যে! আগে মনে হয়নি। এখন মনে হয় কি সুন্দর! তুই তো পড়েছিলি, অন্ত অবস্থায় যদিও। কেমন লেগেছিল বল দেখি?

—বড়ই সুন্দর দিদি, বড়ই সুন্দর। আগে শুনেছি বীরপুরুষেরা জোর করে সুন্দরী মেয়েকে হরণ করে নিয়ে যেত। এ কতকটা ঐই রকম সুরবালা দি।

—খুব সুন্দর ! না !

—খুবই সুন্দর সুরবালা দি, খুবই সুন্দর, জ্যোৎস্নাভরা নির্জ্জন শেষ রাতে পদ্মার বালির চরের উপর দিয়ে গাছপালার ভেতর মনের মানুষের বাহুতে আশ্রয় করে। জীবনে তো সে রাত আর ফিরে আসবে না দিদি।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরিশেষে শৈল বলিল, আচ্ছা দিদি, এখন যদি জ্যোৎস্না রাত হত !

সুরবালা শৈলর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, যদি অকাশে পাতলা পাতলা মেঘ আনমনে ভেসে যেত ?

শৈল বলিল, যদি সেই মেঘলা আকাশে ম্লান চন্দ্র ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্ট ও দীপ্ত হয়ে উঠত ?

সুরবালা বলিল, বাঃ, বেশ ত !

শৈল বলিল, যদি হত দিদি ?

সুরবালা বলিল, যদি ঝির ঝিরে বাতাস বইত !

শৈল বলিল, আর যদি সবুজ পাতার নীচে থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে কোকিল ডাকতো কুহু !

সুরবালা বলিল, আর যদি নদীর ধারে ধারে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটে থাকতো, আর আমরা সেই ফুল দেখতে দেখতে ভেসে যেতেম।

শৈল বলিল, কি যে বলেন দিদি ! রাত্তিরে ফোটা ফুল কি করে দেখবেন ? বলুন যদি ফুলের মধুর গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসতো !

সুরবালা বলিল, আর যদি আমরা ভেসে যেতেম গান গাইতে গাইতে আর পাগল-করা স্বামীর সঙ্গে প্রেম করতে করতে।

এই কথা বলিয়া সুরবালা জোরে হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এক পরিপূর্ণভাবে বলিষ্ঠ নারী হৃদয় হইতে। পদ্মার এই বিস্তীর্ণ নির্জ্জনতার স্বাধীনতায় তাহার মনের সমস্ত বাঁধন খুলিয়া

গেল। সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, কৃষ্টি, মান, সম্ভ্রমের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধুমাত্র বর্ণিত জ্ঞান-বর্জ্জিত মানবীতে সে পরিণত হইয়া গেল।

শৈলও সুরবালার ভাব পাইয়া বসিল। সেও সুরবালার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাট্টার কথা নয় দিদি।

উভয়েই বারম্বার হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

হাসি থামিলে বিষম কৌতুকে শৈল বলিল, মাত্রা কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছি আমরা দিদি।

সুরবালা বলিল, মাত্রা ছেড়ে যাবার জন্যই ত এখানে এসেছি। চুপ কর। আনন্দে বাধা দিস্‌নে।

এই সময়ে শৈল সুরবালার একেবারে কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া পাশাপাশি ভাবে চলিতেছিল।

ইহার পর অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না।

হঠাৎ শৈল সময়ের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সুরবালার প্রতি নিজের শ্রদ্ধার কথা ভুলিয়া গিয়া প্রিয়সখীর মত সুরবালার ঘাড়ের উপর নিজের ডানহাতখানি ফেলিয়া দিল ও পরে রসমধুর ভাবে বলিল, আচ্ছা দিদি!

সুরবালাও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিল, বল না।

—সেই রাতে?

—আচ্ছা!

—সেই চাঁদিনী রাতে?

—বেশ।

—সেই কোকিলের ডাকের মধ্যে?

—আচ্ছা!

—সেই ফোটা ফুলের গন্ধের মধ্যে?

—চমৎকার !

—সেই স্ফুট চন্দ্রের আলোতে ?

—বাঃ !

—সেই প্রাণ-উদাস-করা বাতাসের মধ্যে যদি—?

—সুরবালা অসীম কৌতুহলে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, যদি কিরে ?

শৈল বলিল, যদি—?

শৈলর কথা সমাপ্ত না হইতেই 'দুর' এই কথা বলিয়া সুরবালা জোরে শৈলকে ধাক্কা দিল।

অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া টাল সামলাইতে না পারিয়া শৈল চিৎপাত হইয়া পদ্মার জলে পড়িয়া গেল। নাকে মুখে জল খাইয়া সে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল ও পরে সাঁতার দিয়া ভাসিয়া কলসী ধরিয়া আনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চাপা হাসি হাসিতে হাসিতে সুরবালাকে ধরিবার জন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

সুরবালাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ রুদ্ধ হাসি হাসিতে হাসিতে জোরে জোরে সাঁতার দিয়া চলিল।

পরে শৈল সুরবালার নাগাল ধরিয়া তাহাকে জোরে ধাক্কা দিল। সুরবালা টাল সামলাইতে না পারিয়া নদীর জলে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল ও শৈলর মতই নাকে মুখে জল খাইয়া উঠিল। তাহার কলসীও ভাসিয়া চলিল। সে-ও সাঁতার দিয়া গিয়া কলসী ধরিয়া আনিল।

এতক্ষণে তাহারা পৌঁছিবার ঘাটের অনেক কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। কলসী ধরিয়া আনিয়া সুরবালা শৈলর কাছে পৌঁছিলে পর উভয়ে ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিল যে দূরে রাজশেখর বাবু, মিনতি

ও সুরেশ দূরবীন ধরিয়া তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন ও তৃপ্তির হাসি হাসিতেছেন।

হঠাৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। হঠাৎ উভয়েই যেন স্বর্গের পারিজাতবন হইতে জোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া কঠিন পৃথিবীর মাটিতে পড়িয়া গেল।

সুরবালা বলিল, বাস্তবিকই আমাদের অতটা করা উচিত হয় নি। কি ভাবছেন ওঁরা বল দেখি? সবই তো দেখেছেন ওঁরা।

সাঁতারের দল ঘাটে আসিয়া পৌছিলে মিছিল করিয়া অসামান্য শৃঙ্খলায় সকলেই শৈলদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

প্রথমে পুরুষ সাঁতারুর দল সুবিমলকে আগে করিয়া চলিল। পরে চলিল নারীর দল গৌরবে কলসী কাঁখে করিয়া ও কলসীতে জলের শব্দ করিয়া করিয়া। তাঁহাদের পশ্চাতে চলিলেন প্রথমে মিনতি, পরে চন্দ্রকান্ত, পরে রাজশেখর বাবু, পরেশ, সুরেশ ও বিমল বাবু।

প্রথমে তাঁহারা পদ্মার উঁচু পাড়ের অনুচ্চ বন-বীথীর মধ্য দিয়া কুমোরদের বাড়ী দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া নীচে পায়ে-হাঁটা রাস্তায় গিয়া পড়িলেন। পরে দুই ধারের বনপুষ্পের মধ্য দিয়া গিয়া ভাঁটি বন, বাঁশ বন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন রক্তফুলে সমৃদ্ধ এক কাঞ্চন গাছের তলে। পরে আম কাঁঠালের বাগান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হাটখোলার মাঠে গিয়া পড়িলেন। সেই মাঠ অতিক্রম করিয়া খালের উপরকার লোহার সেতু পার হইয়া তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন পল্লীর পাকা সদর রাস্তায়।

যখন গ্রামের ডাক ঘর, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক, ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, ডাকঘর ও হাঁসপাতাল অতিক্রম করিয়া মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া পরিপূর্ণ মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমের ভাবে চলিয়া যাইতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের দিকে নূতন এক ভাবধারার বিশিষ্ট প্রতীক স্বরূপ অপরিমেয়

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পল্লীর নূতন আবহাওয়ার গঠিত জনসমাজ তাকাইয়া রহিল ও তাহাদিগকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিতে লাগিল।

(৭০)

এইরূপ লোকের মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে উৎসবের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, সমস্ত পল্লীটাই আনন্দে মাতিয়াছিল।

সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল পার্কের পাইন গাছের ভেতরকার বিস্তৃত মাঠের মধ্যে। কলিকাতা হইতে কারিগর আনিয়া বহু টাকা ব্যয়ে সভামণ্ডপ তৈরি করা হইয়াছিল।

গরমের দিন বলিয়া সভার সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল সন্ধ্যার পরে। পাইন গাছগুলি ও সভামণ্ডপ ইলেক্ট্রিক বাল্ব দিয়া সাজানো হইয়াছিল। বাগানের ছোট ছোট ঝোপগুলিও ছোট ছোট রঙিন বাল্ব দিয়া সাজানো হইয়াছিল। পার্কের গেট হইতে মণ্ডপ পর্য্যন্ত রাস্তাটার দুই ধার ঘন পল্লবে সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। সেই পল্লবের মাঝে মাঝে ইলেট্রিক বাল্ব জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাস্তাটা আগাগোড়া লাল সালু দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত পার্কটা জুড়িয়া এক্জিবিশন বসিয়াছিল। বিপনিগুলি সব ইলেক্‌ট্রিক আলোকে সজ্জিত ছিল।

সে দিন কারখানা বন্ধ ছিল। পল্লীর বাড়ীঘর বিদ্যুতের আলোকে চমকপ্রদভাবে আলোকিত করা হইয়াছিল।

উৎসবের জন্ত কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিলিটারি ব্যাণ্ড বায়না করা হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রার মধ্যে ফুলের মালায় ঢাকা দুইখানি মোটর

গাড়ীতে রাজশেখরবাবু, সুরমা, সুশীলা, পরেশ, সুরেশ, চন্দ্রকান্ত ও বিমলবাবু বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রামের প্রধান রাস্তা ঘুরাইয়া সভামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সকলের গলায়ই ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিমলবাবু মালা পরেন নাই। বলিয়াছিলেন, আমি বড় লোক নই মশাই। আমি মালা পরবার উপযুক্ত কিছুতেই নই মশাই।

সেই শোভাযাত্রার আগে চলিয়াছিল শ্রেণীবদ্ধ চারটি ভাল ঘোড়ায় সুবিমল ও কয়েকজন বাছা বাছা যুবক।

ঘোড়ার পিছনে আসিতেছিল সুসজ্জিত হাতীর দল। হাতীর পশ্চাতে চলিতেছিল মিলিটারি ব্যাণ্ড।

সেই ব্যাণ্ডের উচ্চ বাজনায় সমস্ত পল্লী ধ্বনিত হইয়া মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

শোভাযাত্রা প্রায় আধ মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল।

সুরবালা, মিনতি ও শৈল বাড়ীতে অন্য কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেন নাই।

সভামণ্ডপের বেদীর উপর বসিয়া ছিলেন রাজশেখরবাবু প্রভৃতি পল্লীর বাছা বাছা ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ। নীচে চেয়ারে বসিয়াছিলেন পল্লীর অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ। বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপ দর্শকে ঠাসাঠাসিভাবে ভরিয়া গিয়াছিল।

সুরেশ টাক-পড়া মাথায় সাদা পোষাকে সভাঘর উজ্জ্বল করিয়া বেদীর উপর বসিয়াছিল।

সভায় স্ত্রীপুরুষের স্থান পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না। তাঁহারা পাশাপাশিই বসিয়াছিলেন।

সুরবালা ও মিনতির সঙ্গে শৈল যখন সোজাভাবে ধীরগতিতে হাঁটিয়া চোখের শান্ত, লজ্জায় অবনত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল তখন সভায় উপস্থিত লোকেরা আনন্দে ও পরিপূর্ণ সম্ভ্রমে তাঁহাদের দিকে চাহিল ও সমস্ত সভাটা শুদ্ধসৌন্দর্যের গৌরবে বিপুলভাবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। শৈল বেদীতে উপস্থিত হইয়া সেই গৌরবের বিশিষ্ট প্রতীকভাবে উপবিষ্ট হইল। সে সভায় জনসমাজের মধ্যে সেইরূপ ভাবে খচিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল যেমন পদ্মরাগমণি সোনালী পটভূমিকায় খচিত হইয়া অবস্থান করে।

সভার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শৈল কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সুরবালার নাম সভানেতৃরূপে প্রস্তাব করিল।

কথা মাত্র কয়েকটি। শৈল বাড়ীতে ও রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসিবার সময় পুনঃপুনঃ কথা কয়েকটি মনে মনে আওড়াইয়া একপ্রকার মুখস্থই করিয়া আসিয়াছিল। তথাপি এই জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কথা কয়েকটি বলিবার সময় সে রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মাথা অবনত করিয়াই সে কোনও রকমে কাজটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রস্তাবটা করায় সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় নাই কিন্তু মিনতির পীড়াপীড়িতে তাহাকে বাধ্য হইয়া রাজি হইতে হইয়াছিল।

শৈলর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে উঠিলেন স্বয়ং রাজশেখরবাবু। রাজশেখরবাবু যাহা বলিলেন, তাহা বলিলেন স্পষ্ট কথায় ধীরে ধীরে প্রতিটি কথার উপর পরিপূর্ণ জোর ও গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া। বলিলেন, তিনি সুরবালার এই নূতন সম্মানে নিজকে সম্মানিত মনে করিতেছেন। যে আকস্মিক ভয়ানক এক ঘটনায় তাঁহার সঙ্গে সুরবালার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাহা সকলেরই জানা আছে। সেইজন্ত তিনি উহার পুনরুল্লেখ করিলেন না। কিন্তু যতই দুঃখের হউক না কেন উহা যে দৈব-নির্দ্দিষ্ট ও

দেশের পরিপূর্ণ মঙ্গলের জন্ম উহা তিনি বিশ্বাস করেন হৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাসের শক্তির দ্বারা। ঐ ঘটনাটা না ঘটিলে সুরবালার আশ্চর্য্য তেজস্বিতাও প্রকাশ পাইত না ও তাহার পরবর্ত্তী জীবনও এত বড় হইয়া উঠিত না ঘটনা ও ভাবের গভীরতা ও বৈচিত্র্যে। তিনি হয়ত এক অজ্ঞাত সহরের অজ্ঞাত বাড়ীতে উন্নত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধুমাত্র গৃহকর্ম্ম করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন। তিনি মনে করেন সুরবালার কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তিনি মনে করেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ইহার পরিসমাপ্তি।

তিনি সরকারের এক উচ্চপদে অবস্থান করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ না করিয়াছেন, তার চেয়ে বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন তিনি এই পল্লীপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া।

এই সব পরিণতি দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে মরণের দরজায় দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলিতে পারিতেছেন যে তাঁহার নিজের জীবনের কর্ত্তব্য ভাল ভাবেই শেষ হইয়াছে, তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

পরিশেষে তিনি বলিলেন তাঁহার কৃতজ্ঞতার অংশভাগী সুবিমল ও শৈল দেবীও বটে, কেননা তাঁহাদের দেবানুপ্রাণিত বলিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রেরণায়ই এই পল্লীর সৃষ্টি।

রাজশেখরবাবুর কথা শেষ হইলে যখন সুরবালা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিল, তখন সভাগৃহে আবার সুদীর্ঘকাল ধরিয়া করতালি ধ্বনি উঠিল।

ধ্বনি থামিলে সুরবালা বলিবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াইল। উঠিয়া প্রথমেই সে পল্লীবাসীর সহৃদয়তা ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবনের উল্লেখ করিয়া বলিল, সে কখনও সেই উচ্চ সম্মানের পদের উপযুক্ত নহে। রাজশেখরবাবুর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া সে বলিল, রাজশেখরবাবু যাহা

বলিয়াছেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন তাহাকে তিনি স্নেহ করেন বলিয়াই। সে নিজে জানে সে একজন গৃহস্থ ঘরের বৌ, অন্যান্য গৃহস্থ ঘরের বৌয়ের মত, তবে কতকগুলি অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহাকে শিখিতে হইয়াছে গৃহস্থালী ছাড়াও অনেক নূতন বিষয়। সেগুলি না শিখিলেও তাহার নারীগৌরবের হ্রাস হইত না, শিখিয়াও যে উহা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা সে মনে করে না। সমাজের অতি ছোট অবস্থার পদদলিত ভগিনীর সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগসূত্র আছে ও মনে প্রাণে তাহার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া সে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

সে ভারতের কোটী কোটী নারীর মধ্যে একজন হইয়া থাকিতে চায়, কোটী কোটী নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে চায়। অতীতের মণিষিগণের নির্দ্দেশের যে অংশগুলি চিরকালের জন্য সমাজের মঙ্গলকর ও যাহা বর্ত্তমানের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাই গ্রহণ করিয়া ও নির্দ্দেশের ভাবের সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া সে কর্ম্মজীবনে আত্মার নূতন মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চায়। পত্নীর অপরিমিত প্রেম, কন্যার স্নেহ, সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদাজাগ্রত কর্ম্মশীলতা ও পরিশেষে অতীত ও বর্ত্তমানের মহিয়সী রমণীগণের জ্ঞানবত্তা ও শালীনতা সে নিজের জীবনে আয়ত্ত করিতে চায়। সে সমাজের বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের পক্ষপাতী নয়। সে চায় বর্ত্তমান গড়িয়া উঠুক অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া। সে বিপ্লবের পক্ষপাতী, কিন্তু সেই বিপ্লব ঘটিয়া যাক্ ধীর গতিতে, ধীর প্রগতির পথ অবলম্বন করিয়া শান্তি ও সংস্কারের পথে। সে মনে করে যে জাতি সাতশ' বৎসর ধরিয়া পরাধীন তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে জাগ্রত হওয়া একদিনের কথা নয়। সমগ্র জাতিকে ধীরে ধীরে নিজের বিশিষ্টতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের জড় মানসিকতাকে পরিহার করিতে হইবে ও ধীরে ধীরে প্রকৃষ্ট শিক্ষালাভ

করিয়া নিজের বলিষ্ঠ সত্তায় জাগ্রত হইতে হইবে ও জাতির হিতকর লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। রক্তপাতমূলক বিদ্রোহ দ্বারা সমাজে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যাইতে পারে কিন্তু ওই বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হইয়া উহা জাতির মঙ্গলের পথের একাগ্র শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

মিনতি শৈলকে বলিলেন, কি সুন্দর উচ্চারণ ওর!

শৈল বলিল, ভারি সুন্দর বক্তৃতা করতে পারেন উনি।

—ভারি সুন্দর।

—আমি ভাবি নি সুরবালাদি এত বড় হয়েছেন।

—নামজাদা বক্তা ও লেখিকা ও বাংলা ও ইংরেজীর।

—আমরাও শুনেছি। কিন্তু এতটা ভাবতে পারিনি।

এতক্ষণে সুরমা ও সুশীলা বুঝিতে পারিলেন, সুরবালা কি ও কত বড়। এই উপলব্ধির সঙ্গে তাঁহাদের সুরবালার প্রতি ঈর্ষা হইল না। বরং সুরবালাকে আপনার জন মনে করিয়া তাঁহার গৌরবে তাঁহারা নিজেরা গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন।

পরেশ হাঁ করিয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে সব কথা বুঝুন না বুঝুন, সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়াইয়া বক্তৃতায় যতিপাত করিতেছিলেন।

গান শেষে সভা ভঙ্গের পর শৈল মিনতিকে একান্তে পাইয়া বলিল, আচ্ছা বিপদে ফেলেছিলেন আমায় এই সভাপতির নাম প্রস্তাব করতে আমাকে বলে।

—কেন, বেশী কথা তো বলতে হয়নি।

—ওতেই আমার দফা রফা হয়েছিল। সারা গা ঘেমে গিয়েছিল।

—কিন্তু বলেছিলি তো কথা কয়টি বেশ সুন্দর ভাবে।

—সত্যি ?

—হাঁ, সত্যি, কোন কিছুই খারাপ হয়নি।

পরদিন সকালে সুরেশ নির্জ্জন এক ঘরে বসিয়া কালকার ঘটনাগুলি মনের সামনে উপস্থিত করিয়া উহাদের গুরুত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল সুরবালার বক্তৃতা। সে সমস্ত বক্তৃতাটি নিজের মনের ফটোগ্রাফে অঙ্কিত করিয়া লইয়া উহার প্রতিটি অংশ তীব্র সাহিত্যের সমালোচনার দ্বারা বিচার করিতেছিল।

সে এই সময়ে ঘন ঘন বর্ম্মা সিগারেট টানিতেছিল ও অসাধারণ গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল।

এই সময়ে বিমলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ তাঁহাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসাইল ও চাকরকে দুই কাপ চা দিবার জন্ম ডাকিয়া বলিল।

বিমলবাবু যে এখানে সকলের হাসির পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। তিনি যখনই কোন ঘরে কথা বলেন তখনই সে পাশের ঘরে বাড়ীর মেয়েরা জড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন একথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এখনও বিমলবাবুর সাড়া পাইয়াই সুরবালা মিনতি ও আর কয়েকজন মেয়ে পাশের ঘরের দরজায় আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন।

চাকর চা দিয়া গেলে বিমলবাবু পরিতৃপ্তি সহকারে চা পান করিতে করিতে সুরেশকে বলিলেন, ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি সুরেশবাবু। Very wonderful মশাই।

সুরেশ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। পরে কৌতূহলের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন কি দেখলেন ?

—দেখলেম বই কি! কিন্তু মেয়েমানুষের যে এত বড় ক্ষমতা তা আগে ধারণা করিনি মশাই।

—কেন, কি ক্ষমতাটা দেখলেন মেয়ে মানুষের?

—ক্ষমতা! ক্ষমতা বলে ক্ষমতা! মেয়েমানুষে যে এমন বক্তৃতে করতে পারে তাতো আগে কোনও দিন দেখিনি।

—কেন, মেয়েমানুষের বক্তৃতে কি আগে কোনও দিন শোনেন নি?

—শুনেছি তো যথেষ্ট। মেয়েমানুষের স্বদেশী বক্তৃতে নোট করবার জন্য পুলিশ সাহেব হরদম আমাকেই পাঠাতেন। কিন্তু এমনতরো তো কোনও দিনই শুনিনি।

সুরেশ কোনও প্রকারে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বিমলবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

চা খাওয়া শেষ হইলে বিমলবাবু চায়ের কাপ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, তা সুরেশবাবু, আপনি বিলেত ফেরৎ মানুষ, মস্ত লোক, great man, আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় হয় মশাই! তবে আগে থেকে অভয় দিয়ে এসেছেন বলেই কথা বলতে সাহস পাই। এটা ঠিক কথা জানবেন মশাই! তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই? অপরাধ নেবেন না ত মশাই? Offence নেবেন না তো?

সুরেশ আরও নূতন কিছু শুনিবে আশা করিয়া কৌতুহলাবিষ্ট দৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, অপরাধ নেব কেন?

বিমল সুরেশের কাছে মুখটা আনিয়া একটু ছোট সুরে বলিলেন, তিনি তো পেয়েছেন জবর মশাই, very big—

পরে এদিকে ওদিকে চাহিয়া পরিপূর্ণ দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পেরে ওঠেন ত মশাই!

কথাটা ছোট হইলেও স্পষ্ট হইয়া ভিতরে শোনা গেল। মেয়েরা

এতক্ষণ মুখে কাপড় গুঁজিয়া কোন প্রকারে হাসি রুদ্ধ করিয়া বিমলবাবুর কথা শুনিতেছিলেন। এই কথার পর আর তাঁহারা সংযম রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা জোরে সব একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে সকলেই ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

সুরেশ প্রথমে হাসিয়া উঠিল। পরে চেয়ারের উপর পিছনের দিকে হেলিয়া পড়িয়া সে হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িবার অবস্থায়ই গদ গদ স্বরে জোরে বলিয়া উঠিল, ওগো তোমরা এস গো এখানে। দেখে যাও বিমলবাবু কি মুস্কিলে পড়েছেন। বিমলবাবু আচ্ছা জব্দ হয়েছেন! ভারি মজা! দেখে যাও তোমরা।

পরে হাসি থামিলে সুরেশ বলিল, খুব বড় ধরণের রস সৃষ্টি করেছেন বিমলবাবু। এ রসের টুকরোটুকু যে সাহিত্য সমালোচকদের কাছে কত মূল্যবান তা আপনি বুঝতে পারছেন না।

এই অগ্ন্যুৎপাতে বিমল বিপর্যাস্ত হইলেন না। সুরেশের শেষের কথাও তিনি বুঝিলেন না! ব্যাপারটা তিনি কিছুক্ষণ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিলেন। পরে বলিলেন, তা truth যা তা বলবই মশাই। তাতে ভয় পাবো কেন মশাই?

সভাশেষে সুরবালা সুবিমলকে বলিল, কাগজে ছেপে দেব সুবিমলবাবু এই পল্লীর কথাগুলো?

সুবিমল বলিল, না দিদি, ও জিনিষটা করবেন না। আমরা গোপনেই কাজ করছি, গোপনেই কাজ করে যেতে চাই।

সভাভঙ্গের পর বাড়ীতে পৌছিয়া পত্নীর সঙ্গে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্পর্কের কথা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বজীবনের ভাব সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইয়া পরেশ উন্মত্ত উল্লাসে সুরমাকে বলিলেন, ভাখো, আশ্চর্য্য হচ্ছি আমি আজকার ব্যাপার দেখে। আমিতো ভাবতে পারিনি আগে এতটা হয়েছে বা হতে পারে। হারামজাদা যে এতটা করতে পারে তা ভাবিনি।

সুরমা স্বামীর উল্লাসে যোগ দিলেন না। ভয়ানক ক্রোধে ধমকের সুরে স্বামীর উৎসাহের প্রতিঘাতে বলিয়া উঠিলেন, থামো। বুড়ো হলে, তবুও তোমার কথা ভাল হল না।

পরেশ পত্নীর ব্যবহারে বোকা বনিয়া গেলেন যদিও এরূপ ব্যবহার নূতন নয়। ঢোক গিলিয়া থতমত ভাবে তিনি বলিলেন, আমার কথার ধরণই ওই। ভাল লেখাপড়া শিখিনি, ভাল কথা বলতেও শিখিনি।

স্ত্রীর রাগ চরমে উঠিল। নিষ্ঠুরভাবে মুখ ভেঙ্গচাইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যা শেখনি তা করতে যাও কেন? পাজি, বদমাইস! চুপ করে থেকো এখন থেকে বল্লেম! কথা বলো না বুঝেছ? বুঝেছ কথা বলো না? পাজি কোথাকার! কথাটা কানে গিয়েছে তো? চুপ করে থেকো এখন থেকে। বুঝলে? মেয়েটাকে তো খেয়েছ। থাকলে আজ কত সুখী হ'ত সে! বুঝে দেখিছিস্ কি হতভাগা মিন্‌সে? বুঝে দেখিছিস্ কি পোড়ারমুখো? শয়তান! তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না আমার। সরে যা আমার সাম্‌নে থেকে।

পত্নীর কথার আঘাত ভয়ানক হইলেও ঐ আঘাতটা তাঁহার হৃদয়ে জোরে বাজিল না। মেয়ের ভয়ানক স্মৃতি মনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

সম্পূর্ণভাবে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল। নিরুপায় ভাবে তিনি মরিয়ার সুরে বলিয়া উঠিলেন, ওকথা আবার মনে করালে কেন? কি অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে? কি মহাপাপ করেছি? রক্ষে করো, রক্ষে করো, আমি আর সহ্য করতে পারিনে। ওর কথা মনে করলে যে আমি পাগলের মত হয়ে যাই। ও যে আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে ভূতের মত। কি অপরাধ করেছিলেম ওর কাছে? কি সর্ব্বনাশটাই ও করলে হতভাগিনী! ওঃ!

ইহার পর তিনি এক নির্জ্জন আঁধার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন ও পরক্ষণেই মর্ম্মান্তিক নিরাশার হুম্ শব্দ তিনি শূন্য বাতাসে ছাড়িয়া দিলেন। পরক্ষণেই ভয়ানক শূন্যতায় তাহার মন প্রাণ ভরিয়া গেল। তিনি অতলগর্ভ গহ্বরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহার পায়ের দুই পাতায় তিনি এক রি রি করিয়া ওঠার ভাব অনুভব করিলেন। পায়ের পাতা জোরে বক্র করিয়া তিনি সেই ভাবটাকে চাপিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাবটা মোটেই চাপিয়া গেল না। উহা তাঁহার সর্ব্বশরীরে সংক্রামিত হইয়া ভয়ানক দীর্ঘকাল স্থায়ী অপস্মার ব্যারামে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার দেহযন্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ও সমস্ত শরীরটাকে প্রবল আক্ষেপে দুমরাইয়া দিতে লাগিল। পরেশ একলা সর্ব্বজনপরিত্যক্ত নিঃসহায় অবস্থায় সেই উন্মত্ত আক্ষেপে নিজকে সমর্পণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

সুদীর্ঘকাল ঝড়ের তাণ্ডব শরীর ও মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইবার পর যখন উহা থামিয়া গেল তখন দেখা গেল পরেশ অবসন্ন অবস্থায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ও তাঁহার মুদিত দুই চোখের প্রান্তে ক্লেদ-মিশ্রিত অশ্রু সঞ্চিত হইয়া আছে ও তাঁহার মুখটা অত্যন্ত হীনভাবে বক্র হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন পর বাসন্তী বিজয়া। বিশিষ্ট অতিথি সব চলিয়া গিয়াছেন। পরেশ ও সুরমা এ পর্য্যন্তও রহিয়া গিয়াছেন।

সেই দিন দুপুরের আহারের পর সুবিমল একলাই একখানা নৌকায় উঠিল। সন্ধ্যার পর সুবিমলের পল্লী ও আশে পাশের পল্লীর বাসন্তী-প্রতিমাগুলি চলমান ঢাকের শব্দের মধ্যে ও লোকের উল্লসিত কোলাহলের মধ্যে একে একে ডুবানো হইলে ও কোলাহল থামিয়া নদীতে শান্তি আসিলে পর নৌকার মাঝিকে সুবিমল বলিল, মাঝি, নৌকো ভাসিয়ে দে। বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

মাঝি বলিল, ভাসিয়ে দেব বাবু নৌকো ?

—হাঁ। ভাসিয়ে দে। কথা বলিস্‌নে। চুপ করে থাক্‌বি।

তখন বাতাস বহিতেছিল খুব মৃদু ভাবে। নৌকা দশমীর চাঁদের আলোর মধ্যে ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর দিয়া অস্ফুট নিয়মিত শব্দ করিতে করিতে নদীর স্রোতের বরাবর ভাসিয়া চলিল।

সুবিমল কয়েকদিন হইল সফলতার উন্মত্ত আনন্দ অনুভব করিতেছে। সে এখন নৌকার উপর চিত হইয়া শুইয়া উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া প্রকৃতির অনন্ত সত্বাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজকে ভুলিয়া গেল। এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহা সে জানে না। যখন নৌকা ফিরিয়া আসিয়া ঘাটে পৌঁছিল তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

বাড়ী আসিয়া ঘরে গিয়া সুবিমল দেখিল ঘরটা শৈল আগাগোড়া ফুল, ফুলের মালা ও ভাল ভাল ছবি দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুতের আলোর তারে সে বড়শক্তির সবুজ রঙ্গের বাল্‌ব জুড়িয়া দিয়াছে। আতরজল ছিটাইয়া দেওয়াতে সমস্ত ঘর সুগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। শোয়ার খাটে গদি পাতা হইয়াছে ও গদির উপর রঙিন চাদর পাতা হইয়াছে।

সুবিমল চাহিয়া দেখিল, সবুজ আলোতে উজ্জ্বল মার্ব্বেলের মেঝের উপরে আসন পাতা আছে। তাহার পাশে ঝকঝকে পরিষ্কার গেলাসে জল রাখা আছে। গেলাস ঢাকনী দিয়া ঢাকা আছে।

শৈল বলিল, অবাক্ হয়ে রইলে যে তুমি?

—অবাক্ হয়ে রইলেম এত বিলাসিতার আয়োজন করেছ দেখে।

--কেন, তুমি কি কোন জায়গায় বিলাসের আয়োজন কর নি?

—কোথায় করেছি?

—এই যে মার্ব্বেলের ঘর, কুশন চেয়ার, এত ঘটার সভা।

—ও সব করা দরকার। নিজের জন্য তো করিনি।

—আমিও তবে বল্‌বো আমি নিজের জন্য কিছু করিনি। এসব আমার বাসন্তী বিজয়ার একটা লীলা, তোমার আনন্দের জন্য। ওতে তোমাকে ছাড়া আমার নিজের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। তোমাতেই আমি ডুবে আছি, চিরকাল ডুবেই থাক্‌তে চাই। সেই ডুবে থাক্‌বো আজ ফুলের মধ্যে, ছবির মধ্যে, রসের মধ্যে, পরিচ্ছন্নতার মধ্যে।

—বটে! এত বড় কবিত্ব! এই কবিত্ব দিয়েই তো আমায় বেঁধে রেখেছ। পারবে সত্যি চিরকাল ডুবে থাক্‌তে?

—কেন পারবো না?

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। শেষে শৈল বলিল, যাও অনেক রাত হয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে খাবারগুলো খেয়ে নাও।

সুবিমল আহারে বসিলে শৈল সুবিমলের পাতের সাম্‌নে গিয়া বসিল।

সুবিমল বলিল, চাকর, ঠাকুর, ঝি কোথায় গেল?

শৈল উত্তর করিল না।

সুবিমল আবার জিজ্ঞাসা করিলে শৈল উত্তর করিল, বিদেয় দিয়েছি।

—কেন?

—কেন, একদিনের জন্তও কি তোমাকে রেঁধে খাইয়ে সেবা করতে পারিনে ?

—রেঁধেছ তুমি ? বল কি ?

—থাক খাও তুমি।

—রেঁধেছ তুমি ?

এই কথা বলিয়া ভাবগর্ভ, সমাহিত, উপভোগ-রঞ্জিত শান্তির দৃষ্টিতে সুবিমল শৈলর দিকে তাকাইয়া রহিল।

শৈল গদ গদ কণ্ঠে বলিল, কি দেখছ ?

—দেখছি তোমাকে।

—আমি কি নূতন জিনিষ ?

—তুমি আমার কাছে চির নূতন।

শৈল হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। পরে মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি নিরুদ্ধ করিয়া গদ গদ কণ্ঠে বিহ্বল চোখে মাথার শাড়ীর বিচিত্র চওড়া পাড়ের নীচ দিয়া ঘন ঘন কটাক্ষ হানিতে হানিতে বলিল, কবি হয়ে পড়লে যে।

এই আত্মসমর্পণ দেহ, মন, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—পবিত্র, গভীর।

স্তব্ধ দীপ্ত প্রীতিতে সুবিমল শৈলর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাকে দেখলেই যে আমি কবি হয়ে যাই, সব ভুলে যাই।

—কেন ? আমি যে নিতান্তই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

—তুমি আমার কাছে মানুষ নও, তুমি আমার কাছে স্বপ্ন।

—যাক্ আর কাব্য করে কি হবে ? খাও এখন।

—তুমি রেঁধেছ ?

—হাঁ।

—সব !

—হাঁ গো হাঁ, বল্‌ছি হাঁ।

—কেন ?

—রান্‌তে কি নেই মাঝে মাঝে ?

—আগে তো রাঁধনি।

—আজ খেয়াল হল।

—খেয়ালটা হঠাৎ কি করে হল শুনি ?

—হল।

—কি করে ?

—সুরবালাদিকে দেখে।

—কি দেখলে সুরবালাদির ?

—কত বড় অথচ কত ছোট হয়ে থাকতে চায় সে। কেমন উৎসাহ দেখায় ছোট কাজেও।

আহার শেষে হাতমুখ খোওয়ার পর যখন সুবিমল খাটের ধারে নীচে পা ঝুলাইয়া বসিল, তখন শৈল গিয়া খাটের কাঠের বালিশে মাথা চিত করিয়া রাখিয়া মুখ ভাসাইয়া অলস বিলাসিনীর মত কিছুক্ষণ অর্দ্ধনিমিলীত দৃষ্টিতে একভাবে স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল। এই সময়ে তাহার শরীরের সমস্ত ভাঁজগুলি এলাইয়া পড়িয়া অলস-দীপ্ত স্পষ্টতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পরে সে সক্রিয় হইয়া উঠিয়া স্বামীর পাশে বসিয়া স্বামীর কাঁধের উপর দিয়া নিজের উজ্জ্বল, গৌর, পরিপুষ্ট, একরাশ সোনার চুড়ি-পড়া সুডৌল হাতখানি রাখিয়া স্বামীর পিঠের একাংশে গভীর আদরে এলাইয়া পড়িল।

পরে বলিল, আজ আবার আমার একটা খেয়াল হয়েছে।

—আবার খেয়াল হল কেন ?

—খেয়াল কি হতে নেই? তুমি যে আমার একশ' খেয়ালের মানুষ।

—বটে!

—হাঁ, একশ' কেন? তুমি আমার হাজার খেয়ালের মানুষ। শুধু হাজার কেন? তুমি আমার লক্ষ খেয়ালের মানুষ। বুঝেছ?

—হাঁ, বুঝেছি। তার পর—?

কিছুক্ষণ শৈল কেবল তাকাইয়া রহিল, কথা কহিল না। পরিশেষে বলিল, ভাখো, জেন কেবল তোমাকেই আমি সেবা করতে চাই।

—সেবা তো তুমি কম করনি?

—সেবার মত সেবা করতে পেরেছি কি?

—খুব পেরেছ।

আবার কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরিশেষে শৈল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, খেয়ালের কথা বল্লেম না? ভাল কথা!

—কি?

—মা বাবাকে প্রণাম করে এসেছ?

—এসেছি।

—সত্যি এসেছ তো? না মিথ্যে বলছ?

—সত্যি এসেছি।

—তাঁরা এখনও ঘুমান নি।

—না।

অনেকক্ষণ মৌন থাকিবার পর সুবিমল বলিল, খেয়ালের কথাটা বলছিলে না? খেয়ালটা কি শুনি?

—হাঁ বলছি। আমি বাসন্তী বিজয়ার রাত্তিরে কোনও দিন তোমাকে প্রণাম করিনি।

—আজ আবার এ খেয়াল হল কেন?

—না খেয়াল নয়। সত্যিই ভেবে দেখেছি একটা বড় কর্ত্তব্যের অবহেলা আমি এতদিন করে এসেছি।

শৈল আজ লাল জড়ির কাজ করা রেল-পেড়ে এক দামী নূতন শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল।

এই কথা বলিবার পর সেই পরিশুদ্ধশ্রী নারী শাড়ীতে খস্ খস্ শব্দ করিয়া রাজরাণীর মত মহামহিমভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল ও পরে স্বামীর পায়ের উপর গৌরবান্বিতভাবে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইয়া পত্নীর প্রণাম গ্রহণ করিল।

পরে পত্নী স্বামীর পা ধরিয়া উন্মুখদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া আকুলিত প্রার্থনায় বলিল, ছাখো, আজ আমায় একটা আশীর্ব্বাদ করবে?

—কি আশীর্ব্বাদ?

—করবে?

—করবো।

—আশীর্ব্বাদ কর এ জীবনে যেন আমি তোমায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত হতে পারি।

—এই আশীর্ব্বাদ! শুধু এ জীবনে কেন, আমরা যে জন্ম জন্মান্তরের সাথী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি শুধু তুমিই নও, আমিও যেন জন্ম জন্মান্তরের জন্ত তোমার উপযুক্ত হতে পারি।

এই বলিয়া সুবিমল তাহার স্থিরযৌবনা পত্নীকে আদরে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীও মাথাটা স্বামীর স্কন্ধে অবিচলিত নির্ভরতায় স্থাপন করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর সুবিমল কতকটা বিমূঢ়ভাবে বলিল, শৈল?

—আজ্ঞে।

—আমার মত ভাগ্যবান এ পৃথিবীতে কয়জন আছে? আমার মত সুখী কয়জন আছে শৈল?

এই কথায় শৈল ভয়ানক কৌতূহল অনুভব করিল। সে অকস্মাৎ মাথা উঠাইয়া লইয়া পশ্চাতে একটু হেলিয়া স্বামীর গলা নিজের বাহুর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া গোলাপের দেশের গোলাপী নারীর ন্যায় স্থির পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে তাহার শাড়ী মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়া তাহার বিশাল খোপার খাঁচে আটকাইয়া পড়িয়া স্থির হইয়া রহিল। তাহার গোলাপী মার্ব্বেলে কাটার মত কাটা সুগঠিত উচ্চ বুক ও মরালগ্রীবার কিয়দংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল। ভাগ্যশ্রীতে পরিপুষ্ট নিখুঁত মসৃন কপাল দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় তাহার মুখটা অসাধারণ সজীবতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল।

সে আজ মুখটা ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া উহাতে ভাল করিয়া ক্রীম মাখিয়াছিল। চুলটাতে ভাল করিয়া গন্ধতৈল মাখিয়া পরিপাটি-ভাবে চিরুণী বুরুশ দিয়া পালিশ করিয়াছিল। তুলিতে আঁকা ভ্রু মাজিয়া-ছিল। পরিপুষ্ট আগা-সুরু আঙ্গুলের নখগুলি আজ সে পরিপাটিভাবে কাটিয়া আসিয়াছিল।

এই অবস্থায় সে রসপুষ্ট, আদরমিশ্রিত, হাসিতে স্বরটা তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল, সত্যি, আমায় তুমি ভালবাস? সত্যি, তুমি আমায় দিয়ে সুখী?

সুবিমল কতকটা বিমূঢ়ভাবে বলিল, খুব সুখী শৈল, খুব সুখী।

এই কথার পর যেমন নূতন বসন্তে উষার আলো পৃথিবীকে নূতনতায় ভরিয়া দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অসীম আদরে চুম্বন করে সেইরূপ

আদরে সে নিজের সৌন্দর্য্যের আলোর দ্বারা সুবিমলকে নূতনতায় প্লাবিত করিয়া দিল ও সেই ঘরের সেই রাত্রির ঘন-ঘোর বিচিত্রতার মধ্যে নিজের ফোটা ওষ্ঠাধর দিয়া সুবিমলের ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিল।

সুবিমল এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সে পত্নীর বাহুদ্বয়ের মধ্যে নিঃসহায় বাধ্যতায় আত্মসমর্পণ করিল।

উত্তেজনা প্রবল হইল কিন্তু উহা সঙ্কীর্ণ প্রবাহের খাতের গলিপথে দ্রুত বহিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া পৃথিবীর বাইরের এক প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়া নিজের পার্থিবসত্বার হুল-ফুটানো বিষ হারাইয়া ফেলিল।

এই অবস্থায় তাহাদের মনে হীন প্রবৃত্তি স্থান পাইল না।

চুম্বনশেষে শৈল শুইয়া পড়িল। প্রবল ধাক্কায় তাহার মাথার সমস্ত শক্তি ভয়ানকভাবে এলোমেলো হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে সেই বিশৃঙ্খল শক্তিগুলিকে হৃৎপিণ্ড হইতে উৎসারিত এক উত্তেজনায় ভাবের দ্বারা রসায়িত করিয়া মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করিয়া সে নিজের চিন্ময় সত্বাতে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সুবিমলও শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুমাইল না। সেও সুদীর্ঘকাল আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে সেই রূপান্তরিত উত্তেজনা পড়িয়া গেলে, যেমন ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া এক গুরু-গম্ভীর গম্ গম্ শব্দ উঠিতে থাকে সেইরূপ গুরুগম্ভীরভাবে এক গভীর দুর্দ্দমনীয় তেজ অশ্রুতধ্বনিতে তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়া উঠিয়া তাহাকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

এই অবস্থায় সে বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া গিয়া মেঝেতে দ্রুতপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাইচারি করিতে লাগিল।

শৈল বিদ্যুতের আলোকে মাখনের মত কোমল বিছানায় অর্দ্ধ উন্মুক্ত

অবস্থায় এলাইয়া পড়িয়া অচেতন অবস্থায় অবস্থিত ছিল। সুবিমল সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিল না।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনায় তাহার স্নায়ু অসার হইয়া পড়িল। আবার সে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই সে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রার অবস্থায় সে এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল দূরে, সমুদ্রের পরপারে, দীপ্তবসন্তের দেশে সে ও শৈল এক জ্যোতিঃসমুদ্রের উদ্বেলিত ঢেউয়ের উপর দিয়া পাশাপাশি অবস্থান অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছে। শৈল এক গাঢ় লাল রেশমী শাড়ী পরিয়াছে ও তাহার দেহ ভেদ করিয়া এক আশ্চর্য্য আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই শাড়ীর লাল রঙ ও আলো তাহার দেহকে কেন্দ্র করিয়া সজীবতায় গাঢ় এক জ্যোতিঃ-মণ্ডল রচনা করিয়াছে। শৈল সুবিমলের দিকে এমন ভাবে মাথা ফিরাইয়া চাহিতেছে ও চাহিয়া এমন ভাবে হাসিতেছে যে সেই চাহনী ও হাসির লোকাতীত স্নিগ্ধতায় সুবিমলের মন গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ও ঘুমের মধ্যে পুনরায় আচ্ছন্নভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হিপ্‌নটিজমের মিডিয়ামের মত গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল।

আজ তাহার প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা হইল না।

যখন সে নিদ্রাশেষে জাগ্রত হইল তখন সে সুদীর্ঘকাল চোখ বুঁজিয়া রহিল। শান্ত শরৎপ্রভাতে দূর হইতে বাতাসে ভর করিয়া মঙ্গল-আরতির ঘড়ি কাঁসির শব্দ ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিয়া মনকে পবিত্র শান্তিতে ভরিয়া দেয়। সুবিমল দেখিল তাহার পূর্ব্বেকার উগ্র উত্তেজনা সেইরূপ পবিত্র শান্তির আবেশে অনুরঞ্জিত হইয়া শান্ত হইয়া গিয়াছে ও তাহার হৃদয়টাকে সুধারসে ভরিয়া দিয়াছে!

যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল তখন দেখিল শাড়ীতে-ঢাকা চারু-নিতম্বিনী শৈল ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া দুই কোমল হাত দিয়া জানালার দুই

গরাদ ধরিয়া দেবশিখায় গড়া দেবীপ্রতিমার মত বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে ও তাহার ফাঁক দিয়া প্রভাতসূর্য্যের সোনালী আলো রেখার ঝড়নায় ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সমস্ত মন প্রাণ ভরিয়া গেল সুবিমলের। সে বলিয়া উঠিল, উঃ, কি আনন্দ!

'বটে!' এই কথা বলিয়া শৈল স্বামীর শয্যাপার্শ্বে অগ্রসর হইয়া আসিল। পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্ষণিকের জন্ত কটাক্ষ হানিল ও পরে মৃদু হাসিতে ওষ্ঠাধর ঈষৎ বক্র করিয়া অবনত হইয়া স্বামীকে চুম্বন করিল। চুম্বনশেষে গভীর শ্রদ্ধায় সে স্বামীকে প্রণাম করিল। পরে সে ধীরে ধীরে দরজা খুলিল ও চারুছন্দে দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর সুবিমল আশ্চর্য্য হইয়া আবিষ্কার করিল যে যে মুক্তির আস্বাদ সে ইতিপূর্ব্বে মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে অনুভব করিয়াছিল সেই মুক্তি আজকার ঘটনার পর যেন তাহার ভিতরে সম্পূর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। আজ সে দেখিল যে স্বপ্নের মহামিলনের পর শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদের ঝড়নায় অমৃতময় শান্তিজলে যেন তাহার সমস্ত সত্তাটা স্নান করিয়া উঠিয়াছে ও উহা যেন ঝড়ের পর মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় আশ্চর্য্য নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতায় ভরিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পর যখন স্বামী-স্ত্রী অবসর অবস্থায় একত্র বসিবার সুযোগ পাইল তখন স্বামী বলিল, শৈল, আজকার মত আনন্দ আমি কোনও দিনই পাই নি।

—কার জন্ত বল ত?

—তোমার জন্ত।

—বলত নিজের কথা রক্ষে করতে পেরেছি কিনা?

—কি কথা ?

—তোমাকে চিরদিন রসে ডুবিয়ে রাখবো। পেরেছি সে কথা রক্ষে করতে ?

—পেরেছ। খুবই পেরেছ। যাক্ শৈল সে কথা। ছাখো আজ আমার ভেতরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ অজস্র ভাবে ঝড়ে পড়ছে। এমন এক উন্মত্ত আনন্দ আমি অনুভব করছি যে আমি অনবরতই বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম করছি। সেই আনন্দের ভেতর দিয়ে আপনা আপনিই আমি পরমপুরুষে সংযুক্ত হচ্ছি। জীবন এখন আমার কাছে মোটেই ফাঁকা নয়। জীবন ওর অসীম ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমার মনের সাম্নে উজ্জ্বল ভাবে সত্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জন্ম ও মৃত্যুর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এ জীবনটা আমাদের দুই অনন্ত জীবনের মাঝখানে এক বিস্মরণের অবস্থা, বোধ হয় সত্ত্বার পরিণতির জন্য। কি পরিণতিতে যে গিয়ে পড়ব তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত এ জীবনে হবে না। শুধু মাত্র আভাস পাচ্ছি ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে। তাতেই আনন্দে ও আশায় সত্ত্বা ভরে উঠছে। ছাখো উপাসনায় আর আমাদের প্রতীকের প্রয়োজন নেই। আবার ব্যবহারেরও কঠোরতার কোন প্রয়োজন নেই। অভ্যাসকে আজ আমরা জয় করতে পেরেছি। আমরা আজ থেকে অনিয়মের ভেতর দিয়েই জীবন কাটিয়ে চল্‌তে চাই। আমি যোড়শীর পাষাণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে চাই ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের গণ্ডী পার হয়ে সহজ দীপ্ত মানসপূজার ধর্ম্মে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।

শৈল বলিল, কালকের পর থেকে আমারও মনে বিপর্যায় ঘটেছে। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি। আমিও ঐ ভাবে তোমার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই।

চন্দ্রকান্তের দিন ফুরাইল।

সুবিমলের পল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে পরেশ বাবু ফিরিয়া আসিলে তিনি পরেশ বাবুকে বলিলেন, পরেশ বাবু, আজ আমার একটু জ্বর বোধ হচ্ছে। কয়েকদিন হইল আমার মনে হচ্ছে আমার শেষ-দিন অতি নিকটে।

রাত্রিশেষে জ্বর প্রবল হইল। সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও বুকের বেদনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকালে ডাক্তার রোগনির্ণয় করিয়া বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া।

পরদিন সকালে লক্ষণ একটু ভাল দেখা গেল। ডাক্তার বলিলেন, ওষুধে বেশ ফল করেছে। কালই হয়ত অনেকটা ভাল হয়ে যাবেন। তবে বয়স বেশী হয়েছে ওঁর। এই যা ভয়। কখন কি হয় বলা যায় না।

অসুখের প্রথম দিকটাই পরেশ বাবু ও সুরমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সংবাদ পাইবামাত্র সুবিমল ও শৈল পল্লী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ সম্প্রতি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছে। বিলাতের এক সাহিত্যসভায় তাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। কিছুদিন সে সস্ত্রীক বিলাতে থাকিবে ও পরে উভয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করিবে, এই উদ্দেশ্যে সে কলেজ হইতে লম্বা ছুটি লইয়া সুরবালাকে সঙ্গে করিয়া রাজসাহীতে আসিয়া আছে। কথা আছে তাহারা কয়েকদিন বাদেই রওনা হইয়া যাইবে।

অসুখের সংবাদ পাইয়া সুরবালা আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইয়াই সে চন্দ্রকান্তের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল।

সুরবালার মত মেয়ে তাঁহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিবে ইহা চন্দ্রকান্ত আশাও করেন নাই। যখন বুঝিলেন সুরবালা সত্য সত্যই তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে তখন তিনি বামন হইয়া চাঁদ হাতে পাইলেন। কঠিন পীড়ার মধ্যেও তিনি শান্তি পাইবেন ভাবিয়া পুলকিত ও আশ্বস্ত হইলেন।

প্রথমে একটু আপত্তির সুরে বলিলেন, এত বড় লোক তুমি মা! এত কষ্ট করতে কেন যাবে মা? সুশীলা মা আছে। সেই যা হয় করবে।

সুরবালার সস্নেহ ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার ও ইচ্ছার ঐকান্তিকতায় এ আপত্তি টিঁকিল না।

পরেশ বাবু চন্দ্রকান্তের শয্যার পাশে প্রায়ই বসিয়া থাকিতেন। তিনি রাত্রির পর রাত্রি ঐ ভাবেই কাটাইয়া দিতেন ও ক্ষণে ক্ষণে সুরবালাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া সুরবালাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন।

একদিন পরেশ বলিলেন, আমি যে এত কথা জিজ্ঞেস করি মা, তাতে তো তুমি বিরক্ত হও না মা? তুমি যে খুব বড় মা। তুমি যে কত বড় মেয়ে তা আমি ধারণাই করতে পারি নে। তুমি যে খুবই ভাল মা। তাই তুমি এত বড় হলেও জিজ্ঞেস করতে সাহসী হই।

সুরবালা একটু লজ্জিতের ভাবে বলিল, না, না, মেশোমশায়, কি যে বলেন আপনি! বিরক্ত কেন হব বলুন তো? আমি যে আপনার মেয়ে। আমি আপনার কাছে থাকতে পারলে যে কত সুখী হই তা আর কি করে বলব! আর আমি বড় আপনাদের চেয়ে কিছুতেই নই। আমি চিরদিন আপনাদের স্নেহময়ী কন্যাই হয়ে থাকতে চাই।

পরেশের সঙ্গে এতদিন ব্যবহার করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদুষী রমণী সুরবালা বুঝিতে পারিয়াছে পরেশের মনের তলে এক তপ্ত লোহকটাহে বিষাক্ত পদার্থ ফুটিতেছে। সেই কটাহ হইতে দূষিত গ্যাস বাহির হইয়া তাঁহার মনের সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভয়ানক ভারাক্রান্ত মন লইয়া অহরহঃ এক অসহ্য জীবন যাপন করিয়া চলিতেছে। তাঁহার প্রতি কাজে ও ব্যবহারে নরকের তপ্ত-লোহ-শলাকা-বিদ্ধ পাপীর পারিত্রাহি কান্নার মত দুঃসহ কান্নার ভাব ঠেলিয়া উঠিতে চায়। কেহ উহা জানে না, বুঝে না।

সুরবালা চন্দ্রকান্তের ঘর ও বিছানা ফিটফাট্ করিয়া রাখে। কোন জায়গায় কোন ময়লা বা দুর্গন্ধ সঞ্চিত হইতে দেয় না। ঘরে বিশেষ কাজ ছাড়া কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না। কাজগুলি সে করিয়া যায় ক্ষিপ্র সুশৃঙ্খলভাবে বিলাতী ধাত্রীর মত।

কয়েকদিন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়া একদিন চন্দ্রকান্ত দুপুরে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুক দৃঢ়ভাবে তুলার পটি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করা ছিল।

সুরবালাকে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, সুরবালা মা, সকলকে ডেকে দাও মা। আমার কয়েকটা কথা বলবার আছে।

সুরবালা ডাকিলে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

শঙ্কর বলিল, আজ একটু বোধ হয় ভাল আছেন দাদা মশায়? কাল বোধ হয় অনেকটা ভাল হয়ে যাবেন।

চন্দ্রকান্ত রোগপাণ্ডুর মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া থামিয়া থামিয়া বলিয়া চলিলেন, মৃত্যুযন্ত্রণা যে কি বাবা! কাল এই সময়ে আমার শেষ জানবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সেই কথা শুনিয়া সকলের মুখ বিবর্ণ হইল।

চন্দ্রকান্ত চাপা-গলায় আশ্বস্ত সুরে বলিলেন, তোমরা এত দুঃখিত হচ্ছ কেন বলতো ? আমার বয়স হয়েছে আশির অনেক ওপরে। সুখী দেখে যাচ্ছি তোমাদের সকলকে। আমার তো কোন দুঃখ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই।

শঙ্কর ও সুবিমলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, বাবা বিমল, বাবা শঙ্কর।

সুবিমল কোন কথা বলিল না, অসীম শ্রদ্ধায় চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল, ভাল হয়ে যাবেন আপনি দাদা মশাই।

চন্দ্রকান্ত ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিলেন, স্থাখ্ ভাল করে শোন বল্ছি। আমাকে কতকগুলি কথা বল্তে হবে তাই জোর করে উঠে বসেছি। বাবা বিমল, তুমি ঠিক পথ ধরেছ। বাবা শঙ্কর, বিমলের মত ধর্ম্মপথে থেকো বাবা। চিরদিন ভাল কাজ করে যাবে বাবা। জান্‌বে পাপের রাজত্ব বেশীদিন টিঁকে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্ত পূর্ব্ববৎ ভাবেই বলিলেন বাবা শঙ্কর, আমার সুশীলা মা রৈল। যদিও ওর মেয়ে জামাই আছে তবুও তাদের বাড়ীতে ও যাবে কেন ? এ বাড়ী যে ওরও বাড়ী। বাবা বিমল, ওকে নিতে চেয়ো না বাবা। ও শঙ্করের কাছেই থাক্‌বে। শঙ্করকে দেখবার মত কেউ নেই যে বাবা।

সুশীলাকে বলিলেন, সুশীলা মা, তুমি যেন শঙ্করকে ছেড়ে যেও না।

উচ্ছ্বাসে সুশীলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

পরেশ বাবুকে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, শঙ্করের মুরুব্বি রইলেন আপনি পরেশ বাবু। আপদে বিপদে দেখবেন ওকে আপনি।

পরেশ বাবু বলিলেন, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন পণ্ডিত মশায়। আমি থাকৃতে শঙ্করের কেউ কিছু করতে পারবে না।

সুবিমলকে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বিমল বাবা, ভাইয়ের মত দেখিস্ যেন চিরদিন শঙ্করকে।

সুবিমল মাথা নাড়াইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, পরেশ বাবু, আমি শেষ নিকটে দেখে একখানা উইল করে রেখেছি। বাবা শঙ্কর, বাক্স থেকে উইলখানি বের কর দেখি বাবা।

উইল বাহির করা হইলে চন্দ্রকান্তের নির্দ্দেশে শঙ্কর উহা পড়িল।

উইলে চন্দ্রকান্ত জীবনের সঞ্চিত পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে শঙ্করের জন্য পনর হাজার ও বাড়ীর শালগ্রাম শিলা ও দেবী মঙ্গলচণ্ডীর বিগ্রহের পূজার জন্য পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়াছেন। বাকী পাঁচ হাজার টাকা তিনি সুশীলাকে দিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের এই অযাচিত করুণায় সুশীলা গলিয়া গেলেন। নীরবে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নীরবেই আঁচল দিয়া তিনি সেই জল মুছিতে লাগিলেন।

উইল পড়া শেষ হইলে চন্দ্রকান্ত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ফিস্ ফিস্ সুরে পরেশবাবুকে বলিলেন, পরেশবাবু, আমি আর ওষুধ খাবো না। একটা কাজ করুন আপনারা। বাড়ীর শালগ্রাম শিলা ও মা মঙ্গলচণ্ডীর বিগ্রহ আপনারা নিয়ে আসুন। মেঝেতে বিছানা পেতে নিয়ে বিগ্রহ শিয়রে রাখুন।

চন্দ্রকান্তকে মেঝেয় নামানোর কথা হইলে সুশীলা ভারাক্রান্ত মনে তাড়াতাড়ি পূজার মন্দিরে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রবেশ করিলেন ও সেখান হইতে গঙ্গাজলের ঘটি লইয়া আসিলেন। সেই ঘটি হইতে গঙ্গাজল

মেঝেতে ছিটাইয়া দিয়া পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া দিলেন ও পরে বিছানার উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন।

বিগ্রহ আনিয়া রাখা হইলে চন্দ্রকান্তকে ধরাধরি করিয়া মেঝেতে নামানো হইল।

এই নামানোর ঝামেলা ও পরিশ্রম কাটিয়া গেলে পর যখন চন্দ্রকান্ত কথঞ্চিৎ শান্ত ও সুস্থ হইলেন তখন তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন বিগ্রহ শিয়রে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, আর ভয় নাই।

পরে চিত হইয়া শুইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া ও সেই হাত দিয়া কর ধরিয়া চোখ বুঁজিয়া গভীর জপে নিমগ্ন রহিলেন।

জপশেষে যখন তিনি পুনরায় চোখ মেলিয়া চাহিলেন তখন তাঁহার নজর পরেশবাবুর উপর পড়িল। তিনি তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইসারা করিলেন।

পরেশ কাছে আসিয়া নিজের মাথা চন্দ্রকান্তের মুখের কাছে লইয়া গেলে পর চন্দ্রকান্ত নিজের মাথাটা ও দেহ কাত করিয়া রাখিয়া পরেশের কানে কানে ছোট সুরে বলিলেন, ভগবান আছেন পরেশবাবু।

—আছেন?

—হাঁ আছেন। আমি এইমাত্র তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছি।

চন্দ্রকান্তের কথা ছোট হইলেও সেই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে স্পষ্ট শোনা গেল।

কথাশেষে চন্দ্রকান্ত নিজের ডান হাত দিয়া পরেশের দেহ স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শে পরেশের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

পরে চন্দ্রকান্ত ছোট সুরে পরেশবাবুকে বলিলেন, ভগবানের ওপর বিশ্বেস ফিরে পেয়েছেন তো পরেশবাবু?

পরেশ বলিলেন, বিশ্বেস তো ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু মনে হচ্ছে কি পণ্ডিত মশাই, কিছুতেই টাল সামলাতে পারবো না।

—পারবেন। অত জোরে কথা বলবেন না। আপনার সময় এসেছে। কিছুদিন বাদেই আপনি মনের স্থৈর্য্য ফিরে পাবেন ভগবানের কৃপায় ও অনুগ্রহে। আপনার ভয়ানক রোগ সেরে যাবে। দুঃখ যে কি আপনার তা তো আমি বুঝি।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত চন্দ্রকান্তের সহানুভূতির কথার প্রাণস্পর্শে পরেশ গলিয়া গেলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপর্য্যয়ের অবস্থায় কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিল না। সুরবালা কিন্তু করিল। গভীর সমবেদনায় তাহার চোখ দিয়াও অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পরেশ উহা লক্ষ্য করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার সশব্দ কান্না বুক চিরিয়া জোরে উঠিতে চাহিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খলতা অশোভন মনে করিয়া বাধ্য হইয়াই তিনি সে ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন না। চাপা শ্বাসরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে তিনি মাথা অবনত করিলেন ও নীরবে কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। সুরবালাও নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

পরেশকে আশ্বাস দিবার কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রকান্ত আবার চিত হইয়া শুইলেন। যে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এতক্ষণ থামিয়া ছিল তাহা এখন স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তের রোগবিকৃত মুখে একটা পরম শান্তিময় দিব্য জ্যোতিঃ দীপ্ত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিল। বুঝা গেল তিনি নীরব আবেদনে প্রাণপণে মঙ্গলময়কে ডাকিতেছেন!

চন্দ্রকান্তের মুখশ্রীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে ঘরটা সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গেল।

সকলেই তাঁহার শয্যার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঋজুভাবে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। সেইরূপ স্তব্ধ সম্ভ্রমে তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন যেরূপ সম্ভ্রমে সেনাপতির মৃতদেহ ঘিরিয়া যোদ্ধারা দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপ সম্ভ্রমে মহাপুরুষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মহাপ্রস্থানের সময় তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন তাঁহার মহাপুরুষ যশস্বী শিষ্যগণ।

সুরেশ আজ আসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্য একটা ঘরে সুরেশ সুবিমলকে পাইয়া বলিল, দেখুন সুবিমলবাবু, পণ্ডিত মশাইয়ের মত এমন একটা আদর্শচরিত্র পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই এ পর্য্যন্ত দেখিনি। উনি ভগবানের এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পসৃষ্টি—সুসমঞ্জস, সাবলীল, স্পষ্ট, অনাড়ম্বর, উচ্চসুরে বাঁধা। বাস্তবিকই তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি ভগবানকে দেখেছেন। অনেকে বলবেন ধর্ম্মোন্মত্ত মনের ধাঁধা এটা। কিন্তু আমি তা কিছুতেই মনে করতে পারিনে। নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন। নৈলে শুধু স্পর্শমাত্রেই তিনি পরেশবাবুর মনে অমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটালেন কি করে? এ কি উপরের জগতের শাশ্বত ইচ্ছাশক্তি? বড়ই আশ্চর্য্য সুবিমলবাবু, বড়ই আশ্চর্য্য!

সুরবালা এই সময় উপস্থিত হইয়া বিষাদক্লিষ্ট অনুযোগের স্বরে বলিল, সুবিমলবাবু, এই কি আপনাদের গল্প করবার সময়? যান পণ্ডিত মশাইয়ের পাশে গিয়ে বসুন গে যান।

এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া মাথা অবনত করিল।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তনের মধ্যে চন্দ্রকান্তের পবিত্র আত্মা তাঁহার দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। পরেশবাবু জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না সকলের কান্না ছাপাইয়া উঠিল।

মন্ত্রগুরু সাধু মুক্ত পুরুষ চন্দ্রকান্তের শব লইবার জন্ত সুবিমল নিজেই কুড়ুল দিয়া বাঁশ কাটিয়া চিরিয়া, দড়ি দিয়া বাখারিগুলি বাঁধিয়া মাচা তৈয়ার করিল, কোন জন মজুরের সাহায্য গ্রহণ করিল না। অন্ত অনেকে তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল কিন্তু সে কোন সাহায্যই গ্রহণ করিল না।

সুরেশকে শব কাঁধে লইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সুরবালা তাহাকে নিরালায় ডাকিয়া লইয়া মৃদু ভৎ‍র্সনার স্বরে বলিল, পণ্ডিত মশায়কে নেবে না তুমি? বল কি! দেখছ না সুবিমলবাবু কি করছেন? কত বড় লোক তিনি বুঝে ছাখ দেখি! যাও, একদিন বই দুইদিন নয় তো। একটু কষ্ট করে নেওগে যাও।

চন্দ্রকান্তের শ্মশানযাত্রা তাঁহার জয়যাত্রা হইয়া উঠিল। বিখ্যাত সুবিমল ও বিলাত-ফেরৎ ও বিলাতযাত্রী-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের বন্ধু প্রথিতযশাঃ সুরেশ মড়ার এক দিক কাঁধে করিল, অপর দিক করিলেন রাজসাহীর দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। শবের অনুসরণ করিল রাজসাহীর বাছা বাছা ভদ্রলোকদের লইয়া গঠিত সংকীর্ত্তনের দল। পরেশ পিছনে পিছনে চলিলেন।

শব বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার অনেক আগে সুশীলার কান্না থামিয়া গিয়াছিল। শব চলিয়া গেলে বাড়ীটা যখন শূন্ত নিস্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করিতে লাগিল তখন তিনি আর কাঁদিলেন না। তিনি একটা ঘরে গিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তিনি মেঝেতে এলাইয়া পড়িলেন। তাঁহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল, চোখ ঊর্দ্ধে উঠিল, তিনি প্রবল আক্ষেপে কাঁপিতে লাগিলেন।

সুরবালা অন্য ঘরে ছিল। সুরমা কাছেই ছিলেন। সুশীলার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি একদম বিপর্য্যস্ত হইয়া গেলেন। সুরবালাকে ডাকিয়া ছোট কাশি কাশিতে কাশিতে বলিলেন, ও সুরবালা, আয় তো একবার মা। ভাখতো একবার সুশীলার কি হল।

সুরবালা তাড়াতাড়ি ঘরে পৌছিয়া দেখিল সুশীলার ফিট হইয়াছে। দেখিয়াই সে মেঝেতে বসিয়া সুশীলার মাথা নিজের কোলে উঠাইয়া লইল ও জোরে সুশীলার চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সুশীলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি প্রকৃতিস্থের ভাবে সুরবালার দিকে চাহিতে পারিলেন। বলিলেন, সুরবালা মা, আমার যে কি হল মা।

সুরবালা বলিল, মা, একটু ঘুমোন আপনি।

শৈলও কাছে আসিল। সেও বলিল, ঘুমোন মা আপনি একটু।

সুশীলা শৈলর কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। সুরবালার মত মেয়ে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে দেখিয়া তিনি আশায় বুক বাঁধিলেন। বলিলেন, ঘুমোবার কি জো আছে মা? ভগবান কেন এত দুঃখ ঘটালেন আমার কপালে? ওঁকে ছেড়ে যে কিছুতেই থাকতে পারবো না মা।

—কেন মা, আমরা তো আপনার সবাই আছি! আপনি বুদ্ধিমতী মেয়ে। জীবনে কত সহ্য করেছেন মা, আর কেন এখন সহ্য করতে পারবেন না মা?

—এখন যে পারিনে মা। আগে শরীরে বল ছিল, মনে তেজ ছিল। এখন যে একটুকুতেই মন ভেঙ্গে পড়ে মা। পণ্ডিত মশায়ের আঘাত যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না মা।

—বল করুন মা বুকে। আর কয়দিনই বা আপনার জীবন। এর পরে যে আপনি প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাবেন।

—কি বল্‌লি ?

—পরলোকে গিয়ে আপনি মৃত আত্মীয় স্বজনের দেখা পাবেন। আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে মা।

—হবে ?

—হাঁ হবে।

—তুই বিশ্বেস করিস্ মা ?

—হাঁ মনে প্রাণে বিশ্বেস করি মা।

(৭৩)

চন্দ্রকান্তের শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরের কথা। শৈল ও সুবিমল ফিরিয়া যায় নাই। রাজসাহীতেই আছে।

সেই দিন পরেশ সুবিমলকে নিজের ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, বিমল, একবার এস তো।

পিতার ডাক শুনিয়া সুবিমল গিয়া পিতার ঘরে উপস্থিত হইল।

পরেশবাবু এক চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে সামনের চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, বোস ওখানে।

সুবিমল নির্দ্দেশমত চেয়ারে গিয়া বসিল।

চন্দ্রকান্তের মৃত্যুর দিনের পর হইতেই পরেশের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

চন্দ্রকান্তের মৃত্যুতে পরেশের মনে ঘা লাগিয়াছিল যথেষ্ট, হৃদয়ে গভীর

এক ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই ক্ষত আরোগ্য করিবার ঔষধ চন্দ্রকান্ত পরেশকে নিজেই দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পরেশের হৃদয়টা বিশ্বাসের আলোকে প্রদীপ্ত করিয়াই ও পরেশের অপস্মার ব্যারাম সারাইয়া দিয়াই সংসার হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। পরেশের মন আজ এক উচ্চ অনুভূতিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের নিজের অসহ্য দুঃখের জন্য তিনি নিজকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে মানুষের সুখদুঃখের কর্ত্তাই উপরের একজন। তাহাতে মানুষের কোন হাত নেই, বিচার করিবার কিছু নাই। ভগবান মানুষকে মাঝে মাঝে এমন কষ্টে ফেলে দেন যাহার কারণ অনুসন্ধানে মেলে না। প্রথম জীবনে তিনি পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া সংসারটা ভাল ভাবেই রচনা করিয়াছিলেন। পুরুষকারের বাহিরে যে কিছু থাকিতে পারে তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহাতে তাঁহার সেই পুরুষকার ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি প্রথম জোয়ারের টানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। সফলতার উচ্ছ্বাসে তাঁহার কোনও দিনও ভাবিবার সুযোগ হয় নাই যে তাঁহার জীবনে ভাঁটা আসিবে। ভাঁটা সত্য সত্যই আসিল। তাহার টানে তিনি শোচনীয় ভাবে পিছাইয়া পড়িয়া জলের নীচে লুক্কায়িত পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া এমন আঘাত পাইলেন যাহাতে তাঁহার জীবনতরণী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। তিনি ঘন-আঁধার দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে জোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে আর্ত্তনাদ শুনিবার কেহই রহিল না। আজ আবার নূতন জোয়ারের টানে তিনি ছায়া-সমৃদ্ধ কূলে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও এই অবসরে সমস্ত জীবনটাকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আগে যাহা তাঁহার নিকট মূল্যবান ছিল, এখন তাহা নিরর্থক হইয়া গিয়াছে। সংসারের উচিত অনুচিতের,

সত্যাসত্যের ধারণা তাঁহার মনে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মন শক্ত হইয়া গিয়াছে ও পূর্ব্বের অবস্থা পরিহার করিয়া বসিয়াছে ও নূতন জীবন পাইয়া দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুবিমল পিতার এই ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল। দেখিল জীবনের এক টানা দুঃখ দুর্দ্দশায় পিতার দাঁত-পড়া বিকৃত মুখের চামড়া অসম্ভবভাবে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে ও চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হইয়া যাইবার ভাব দেখাইয়াছে ও সেই জরাগ্রস্ত জীর্ণ মুখের উপর দিয়া এক নূতন আশা ও অনুভূতির আভা ছড়াইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া-পড়া বার্দ্ধক্যকে নবীনতায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে। সে পিতার মুখের পানে সসম্ভ্রমে অসীম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পরেশও তাঁহার পরিবর্ত্তিত মনের অবস্থায় পুত্রকে ভাল করিয়া বুঝিলেন। চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টির দ্বারা চাহিয়া দেখিলেন পুত্রের সটান টান কাঁচা রঙের চামড়ায় ঢাকা প্রশস্ত ললাটে এমন এক মহানুভবতার আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যাহা তিনি আগের মনের বিপর্য্যস্ত অবস্থায় দেখিতে পান নাই। আরও দশজনের মত পুত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে এই ধারণাই তিনি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পুত্র যে দৈব শক্তির ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া অন্য দশজন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার মত মানসিক সহানুভূতি সৃষ্টি করিবার তিনি অবসর পান নাই। আজ তিনি হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিলেন সংসারের তিল তণ্ডুলের বাহিরের কি একটা বড় আদর্শের অনুপ্রেরণায় পুত্রের পল্লীপ্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। বুঝিয়া এই প্রথম পরেশ রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বেও পুত্রের কাজে উৎসাহিত হইয়াছেন কিন্তু সে উৎসাহ আজকার মত এত নিবিড়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে গাঁথিয়া যায় নাই। পুত্রের জীবনে এক উচ্চ ভাবের পরিণতি দেখিয়া তিনি আজ মনে করিতে পারিলেন যে তাঁহার

নিজের জীবন একেবারেই নিষ্ফল হয় নাই। নিজের মনের পরিবর্তিত ভাবের সঙ্গে ভাবটা মিলাইয়া লইয়া তিনি পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন।

সুবিমলের আসিবার পূর্ব্বেই বার্ণিশ-করা টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা চকচকে সোনার ক্লিপ দিয়া আঁটা পরিষ্কার দলিল বাহির করিয়া তিনি নিজের পাশে রাখিয়াছিলেন। সেই দলিলখানি তিনি সুবিমলের হাতে দিয়া বলিলেন, দলিলখানি পড়ে স্তাখো বিমল।

সুবিমল পড়িয়া দেখিল পিতা তাঁহার সমস্ত জমিদারী ও ব্যাঙ্কে এ পর্য্যন্ত তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চিত টাকা ছিল তাহা এই দানপত্রের দ্বারা তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

সুবিমল বলিয়া উঠিল, একি !

শৈল পাশের ঘরেই ছিল। সুবিমলের কথা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দুই ঘরের মাঝের দরজায় দাঁড়াইল।

পরেশ শান্ত গম্ভীর অবিচলিতভাবে বলিলেন, এর মানে আর কিছুই নয় বাবা, আমার সংসারের কর্ত্তব্য সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি। যে সংসার আমি প্রথম জীবনে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেম, তাই ছেড়ে যাচ্ছি। কোন তিক্ততার ফলে নয় বাবা। বুঝে দেখেছি ওসবে কিছু নেই বাবা। এখন আমার মরবার সময় হয়েছে। যাতে শান্তিতে মরতে পারি সেই দিকে এখন আমার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পণ্ডিত মশায়ের হাতের স্পর্শে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। প্রকৃত পথ আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার আর কোন দুঃখ নেই। এতদিন বড় দুঃখ পেয়েছি শুধু না বুঝে।

কথা আরও ভাল করিয়া শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে শৈল কাছে

অগ্রসর হইয়া আসিল ও শ্বশুরের পিছনে গদি-আঁটা মেহগনির খাটের উপর গিয়া বসিল।

সুবিমল বলিল, বলেন কি বাবা? একথা যে ভাবতেও পারিনে।

পরেশ বলিলেন, কি করে ভাবতে পারবে বাবা? আগে তো বলিনি। আমি ধন্য যে তোমার মত পুত্র পেয়েছি ও বৌমার মত পুত্রবধূ পেয়েছি। আমি শান্তিতে চলে যেতে পারছি এই ভেবে তোমাদের দ্বারা আমার সংসার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি আমার কৃতবিদ্য সন্তান, যশস্বী। সৎপুত্রের কর্ত্তব্য যাতে সে পিতার আত্মার উন্নতির পথে বিঘ্ন না হয়ে দাঁড়ায়।

সুবিমল কোনও উত্তর করিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও পরিস্থিতিটা ভাল ভাবে বিবেচনা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পাইচারি করিয়া বেড়াইল। পাইচারি করিতে করিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুবিমল বাহির হইয়া গেলে শৈল পরেশের সামনে জানু পাতিয়া বসিয়া, পরেশের দুই জানুর উপর দুই হাত রাখিয়া, তাহার অনুপমভাবে গঠিত দেহার্দ্ধভাগ সোজা করিয়া রাখিয়া তাহার অনুপম ডাগর চোখের শান্ত গভীর দৃষ্টিতে পূজনীয় শ্বশুরের দিকে তাকাইয়া স্নেহময়ী কন্যার মিনতিমাখা সুরে আকুলকণ্ঠে বলিল, বাবা?

পরেশ বিগলিত স্নেহে নিজের ডান হাতখানি শৈলর মাথায় রাখিয়া বলিলেন, কি মা?

—চলে যাচ্ছেন বাবা আমাদের ওপর রাগ করে?

পরেশ কথায় স্নেহের জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, মা, না, কিছুতেই না। রাগ করে কিছুতেই যাচ্ছিনে। বড়ই আনন্দে যাচ্ছি মা তোমাদের এইভাবে রেখে। মা, আমার যাবার সময় হয়েছে। আর

বাধা দিস্‌নে মা। আর মায়াডোরে বাঁধিস্‌নে মা। উঠে বোস মা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের জীবন আরও ধন্য হয়ে উঠুক।

এই সময় সুবিমল ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। শৈল উঠিয়া আবার খাটে গিয়া বসিল।

সুবিমল বলিল, বাবা?

পরেশ বলিলেন, কি বাবা?

—এ সংকল্প ছেড়ে দিন।

—কেন?

—পারবেন না। একলা কি করে থাক্‌বেন এই বয়সে? কে দেখবে?

—খুব পারবো বাবা, খুব পারবো। মনের ভাবই এখন আমার পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। তিনিই দেখবেন বাবা যাঁর ওপর নিজকে সমর্পণ করতে যাচ্ছি।

সুবিমল অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাগুলি ভাবিল। পরে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, যান্‌। আমরা তো আছিই। যদি না পারেন তবে চলে এলেই হল। তবে দানপত্র দিয়ে কাজ নেই। আপনার টাকা ও সম্পত্তি আপনি ফিরে নিন্‌।

—আর ও জঞ্জালে নিজকে জড়াতে চাইনে বাবা। পেন্সন আছে। টাকার প্রয়োজন হয় চেয়ে নেব।

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—হরিদ্বারে।

—আচ্ছা আমি গিয়ে আপনাকে রেখে আস্‌বো।

—না বাবা তা গিয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া তুমি গেলে বৌমা ও তোমার মার কত কষ্ট হবে, তা ভেবে দেখেছ কি?

শেষের কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিবার সময় পরেশের বুকে ঘা লাগিল। কথা কয়েকটি বলিবার সময় তাঁহার চোখ ছুটিয়া যাইতে লাগিল। দুই এক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুও তাঁহার চোখের কোণে সঞ্চিত হইল। কিন্তু উহা নিমেষের জন্য। দুর্জ্জয় সংযমে শ্রীভগবানের শক্তি হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তিনি ভয়ানক দুঃখ সংযত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিমেষের জন্য হইলেও উহা সুবিমল শৈলর দৃষ্টি এড়াইল না। চোখের সেই বিস্ফারিত রক্ত-ছোটা অবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠাধরের দুঃসহ যন্ত্রণার বক্রভাব ও কপালের ভয়াবহ ক্ষণিকের কুঞ্চন তাহাদের দৃষ্টি এড়াইল না।

যদিও পরেশ পরবর্ত্তী সময়ে কথা বলিয়া গেলেন আশ্চর্য্য প্রশান্তির স্বরে তবুও সুবিমল ধর্ম্মাশ্রিত হইলেও সেই সময়ে রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা তাহাকে পাইয়া বসিল। পিতার চোখের জল দেখিয়া প্রবল সহানুভূতির দৃষ্টি দ্বারা সে এখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল কত বড় দুঃখের জীবনের ভিতর দিয়া পিতার দিনগুলি কাটিয়া আসিয়াছে। এই ক্ষণিকের বিচলিত ভাবের ভিতর দিয়া বিস্ফোরণের ন্যায় কত আকস্মিকভাবে সেই নিদারুণ হতাশার দাবদাহ ঝলক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সে মুখ অবনত করিল। সে অবস্থায় সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শৈলও স্বামীর কান্না দেখিয়া নিজের কান্না রোধ করিতে পারিল না। তাহাকেও রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা পাইয়া বসিল। সেও স্বামীর মত ভাবেই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরেশ বিচলিত হইলেন না। স্থির কণ্ঠে বলিলেন, বিমল তুমি কান্‌ছ? তুমি মহাপুরুষ। তোমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না। আমাকে এখানে থাকলেও দুদিন বাদে মরতে হবে ও তোমাদের ত্যাগ করতেই

হবে। বৌমা, কাঁদছ? ছিঃ! আমাকে আর দুর্ব্বল করে দিও না। কেঁদ না মা।

পিতার কথায় সুবিমল নিজকে সংযত করিল, শৈলও করিল। তাহারা চোখের জল কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিল।

সুবিমল বলিল, বাবা যাবেন যান্। আমি বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। তবে আমি হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাবই।

বাড়ীর ভিতর সুরমাকে সংবাদটা জানানো হইলে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রবল উষ্মায় বলিয়া উঠিলেন, যাবেন যান। ভয় দেখাবেন আমায়, দেখান।

শৈল বিনীতভাবে বলিল, ভয় দেখানোর জন্য যাচ্ছেন না মা, আপনা আপনিই চলে যাচ্ছেন।

—ভয় দেখানোর জন্যে যাচ্ছেন না তো যাচ্ছেন কেন? দেখান, ভয় দেখান, দেখান, যত পারেন দেখান, ভয় আমি করিনে। সমুদ্রে শয়ন আমার, কুমীরের ভয় আমার কিসের? যাক্! আমি একটা কথাও বল্‌বো না।

পরদিন পরেশ ভোরে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া মোটর ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুবিমল আগেই প্রস্তুত হইয়াছিল।

শৈল চাকরের সাহায্যে বিছানাপত্র বাঁধিয়া দিল।

সুরমা তখন পর্য্যন্তও শয্যাত্যাগ করেন নাই। তিনি জাগিয়াই ছিলেন। ওঠা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

পরেশ পত্নীর নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে পত্নীর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ভাখো আমি চল্লেম।

এতক্ষণে সুরমা উঠিয়া বসিলেন। বিষম আক্রোশে মরিয়ার স্বরে

বলিলেন, চল্লেম! কি ভাবে আমায় রেখে যাচ্ছো বলত? কি করে ফেলেছ আমার জীবনটাকে বলতো?

পরেশ বিরক্ত হইলেন না। স্ত্রীর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অশ্রুসিক্ত চোখে তিনি শান্তভাবে বলিলেন, ঝগড়া করা আমার উচিত নয়। ঝগড়া করতে চাইনে। তোমার ওপর এখন আর আমার কোন রাগ নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমায় শান্তি দেন! ভয়ানক শোকে দুঃখে তোমার এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করে ওঠানো। কিন্তু তোমার যে অবস্থা তাতে তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছিনে। কিছুদিন বাদে তুমি সব বুঝতে পারবে। তখন তুমি সেরে যাবে। আমার প্রার্থনায়ই নিশ্চয় সেরে যাবে। তখন এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

পরেশের মুখ হইতে এরূপ উচ্চভাবের কথা সুরমা কোনও দিনও শুনেন নাই। শোনার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। সুতরাং কথাগুলি একেবারে ফাঁকা হইয়া তাঁহার মনে প্রবেশ করিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বাড়ীর বাহির হইয়া যখন পরেশ রাস্তায় গিয়া পড়িলেন তখন সুরমা তাঁহার হাড়ে অবশিষ্ট, শোচনীয়ভাবে ভগ্ন, শুক্না দেহ লইয়া বাড়ীর বাহিরের দরজায় শৈলর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পরণে মূল্যবান ধোলাই কাপড় ছিল, হাতে এক গোছা সোনার চুড়ি ছিল, গলায় মূল্যবান হার ছিল, কপালে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা ছিল।

শৈল সুশীলাকে আসিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সুশীলা অসুস্থ থাকায় আসিতে পারেন নাই।

পথে চাকর মোট মাথায় লইয়া আগে আগে চলিল, তার পর পরেশ, তার পর সুবিমল হাঁটিয়া চলিল।

চেহারা পাতলা থাকিলেও পরেশের স্বাস্থ্য আগে ভাল ছিল। বিগত বৎসরগুলির দুঃখে ও বার্দ্ধক্যে তাঁহার শরীর একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পা-টাও অসম্ভব রকমের সরু হইয়া গিয়াছে, চলিতে গেলে এখন তাঁহার পা কাঁপে।

পরেশ মাথায় এক ধূসর রঙের পশমী চাদর বাঁধিয়াছিলেন। গায়ে এক ইস্ত্রি-করা লম্বা পশমী কোট পরিয়াছিলেন। মূল্যবান্ শুঁড়-উঠানো নাগরাই চটি পায়ে দিয়াছিলেন। কাঁধে তিনি একখানা ইস্ত্রি-করা মূল্যবান্ বালাপোষ পাট করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হাতে একটা মোটা লাঠি লইয়া কুব্জভাবে সেই সরু সরু কম্পমান পা বাড়াইয়া দিয়া, কম্পমান শরীরে ঝাঁকি দিয়া চলিতেছিলেন।

ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পরেশের মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রা এইরূপ শোচনীয়ভাবে আরম্ভ হইয়া গেল। সুরমা তাকাইয়া দেখিলেন। তাঁহার স্বামীর প্রতি ভাবে ও ধারণায় হলাহল মিশিয়া গিয়াছিল। সেই হলাহলের বিষাক্ত প্রভাব হইতে কিছুতেই তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ভিতর তিনি ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেন না, এই ষাট বৎসরের জীর্ণ বৃদ্ধ স্বামী কি করিয়া দূরদেশে পাহাড়ের উপর জীবন কাটাইবেন। বুঝিলেন না পরেশের অস্থির মতি তাহার প্রথম জীবনের বঞ্চিত অবস্থার নিদারুণ পরিণতি মাত্র। সেই অস্থির মতি সুরমা অনেক দিন আগে হইতেই ঘৃণা করিয়া আসিতেছিলেন. উহার নিষ্ঠুর পরিণতিও তিনি এখন সহানুভূতির চোখে তাকাইয়া দেখিলেন না ও দেখিবার মত অবস্থাও তাঁহার ছিল না। আগেই তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা এতদিন পর্য্যন্তও কতকটা অসম্পূর্ণ ও প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু

আজ এই নিদারুণ অবস্থায় তাঁহার অসহায় মর্ম্মান্তিক বিরুদ্ধতায় সেই ত্যাগটা সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

স্বামী দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলে স্ত্রী পুনরায় নিজের ঘরে গিয়া ঘরের খাটের কোমল বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন ও নিজের জীবনের সমস্ত বিপর্য্যয়ের জন্ত একমাত্র পরেশকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করিয়া পরেশের প্রতি মর্ম্মান্তিক, নিঃসহায় শিশুর মত বুক-ফাটা দুঃখে ও অভিমানে, মর্ম্মান্তিক অনুযোগের কথা কান্নায় মিশ্রিত করিয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শৈল ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, মা।

মা কোন উত্তর করিলেন না, বরং বধূর কথায় চরম উৎক্ষেপে তাঁহার অনুযোগ-মিশ্রিত তীব্র কান্না বাড়িয়া গেল।

কিন্তু কান্না বেশীক্ষণ চলিল না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই পূর্ব্বের হাঁফের ব্যারাম আজ নূতন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি অসীম যন্ত্রণায় বুক ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

দুপুর রাত্রিতে তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, ও বৌমা, বৌমা।

শৈল শিয়রে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। সে একখানি পশমী চাদর গায়ে দিয়াছিল। বলিল, কি মা?

সুরমা মোটা লেপের নীচ হইতে হাঁকাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, এখনও শুতে যাওনি? যে শীত পড়েছে! ওঃ, কি যে মেয়ে! সাত জন্মের মেয়ে ছিলে তুমি মা আমার। এই পোড়াকপালী দেখলো না। পোড়াকপালী কি যে করে গেল!

এই সময়ে খক্ খক্ শব্দে ও বুকের সাঁই সাঁই শব্দে দম বন্ধ হইবার উপক্রম করিল। আর কথা চলিল না।

শেষ রাত্রিতে সুরমা আবার জাগ্রত হইলেন। এবার তিনি 'বৌমাকে' ডাকিলেন না। ছোট, জড়িত অথচ স্পষ্ট স্বরে কথা শুরু

কাশিতে প্রতিহত করিয়া করিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনা গেল, যাও। আমাকে জব্দ করবে তুমি? তুমি আমাকে জব্দ করবে? জব্দ কে হয় দেখা যাবে। হতভাগা! জীবনটা আমার ভেঙে চুরমার ক'রে দিল। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, ভয়ানক নিষ্ঠুর। ওঃ, কি অবস্থায় আমায় ফেলে গেল! যাও। যেখানে ইচ্ছে যাও। চলে যাও যেখানে ইচ্ছে। আমি তোমার ধার ধারি কি? আমার জীবন একভাবে কেটে যাবেই। মা সর্ব্বমঙ্গলা আমায় রক্ষে করবেন।

ইহার পর তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

আবার কিছুক্ষণ পরে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্ববৎ জড়িত স্বরে বলিয়া চলিলেন, ক্ষমা! ক্ষমা করবো আমি! তোমাকে? কিছুতেই না। কিছুতেই না। ওঃ, চোখের সামনে মেয়েটাকে মেরে ফেললে! ক্ষমা! তোমাকে ক্ষমা! কিছুতেই না। প্রাণ গেলেও না। মরে যাক্! তাতে আমার কি? যাক্ মরে! সেই ভাল। ওঃ, কি কষ্টটাই পেয়েছি ওর হাতে পড়ে! ওই হতভাগার হাতে পড়ে। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল, একেবারে পাগল। মানুষ নয়। মানুষ কিছুতেই নয়। ভূত! ভূত! সামনে থেকে গিয়েছে। বেশ করেছে। বেঁচেছি।

ইহার পর সুরমা ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষরাত্রির জটিল নিস্তব্ধতা আসিয়া ঘরটাকে আচ্ছন্ন করিল। বাহিরে শীতের দমকা হাওয়া রাত্রির দীর্ঘশ্বাস বহিয়া আনিয়া দূরের গাছের উপর ফেলিয়া দিয়া সেখানেই মরিতেছিল। কুশ্রীতার প্রতীক বাদুড় কাঁচ কাচ শব্দ করিয়া বাড়ীর মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিতেছিল।

শৈল বিনিদ্র চোখে শাশুড়ীর শিয়রে বসিয়া রহিল। শুধু বসিয়া থাকাই নয়, সহস্র চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

—সমাপ্ত—